আমার

সমস্ত কর্মের প্রেরণা

আমার পিতৃদেব

৺ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের

পুণ্যস্মৃতির

উদ্দেশে

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ব্রতী হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলাম পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ৺চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত মহাভারতের প্রভাব নির্ণয় করার। এর জন্য সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে কবি কাশীরামদাসের মহাভারত পাঠ করতে গিয়ে কবির বিস্ময়কর প্রতিভায় আকৃষ্ট হই। সংস্কৃত মহাভারতকে অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে তাঁর যে কবি প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যই দুর্লভ। বিশেষভাবে মনে পড়ল, মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে কবি কাশীরামদাস এবং কৃত্তিবাসের ভূমিকার কথা। সে যুগে জনশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। যাঁরা নিয়মিত শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, সেই অগণিত সাধারণ মানুষের চিত্তক্ষেত্রকে সরস ও সংস্কৃত রাখতে রামায়ণ-মহাভারত কথা, এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এ ক্ষেত্রে এই দুই জনপ্রিয় কবির অবদান অসামান্য। তাই আমার লক্ষ্য কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত মহাভারতের প্রভাব নির্ণয়ের পরিবর্তে চেষ্টা করলাম কবি কাশীরামদাসের কাব্য বিচার করতে এবং তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করতে। আমার এ চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে তা জানি না। এ বিচার করবেন সুধীজন। তাঁদের কাছে যদি আমার প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তাহলে ধন্য হব।

আমার একাজে প্রথম পথ প্রদর্শন করেছেন ৺চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

তাঁর অধীনে কাজ আরম্ভ করবার পর জীবিকার প্রয়োজনে কিছুকাল বাংলাদেশের বাইরে যেতে হয়। পুঁথিপত্র সংগ্রহ করার ছিল অসুবিধা। তাই যে কাজ শুরু করেছিলাম তা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে ছিল। এমন সময় পরম সৌভাগ্যক্রমে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক এবং পরবর্তী কালের ইউ. জি. সি. অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সান্নিধ্য লাভ করলাম। নতুন পথের সন্ধান পেলাম। বহু তথ্যে সমৃদ্ধ হলাম। তাঁর অকারণ এবং অকৃপণ স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আমার আরব্ধকাজ সম্পূর্ণ করতে পারলাম। আমার শ্রদ্ধাবনত চিত্তের প্রণাম জানাই তাঁর শ্রীচরণে।

আমার একাজ লোকচক্ষুর অগোচরে পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই থাকবে বলে ধরে নিয়েছিলাম। এটা যে কোনদিন ছাপার অক্ষরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে তা

ভাবি নি। কিন্তু আমাদের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে এটা সম্ভব হয়েছে এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে এটা প্রকাশিত হচ্ছে। এর জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং বিশেষভাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রকাশনার সমস্ত কাজ সমাপ্ত করেছেন। তাঁদেরও আমার ধন্যবাদ জানাই।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বিষয় সূচী

		পৃষ্ঠা সংখ্যা
	প্রারম্ভ	১-১১
প্রথম অধ্যায়	কাহিনীগত পার্থক্য	১২-৬৭
দ্বিতীয় "	সংযোজিত কাহিনীর উৎস সন্ধান ও কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য বিচার	৬৮-৭৩
তৃতীয় "	চরিত্র	৭৪-১১৭
চতুর্থ "	বিষয়বস্তু	১১৮-১২৭
পঞ্চম "	রস বিশ্লেষণ	১২৮-১৩৭
ষষ্ঠ "	আঙ্গিক বিচার	১৩৮-১৫৫
সপ্তম "	দেশ ও কালের প্রভাব	১৫৬-১৬৫
অষ্টম "	মূল্যায়ন	১৬৬-১৭০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট 'ক'	কবি কাশীরামদাসের নামে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্ব, উপাখ্যান এবং তাহাদের পুঁথিসংখ্যা	১৭১-১৭৩
পরিশিষ্ট 'খ'	মহাভারত রচয়িতা কবিগণ	১৭৪-১৭৫
পরিশিষ্ট 'গ'	কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রিত সংস্করণ	১৭৬-১৭৮
পরিশিষ্ট 'ঘ'	মহাভারত আশ্রয়ী-রচনা	১৭৯-১৮৪
পরিশিষ্ট 'ঙ'	কাশীদাসী মুদ্রিত সংস্করণের সহিত বিভিন্ন পুঁথির পাঠের তুলনা	১৮৫-২৫৯
পরিশিষ্ট 'চ'	আক্ষরিক অনুবাদের পরিমাণ	২৬০-২৯২
	গ্রন্থপঞ্জী	২৯৩-২৯৫

প্রারম্ভ

জাহ্নবী যমুনার বারিধারার ন্যায় রামায়ণ মহাভারতের রসধারা ভারতবর্ষের চিত্তক্ষেত্রকে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই দুই মহাকাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন "......ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকী রাখে নাই।

এই জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে, মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবি যুগলকে কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাহাদের বাণী বহু কোটি নর নারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে। শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলিমৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিয়াছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, ইহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল। কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই, ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্য হর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দুইটি মহাভারতের সন্ধান পাওয়া যাইবে। একটি মহাভারতে ভারতবর্ষের সাধনা ও সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটি মহাভারত হইতেছে যাহার "মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সমান সমাদর।" একই গ্রন্থের পক্ষে যুগপৎ এই দুই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আপামর জনসাধারণের পক্ষে মহাভারতের চেতনা, চিন্তা ও আদর্শকে গ্রহণ করা, ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আহরণ করা সম্ভব নয়। ইহা সংস্কৃত মহাভারতের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষিত বিদগ্ধ ব্যক্তির পক্ষেই অনুধাবনযোগ্য। ইহাকে অবলম্বন করিয়া মাতৃভাষাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেগুলিই মহাভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে জন-জীবনের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিয়াছে। তাহাদের মাধ্যমেই মূল মহাভারতের ভাবধারা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ জীবনবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং বহুবিধ বৈচিত্রের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে।

বাংলা ভাষায় কবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের রচিত গ্রন্থ দুইটি বহুলাংশে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালী জীবনে এই দুইটি গ্রন্থের অবদান সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত কাশীরামদাসের মহাভারত গ্রন্থের ভূমিকায়

---

১ রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড পৃঃ ৬৬২ (৪) (জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত)

বলিয়াছেন—"এককালে আমাদের দেশে যাহার অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল, সেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত পড়িত। যাহার অক্ষর পরিচয় ছিল না সে পরের মুখে শুনিত। এই দুই মহাকাব্য সহস্রধারে বাঙ্গালীর মনের আহার যোগাইয়াছে।"[১] ইহাদের মধ্যে কালানুক্রমিক বিচারে দেখা যায় রামায়ণ রচনার অনেক পরে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচিত হয়। প্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন পরমেশ্বর দাস। ইনি নিজেকে কবীন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্য কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামেও তিনি পরিচিত। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হোসেন শাহার সেনাপতি পরাগল খাঁর আগ্রহে তিনি কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার মহাভারত পরাগলী মহাভারত নামেও প্রচলিত। পরাগল পুত্র ছুটি খাঁর আগ্রহে শ্রীকর(ণ) নন্দী বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়া সঞ্জয়[২], রামচন্দ্র খাঁ, রঘুনাথ, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যাম দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ কাশীরামদাসের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া কাব্য রচনা করেন। ইঁহাদের কেহ কেহ সংক্ষিপ্তাকারে সমগ্র মহাভারত রচনা করেন, অনেকেই একটি কি দুইটি পর্ব আশ্রয় করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কাব্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। ইঁহাদের কাব্য কৃতি সম্বন্ধে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—'অবশ্য এ সমস্ত রচনা-কারেরা কেহই পুরা মহাভারত রচনার মত বিপুল পরিশ্রম করিতে পারেন নাই। তাই পরবর্তীকালে কাশীরামই লোকস্মৃতিতে বাঁচিয়া রহিয়াছেন। আর তাঁহার সমকালীন বা পরবর্তী কবির দল আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন, গবেষকের গবেষণাগার ভিন্ন ইঁহাদের আর জীবন্ত কোন অস্তিত্ব নাই। কাশীরামদাসের মত পূর্ণতর প্রতিভা ইঁহাদিগকে কখনও নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, কখনও বা কাশীরামের গ্রন্থের মধ্যেই অনেক কবির রচনা মিশিয়া গিয়াছে।"[৩]

বাংলা মহাভারতের অনুবাদের ধারায় কবি কাশীরামদাসই ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়া ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিলেন। কেবলমাত্র সংখ্যার সাহায্যে কবির বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রতিভার ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আজ পর্যন্ত কবির নামে ৩২১৯টি পুঁথির, এবং মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের পরিবর্তে ৫৩টি পর্বের ও ২৬টি পালা বা উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্ট 'ক' তে এই সকল পর্বের এবং পর্বান্তর্গত পুঁথি সংখ্যার উল্লেখ করা হইল। কোন একজন কবির নামে এত বিপুল সংখ্যক পুঁথি পাওয়া বাংলা পুঁথি সাহিত্যে একটি বিরল ঘটনা। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে এই সকল পুঁথি কবি কাশীরামদাসের নামে পাওয়া যাইলেও সকলগুলি তাঁহার রচনা নহে। কিন্তু সংখ্যার আধিক্য তাঁহার জন-প্রিয়তা প্রকাশ করিতেছে। এই সঙ্গে মহাভারতের অনুবাদক কবিগণের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। পরিশিষ্ট 'খ' তে এই সকল অনুবাদক কবিগণের নামের তালিকা প্রদত্ত

---

১ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. সম্পাদিত কাশীরামদাস সচিত্র অষ্টাদশপর্ব মহাভারত—ভূমিকা।

২ সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। তবে ডঃ মুণীন্দ্রকুমার ঘোষ 'সঞ্জয়' এর মহাভারত সম্পাদনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছেন।

৩ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৫০

হইল। এই তালিকায় ১৩৭ জন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই ১৩৭ জন ছাড়াও আরও কত কবি কাশীরামদাসের নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া আছেন তাহা বলা অত্যন্ত দুরূহ। ইঁহাদের অধিকাংশই কবি কাশীরামদাসের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবি কাশীরামদাসের পরবর্তীকালে আবির্ভূত এই সকল কবিদের নামের দীর্ঘ তালিকা হইতে এবং কবির নামে প্রাপ্ত এই বিপুল সংখ্যক পুঁথি হইতে এ কথা বলা যায় যে কবি কাশীরামদাস তাঁহার রচনার দ্বারা মহাভারত সম্পর্কে এমন একটি ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহাতে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ ইহার রসাস্বাদে অত্যন্ত আগ্রহী হইয়াছিল এবং সেই আগ্রহ বহু কবি যশঃপ্রার্থীকে এই কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে অবশ্য ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"আসলে পড়িবার জন্যই বাংলা মহাভারতের—যাহা ছাপা হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে কাশীরামের নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে—তাহার প্রয়োজনীয়তা অষ্টাদশ শতাব্দে ভালো করিয়া এবং ঊনবিংশ শতাব্দে একান্ত করিয়া অনুভূত হইয়াছিল।"[১] এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে পুঁথির সংখ্যাধিক্যই বাংলাদেশের পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর মহাভারত সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। আসলে কবি কাশীরাম দাস তাঁহার চার পর্বের অসমাপ্ত রচনার দ্বারা মহাভারত সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই আগ্রহের পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য অনেক কবি মহাভারতের অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবি কাশীরামদাস মহাভারত রচনার যে সহজ ও সরল পথের সন্ধান দান করিয়াছিলেন তাহাতে পরবর্তী-কালের কবিগণের কাজও অনেক সহজসাধ্য হইয়াছিল। এবং এই অনুবাদ কর্মে ব্রতী হইয়া অনেক কবি কাশীরামদাসের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী অথবা স্বকপোল-কল্পিতকাহিনীও সংযোজন করিয়াছেন। সেইজন্য মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের পরিবর্তে অতিরিক্ত পর্বগুলির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে মহাভারতের মুদ্রিত সংস্করণের পূর্বেও বাংলাদেশে মহাভারতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল এবং এই মহাগ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ বিদ্যমান ছিল। ইহাতে কবি কাশীরাম-দাসের অবদানও সামান্য নহে।

কবির রচনার মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায় ১৮০২ সালে। ডঃ উইলিয়ম কেরীর অনুপ্রেরণাতে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকারের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৩৬ খৃঃঅব্দে তর্কালংকার মহাশয় স্বাধীন-ভাবে দুই খণ্ডে সমগ্র অষ্টাদশপর্ব কাশীরামদাসের মহাভারত বাহির করেন। তদনন্তর শ্রীমধুসূদন শীল বটতলার সংস্করণ প্রবর্তন করেন এবং তাহার পর হইতে অসংখ্য কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট 'গ' তে কবির উল্লেখযোগ্য মুদ্রিত সংস্করণগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পুঁথির সংখ্যা এবং মুদ্রিত সংস্করণের বিপুল সংখ্যাধিক্য ছাড়া অন্যত্রও কবির প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে মহাভারত আশ্রয়ী যে অসংখ্য কাহিনী-কাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছে সেক্ষেত্রেও কবির প্রভাব বিচার্য। বাংলা সাহিত্যে

---

[১] ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—অপরার্ধ—পৃঃ ১০৫

মহাভারত আশ্রয়ী যাবতীয় সৃষ্টিতে কবির প্রভাব বিদ্যমান একথা বলা যায় না। তবে সাধারণভাবে এই মন্তব্য করা যায় যে এই সকল কাব্যের রচয়িতারা বাংলা মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন আর বাংলা মহাভারত আমরা যে ভাবে পাইয়াছি তাহার অন্তরালে কবির যথেষ্ট অবদান ছিল। সেইজন্য মহাভারতের যে সকল অংশে কবির স্বকীয়তা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল অংশ অবলম্বনে, যে সব কাব্য রচিত সেগুলিকে আমরা কবির প্রত্যক্ষ প্রভাবসঞ্জাত বলিতে পারি এবং অবশিষ্ট রচনাগুলির মধ্যে আমরা কবির পরোক্ষ প্রভাবের সন্ধান পাইতে পারি। পরিশিষ্ট 'ঘ' তে এই রচনার তালিকা প্রদত্ত হইল।*

ইতিপূর্বে যে বিপুল সাহিত্য সম্ভারের উল্লেখ করা হইল তাহারা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কেবল বাঙ্গালীর রসতৃষ্ণাই নিবারণ করে নাই, তাহারা বাঙ্গালীর জনজীবনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলাদেশের জনসাধারণের সহিত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পরিচয় সাধন করাইয়াছে এবং সংস্কৃত মহাভারতের ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া তাহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ও এইরূপে তাহাদের মানসলোককে অনেকাংশে গঠন করিয়াছে। যাঁহার রচনা অনেকাংশে এই কার্য সাধন করিয়াছে তাঁহাকে জাতীয় কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাঁহার কাব্য প্রতিভার বিচারকে একটি জাতীয় ঋণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

বিশেষভাবে সংস্কৃত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কবির কাব্য বিচার করা হয় তাহা হইলে কবির কৃতিত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। সংস্কৃত মহাভারতের আকৃতি যেমন বিশাল প্রকৃতি তেমনই জটিল ও মহিমময়। আকৃতিগত বিশালতা ও প্রকৃতিগত মহিমার কথা চিন্তা করিলে ইহাকে নগাধিরাজ হিমালয়ের সহিত তুলনা করা যায়। অসংখ্য রাজা মহারাজার জটিল কাহিনীর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য রীতি নীতি, আচার, ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রবাদ সৃষ্টি হইয়াছে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" এই প্রবাদ সংস্কৃত মহাভারত সম্বন্ধে প্রযোজ্য, বাংলা মহাভারত সম্বন্ধে নহে, এইরূপ একটি গ্রন্থের সরল লোকায়ত্ত অনুবাদ যে অত্যন্ত দুরূহ কর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় হইতে অনূদিত গ্রন্থের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়, এবং কবির কৃতিত্বেরও পরিমাপ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ ইংরাজীকেই তাহাদের ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন তেমনই পূর্বে সংস্কৃতই ছিল শিক্ষিত বিদগ্ধ ব্যক্তির ভাষা। মাতৃভাষা ছিল শিক্ষাহীন জনসাধারণের। মাতৃভাষার প্রতি এতই অনাদর ছিল যে শাস্ত্রাদি পাঠ ও আলোচনা মাতৃভাষাতে ছিল নিষিদ্ধ। সেইজন্য যাঁহারা ইহা করিয়াছিলেন তাঁহারা রক্ষণশীল মানুষের কাছে সাধুবাদ পান

*** ইহাতে মহাভারত-আশ্রয়ী রচনার সামগ্রিক তালিকা প্রণয়ন করা হয় নাই, একটি সাধারণ পরিচয় দানের প্রয়াস করা হইয়াছে মাত্র।**

নাই। তাই কাশীরামদাস ও কৃত্তিবাস ওঝার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়—

"কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে এই তিন সর্ব্বনেশে ॥"

পারিপার্শ্বিক এই অবস্থার মধ্যে যে কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহা যে শিক্ষিত বিদগ্ধ ব্যক্তির জন্য নহে, শিক্ষাদীন জনসাধারণের জন্য, তাহা সহজেই বোঝা যায়।

এইরূপ পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে রচিত যে গ্রন্থ তাহা যদি মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ হইত তাহা হইলে উহা আপামর জনসাধারণের এমন প্রাণের সামগ্রী হইতে পারিত না। সংস্কৃত মহাভারতে এমন বহু অংশ আছে যেগুলি তাহাদের গ্রহণ ক্ষমতার অতীত। এখানে যে সকল তত্ত্বমূলক আলোচনা আছে, রীতি নীতির বিস্তারিত বিবরণ আছে, সেগুলির সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ থাকার কথা নয়। কবিকে সেইগুলি সযত্নে বর্জন করিতে হইয়াছে। আবার তাঁহাকে সচেতন হইতে হইয়াছে, মহাভারতের মুখ্য বক্তব্য, ইহার মূল শিক্ষা যাহাতে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হইয়া জনসাধারণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

সংস্কৃত মহাভারতে কাহিনীর যে জটিল অরণ্য বিদ্যমান তাহার মধ্যে কাহিনীর সরল যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া ইহাকে সাধারণের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করাও সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। সংস্কৃত মহাভারতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এমন অসংখ্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে যেগুলির কাহিনীগত আকর্ষণ তেমন নেই. সেইগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তাকর্ষক অন্য কাহিনী সংযোজন করিয়া এবং সেই সকল কাহিনীর মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করিয়া ইহাকে মনোহারী করিতে হইয়াছে।

সর্বাধিক দুরূহ সমস্যা হইয়াছে জীবনবোধের পরিবর্তন সাধনে। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের অনুবাদ কার্য অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ এই যে রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, যে জীবনের সহিত আমরা সকলেই সম্বন্ধযুক্ত, সেইজন্য এই কাহিনী সম্পর্কে সার্বজনীন আগ্রহ বিদ্যমান। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীতে একটি রাজ পরিবার-এর অন্তর্বিরোধের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজশক্তির উত্থান পতনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রাজকীয় জীবনযাত্রা. ইহার বৈশিষ্ট্য, ইহার কর্তব্য, অকর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ বিশেষ উৎসাহী নয়। রাজা রাজড়ার সহিত বাঙ্গালাদেশের সাধারণ মানুষের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। অধিকন্তু এই সকল রাজা ও রাজপুরুষদের কাহিনীর মধ্যে যে ক্ষাত্র জীবনবোধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত কবি কাশীরাম দাসের কালের বাঙ্গালী জীবনচেতনার এতই পার্থক্য যে সংস্কৃত মহাভারতের জীবন চেতনাকে সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের জীবন চেতনাকে বাঙ্গালীর উপযুক্ত করিয়া পরিবর্তিত করিতে হইয়াছে। ইহা কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। সেইজন্য মনে হয় কবি প্রতিভার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে এই দুঃসাধ্য কর্মও সম্ভব হইয়াছে। অন্যথায় কবির রচনা আপামর বাঙ্গালীর এইরূপ হৃদয়ের সামগ্রী হইতে পারিত না এবং এইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া সজীব থাকিতে পারিত না।

প্রতিভার কোন্ যাদুস্পর্শে কবি এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহা জানিতে

স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ যুক্তিভিত্তিক আলোচনার অভাব আমাদের ঔৎসুক্যকে অপরিতৃপ্ত রাখে। কবি কাশীরামদাসের উপর আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ তাঁহার রচনার পরিমাণ, আবির্ভাবকাল ও ব্যক্তিপরিচয় লইয়া। তাঁহার কাব্য বিচার প্রায় হয় নাই বলিলেই হয়। বিক্ষিপ্তভাবে তাঁহার রচনা সম্পাদন করিবার সময় ভূমিকায় এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সময় বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচক কিছু কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মন্তব্যে কবি প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। ইহার জন্য প্রয়োজন সংস্কৃত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার কাব্য বিচার। কারণ তাঁহার রচনা কোন মৌলিক সৃষ্টি নহে। ইহা সংস্কৃত মহাভারত আশ্রয়ে রচিত। যদিও কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ইহাকে একটি পৃথক সৃষ্টির মর্যাদা দান করিয়াছে তথাপি এই আশ্রয় গ্রন্থের পটভূমিতে বিচার না করিলে তাঁহার স্বকীয়তার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কবির কাব্য বিচার করা হইয়াছে।

কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান সমস্যা হইয়াছে কবির রচনার প্রামাণিক সংস্করণ লইয়া। প্রথমতঃ কবি যে মহাভারতের কতখানি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা লইয়া বিতর্ক রহিয়াছে। সাধারণভাবে প্রচলিত আছে—

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥"

কিন্তু কবি যে সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন ইহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র গৌরীমঙ্গল নামে একটি কাব্য প্রণয়ন করেন। এই গৌরীমঙ্গল কাব্যের পূর্বভাগে ভূমিকায় তিনি প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবিগণের একটি তালিকা দিয়াছেন। সেখানে বলা হইয়াছে—

"অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।"

ইহা ছাড়া কাশীরামদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস জগৎমঙ্গলে বলিয়াছেন—

"দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥"

কিন্তু অপরের ভণিতায় এই সকল উক্তি ছাড়া অসংখ্য পুঁথিতে পাওয়া যায় যে কবি মাত্র চারিপর্বই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই চারিপর্বের মধ্যে কোন পর্বের কতটা অংশ কবির রচিত এ বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। বিষয়টির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয় তাঁহার রচিত একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির শিরোনাম "কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্বের রচয়িতা ?" ইহা প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩৬৬ বর্ষে দ্বিতীয় সংখ্যার পৃঃ ৯৪-৯৭তে। এ বিষয়ে অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু এম. এ. ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল এম. এ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুঁথি-শালায় রক্ষিত "প্রাচীন পুঁথির পরিচয়" এর ভূমিকা অংশ পৃঃ ৭ এতেও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য ও শ্রী কয়ালের প্রবন্ধ পর্যালোচনা করিলে দুইটি অভিমতের সন্ধান পাওয়া যায়। কয়েকটি পুঁথি অনুসারে কবি মাত্র তিনটি পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে উদ্ধৃতি সহ পুঁথির উল্লেখ করা হইল—

(১) অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত বনপর্বের পুঁথি—

তবে বহুবিধ স্তুতি করি ভৃগুরাম।
হৃতবীর্য্য বনে গেল বন্দিয়া শ্রীরাম॥
মুনি বলে কহিলাঙ অগস্তি এক্ষণ।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা হরিষ বিধান॥
কাশীদাস কহে এই অমৃত সমান।
কর্ণপথে সাধুনর সদা কর পান॥
এতবধি বনপর্ব কাশীদাস কৈল।
অবধান করি সবে একান্তে শুনিল॥
না হৈতে বনপর্ব কথা সমাধান।
কাশীদাস করিলেন স্বর্গের পয়ান॥
শেখর তনয় জিত বিচারিয়া মনে।
বনপর্ব অবশেষ করিল রচনে॥ পৃঃ ১১১ ক

(২) বনপর্বের পুঁথি—সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ৭৩৯-এ উল্লেখিত হইয়াছে—

ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারত তিঁহো করিলা প্রকাশ॥
আদি সভা বন রচিল পাঁচালি।
তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্বে তিঁহো আরম্ভ করিল এই পুঁথি।
কালবশে তাঁহাকে লইতে আইল রথি॥
পরম বৈষ্ণব তিঁহো গেল স্বর্গবাসে।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিল তাঁর দাসে॥ পৃঃ ১১৩ খ

(৩) বনপর্বের পুঁথি—সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩—

ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারথের করিল প্রকাশ॥
আদি সভা বনের যে রচিল পাঁচালি।
যাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্বে তিঁহো আরম্ভিয়াছিল এই পুঁথি।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো হৈল স্বর্গগতি॥
তাহার আলয় এই করিয়া চয়ন।
অতঃপর বন পর্ব হৈল সমাধান॥ পৃঃ ১৮২ খ

(৪) বনপর্বের পুঁথি—কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ৩০১৮

কায়স্ত কুলেতে ধন্য ছিল কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
আদি সভা বনের যে রচিল পাঁচালি।
যাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংখ্যা ১৮৩৪

আদি সভা বনের জে রচিল পাঁচালি।
যাহা শুনি সর্ব লোক ধন্য ধন্য বলি॥ পৃঃ ১৯৩ ক

এই পাঁচটি পুঁথির পাঠে দেখা যায় কবি কাশীরামদাস মাত্র তিনটি পর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আবার কাহারও মতে বনপর্ব কবি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এইরূপ বিবৃতির সন্ধান অন্য পুঁথিতেও পাওয়া যায়। অতিরিক্ত আরও পাওয়া যায় যে কবি বিরাটপর্বও রচনা করিয়াছেন। যেমন—

(১) শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের সংগৃহীত পুঁথি—

ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস।
চারিপর্ব মহাভারত করিল প্রকাশ॥
আদ্য সভা বিরাটের রচিল পাঁচালি।
তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্বে তিঁহো আরম্ভ করিলা এই পুঁথি।
কালবশে মৃত্যু তার হৈল দৈবগতি॥
আগস্ত উপাক্ষণ করি হৈল কাল প্রাপ্ত।
বনের বিচিত্র কথা রহিল সমাপ্ত॥ পৃঃ ১৬৫ খ

(২) কঃ বিঃ* আশ্চর্বপর্বের পুঁথি—সংখ্যা ২৭২৪

কায়স্ত কুলেতে ধন্য ছিল কাশীদাস।
চারি পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
আদি সভা বিরাটাদি সৃজিত পাঁচালি।
ইহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্বে বন-পর্ব আরম্ভিঞাছিল এই পুঁথি।
কালবশে মৃত্যু তার হৈল উপনীতি॥ পৃঃ ২৪ ক

(৩) শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত বনপর্বের খণ্ডিত পুঁথি—

ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
আদি সভা বিরাট রচিলা পাঁচালি।
তাহা শুনি সর্বলোকে ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্বে তিঁহো আরম্ভ করিলা এই পুঁথি।
কাল বশে তাঁহাকে লইতে আইল রথি॥
পরম বৈষ্ণব তিনি গেলেন স্বর্গবাসে।
তাঁহার আজ্ঞায় বিরচিল তাঁর দাসে॥
আদি সভা বিরাট বনের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥ পৃঃ ১৪১ খ

উপরি বিবৃত তথ্যাবলী বিচারে শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয় তাঁহার পূর্ব উল্লেখিত প্রবন্ধে সার্থক

* কঃ বিঃ= কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মন্তব্য করিয়াছেন—"কাশীরাম নিঃসংশয়িত ভাবে আদি সভা ও বনপর্বের কিয়দংশ রচনা করেন। তিনি আগে বিরাটপর্ব রচনা করিয়াও পরে বনপর্ব রচনা করিতে পারেন।" আমরা বনপর্বের ৬৫টি এবং বিরাটপর্বের ৩৩৯টি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি। ব্যাপকভাবে এই পুঁথিগুলি পর্যালোচনা না করিলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীকয়াল এর অভিমত বনপর্বের শেষাংশ কবির রচিত নয়। ইহার অন্যান্য কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে অগস্ত্য উপাখ্যানের পর হইতে বিভিন্ন অনৈক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা কাহিনী বিশ্লেষণ করিবার সময় দেখিতেছি যে মহাভারতের মূল কাহিনীতে বিশেষভাবে ঘোষ যাত্রা, পাণ্ডব সমীপে দুর্বাসার উপস্থিতি, জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণ প্রভৃতি অংশে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইজন্য মনে হয় বনপর্বের শেষাংশের শাখা কাহিনীগুলি কবি রচনা না করিলেও মূল কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। তবে কবি যে বিরাটপর্বের পরবর্তী অংশ অনুবাদ করেন নাই সে বিষয়ে একরকম নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। এই সম্পর্কে অন্যান্য প্রমাণ ছাড়াও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন—"আদি সভা বন ও বিরাট এই চারি পর্বে যে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি ও শব্দ ঝংকারের পরিচয় আছে, পরবর্তী পর্বগুলিতে তাহার সমূহ অভাব। পরবর্তী পর্বের রচনা একঘেয়ে আড়ষ্ট, পুনরুক্তি দোষ তাহার পদে পদে এবং পূর্ব চারি পর্বে ব্যবহৃত বহু উপমা ও বর্ণনা পরবর্তী পর্বে বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু পূর্ববৎ তেমন সহজভাবে অবলীলাক্রমে নহে।"[১]

এই জাতীয় মন্তব্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও করিয়াছেন—"মহাভারতের পূর্বভাগে অর্থাৎ আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের রচনা ও পরার্দ্ধের রচনায় প্রভেদ অতীব স্পষ্ট।" "দেখদ্বিজ মনসিজ", "দ্বিকর কমল কমলাংঘ্রতল", "পিনোন্নতপয়োধর", "পীনঘনস্তনী" "অগ্নি অংশু যেন পাংশু" প্রভৃতি সংস্কৃতাত্মক শ্রুতি মনোহর রচনার নিদর্শন বিরাটপর্বের পর একেবারে বিরল॥[২] কবির কাব্য বিচার করিয়া আমরা আরও তিনটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাইয়াছি। সেগুলি নিম্নে বিবৃত হইল—

প্রথমতঃ কবি স্বীয় গ্রন্থ রচনার সময় বহু নূতন কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন। এই সকল নব সংযোজিত কাহিনীতে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বিরাট পর্বের পরবর্তী অংশ সমূহে নব সংযোজিত কাহিনী সংখ্যায় অত্যন্ত স্বল্প হইয়াছে এবং কবির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক কাহিনী নাই বলিলেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ কবির রচনায় হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা কখনও কৌতুকরসে অত্যন্ত প্রবল, আবার কখনও মৃদু পরিহাস রসিকতায় সমাপ্ত হইয়াছে। বনপর্ব পর্যন্ত ইহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরে আর নাই।

তৃতীয়তঃ কবি রূপ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। একই রূপের বিচিত্র বর্ণনার মধ্যে কবির প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিরাটপর্ব পর্যন্ত প্রায়শঃ এই বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় ইহার পর নাই।

উপরিবিবৃত এই সকল কারণে আমরা আদি হইতে বিরাটপর্ব পর্যন্ত অংশকে কবির

১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব কাশীদাসী মহাভারত ভূমিকা।
২ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট. সম্পাদিত—কাশীদাসী মহাভারত ভূমিকা।

রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই অংশের জন্য আমরা পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থকে আশ্রয় গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিয়াছি।* ইহার সহিত সংস্কৃত মহাভারতের পাঠ মিলাইয়া কবির কাব্য বিচার করা হইয়াছে। এবং প্রয়োজনানুসারে উদ্ভটসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই সকল উদ্ধৃতির শেষে যে পৃষ্ঠাংক দেওয়া হইয়াছে সেগুলি উক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠাংক।

সাধারণভাবে বলা হয় কাশীদাসী মহাভারত পাঠের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এ বিষয় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থে সকৌতুক মন্তব্য করিয়াছেন—

দ্রোণপর্ব সুধারস অপূর্ব আখ্যানে।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যজনে॥
শ্রীগৌরীশঙ্কর বলে পুণ্যকথা বটে।
সংশোধনে ফেলিয়াছে আমারে সংকটে॥[১]

কিন্তু এইরূপ মন্তব্য এবং সাধারণ ধারণা সত্ত্বেও দেখা যায় আদি হইতে বিরাট পর্ব পর্যন্ত অংশে পাঠের বিশেষ অনৈক্য নাই। এবং তাহা থাকিবার বিশেষ হেতু নাই। কারণ রামায়ণ বা অন্যান্য কাব্য গীতের ন্যায় গাওয়া হইত কিন্তু মহাভারত আস্বাদের রীতিটি ছিল পৃথক। ইহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা মহাভারত কখনও গাওয়া হইত কি না জানি না, তবে আসর করিয়া কথকতার মত পড়া হইত। সেইজন্য মহাভারত কাব্যে ভণিতার গোলমাল বেশী নাই।"[২] এই একই কারণে বিভিন্ন পুঁথির পাঠের মধ্যেও অনৈক্য স্বল্প। বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সপ্তদশ শতকের পুঁথি, শ্রীরামপুর মিশনের মহাভারতের দুই সংস্করণ এবং আধুনিক সংস্করণের মধ্যে পাঠোদ্ধার করিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দান করিয়াছেন।[৩] আমরাও সংস্কৃত মহাভারতের সহিত উদ্ভটসাগর মহাশয়ের গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া কবির বৈশিষ্ট্যসূচক যে সকল অংশ পাইয়াছি তাহাদের সহিত প্রাচীনতম পুঁথির পাঠ এবং ৫০ হইতে ১০০ বৎসরের ব্যবধানে আরও দুইটি পুঁথির পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি। পরিশিষ্ট 'ঙ' দ্রষ্টব্য। মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অপর তিনটি পুঁথির এই পাঠ হইতেও তাহাদের পারস্পরিক বিশেষ ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সেইজন্য আমাদের সিদ্ধান্ত যে এইরূপে আমরা কবির কাব্য বিচার করিয়া যে সকল সত্যের সন্ধান পাইয়াছি তাহাদের মূলীভূত

---

* কবির নামে প্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক পুঁথি ব্যাপকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ না করিলে তাঁহার রচনার কোনও প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদন সম্ভব নহে। এরূপ কোনও সংস্করণের অভাবে, মুদ্রিত সংস্করণগুলির মধ্যে আমরা উদ্ভটসাগর মহাশয়ের গ্রন্থটিকে আশ্রয় গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইহাকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে কারণ সম্পাদক ভূমিকায় বলিয়াছেন ৯৪০টি পুঁথি আলোচনা করিয়া তিনি এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।

১ কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর সম্পাদিত—সঠিক সচিত্র ও বিশুদ্ধ অষ্টাদশ পর্ব কাশীরামদাসের মহাভারত ভূমিকা।

২ ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড অপরার্ধ—পৃঃ ১২২

৩ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৬৯।৪৭০

রচনাংশটি কবি কাশীরামদাসের। এইভাবে আমরা কবির রচনার প্রামাণিক সংস্করণ ছাড়াও তাঁহার কাব্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করিতে পারিয়াছি। অন্ততঃ এ কথা বলা যায় কবির নামে প্রাপ্ত প্রায় ৩২১৯টি পুঁথি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া যতদিন না কবির রচনার প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদিত হইতেছে ততদিন এইরূপে কবির কাব্য বিচার করিয়া তাঁহার প্রতিভার মূল্যায়ন করা যাইতে পারে।

আমরা শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সম্পাদিত সংস্কৃত মহাভারতকে আশ্রয় গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কবি কাশীরামদাসের কাব্য বিচার করিয়া পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। এখানে সংস্কৃত মহাভারতের যে সকল অনুবাদ[১] উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যে সকল শ্লোক সংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-এর গ্রন্থের ও তাঁহার নির্দেশিত শ্লোক সংখ্যার। যেহেতু সংস্কৃত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কবির কাব্য বিচার আমাদের লক্ষ্য সেইজন্য আমরা কবির আবির্ভাব কাল অথবা তাঁহার ব্যক্তি পরিচয় লইয়া কোন আলোচনা করি নাই।

---

১ এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিত সেইজন্য সাধারণভাবে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কৃত সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থ-কলেবর অত্যধিক বৃদ্ধির আশঙ্কাতে অপরিহার্য না হইলে মূল সংস্কৃত 'শ্লোক' উদ্ধৃত হয় নাই।

প্রথম অধ্যায়

কাহিনীগত পার্থক্য

কবি কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। তিনি প্রধানতঃ ইহার কাহিনী অংশকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে সকল জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা আছে, অথবা কাহিনীর মধ্যে যে সকল দীর্ঘ বর্ণনামূলক অংশ আছে সেগুলি যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছেন। এই সকল অংশ বর্জন করিয়া কেবল মাত্র আকর্ষণীয় গল্পাংশকে গ্রহণ করায় কবির রচনা সংস্কৃত মহাভারতের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের তুলনায়, কবির রচনা কতটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, কবির গ্রহণ বর্জনের পরিমাণ, এবং উভয় গ্রন্থের মধ্যে বহিরঙ্গের পার্থক্য পরিস্ফুট করিবার জন্য, আদি হইতে বিরাটপর্ব পর্যন্ত অংশের একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রদত্ত হইল।

সংস্কৃত মহাভারতের আদি পর্বের প্রথম দুইটি উপপর্ব অনুক্রমণিকা পর্ব এবং পর্ব সংগ্রহ পর্ব। সংস্কৃত মহাভারতের ন্যায় বিশাল গ্রন্থ আরম্ভের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি প্রথম দুই উপপর্বে সাধিত হইয়াছে। অনুক্রমণিকা উপপর্বে সমগ্র মহাভারতের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপপর্ব পর্বসংগ্রহ পর্বে সমগ্র গ্রন্থটিকে পর্বানুসারে বিশ্লেষণ করিয়া সূচীপত্রের আকারে ইহার ঘটনা সমূহকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুই উপপর্ব কাশীরামদাসের গ্রন্থে বর্জিত হইয়াছে। কাশীরামদাসের রচনায় প্রধানতঃ কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথমে কাহিনী বর্ণনা করিলে পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর পূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণে আগ্রহ থাকিবে না সম্ভবতঃ এই কারণে অপ্রয়োজন বোধে এই দুই উপপর্ব বর্জিত হইয়াছে।

আদিপর্বের অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে কবি আদিবংশের সরল ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার ফলে এই কাহিনী সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজ অনুধাবন যোগ্য হইয়াছে। ইহার জন্য কবি সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীর ধারাবাহিকতা ঈষৎ পরিবর্তন করিয়াছেন। যে সকল কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতে পুনরুক্ত হইয়াছে সেইগুলিকে তিনি বর্জন করিয়াছেন। এইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের আদি পর্বে ৪০-৪৩ অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ এই অধ্যায় সমূহে বিবৃত জরৎকারুর কাহিনী কবি আদি পর্বের ১০-১১ অধ্যায় অনুসরণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এই একই কারণে আদি পর্বে ৫৪-৫৭ অধ্যায়-এ আদি বংশ অবতরণ উপপর্বে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ব্যাসের উপস্থিতি এবং ব্যাসদেবের আদেশে বৈশম্পায়নের মহাভারত বর্ণনা উপলক্ষে পুনর্বার সমগ্র গ্রন্থের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও বর্জিত হইয়াছে।

গল্পাংশের উপর কবি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়া আদিপর্বের ৮৯-৯০ অধ্যায় বর্ণিত আদি বংশের ধারানুক্রমিক নীরস বিবরণ বর্জন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে বংশের প্রতিটি ব্যক্তির নামোল্লেখ অপরিহার্য, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া মনোহর কাহিনী কাহিনী রচনার সুযোগ নাই, তাঁহারা কাহিনী বিচারে গৌণ সেইজন্য পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

এই সকল পরিত্যক্ত অংশের পরিবর্তে চিত্তাকর্ষক কিছু নূতন কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। সমুদ্রমন্থন কাহিনী, পারিজাত হরণ, অর্জুন সুভদ্রার কাহিনী, জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি কয়েকটি নব সংযোজিত কাহিনী।

সভাপর্বে সংস্কৃত মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে বিভিন্ন রাজাগণ কর্তৃক আনীত উপহার দ্রব্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এই পর্বের ৪৯-৫১ অধ্যায়ে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে সভা ৩২-৩৫ অধ্যায়ে। এই সকল নীরস বিবরণ হইতে কবির পাঠক সম্প্রদায় কাহিনীগত কোন আকর্ষণ পাইবে না, সেইজন্য কবি ইহা বর্জন করিয়াছেন। রাজসূয় যজ্ঞেরও বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে সংস্কৃত মহাভারতে। কবি তাঁহার রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের বিস্তারিত বিবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরিবর্তে একাধিক নূতন কাহিনী রচনা করিয়া কাহিনীগত আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

বনপর্বে কাহিনীগত আকর্ষণ নাই এরূপ বিশাল অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অস্ত্র শিক্ষার জন্য এবং দেব অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুন যখন বনবাসকালে স্বর্গলোক গমন করিয়াছেন তখন লোমশ মুনি আসিয়া পাণ্ডবগণকে তীর্থযাত্রা করিবার উপদেশ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের অগণিত তীর্থের বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। বনপর্বের ৬৭ হইতে ৭৫ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ৩১৮টি তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে। কাশীরামদাস ইহাদের মধ্যে মাত্র ৮।১০টির উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে পাণ্ডবগণ যখন তীর্থে গমন করিয়াছেন তখন তীর্থযাত্রা উপপর্বে বন ৬৬ হইতে বন ১২৯ এই দীর্ঘ অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন তীর্থস্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অসংখ্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলির মধ্যে অগস্ত্য লোপামুদ্রার কাহিনী, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, শ্যেন কপোতের উপাখ্যান প্রভৃতি যে সকল কাহিনীতে আকর্ষণ আছে সেইগুলি গ্রহণ করিয়া অপর কাহিনীসমূহ কবি বর্জন করিয়াছেন। পরিত্যক্ত কাহিনীর মধ্যে সোমপাদ রাজকন্যা শান্তা ও ঋষ্য-শৃঙ্গের কাহিনী, ভৃগুপুত্র ঋচীক ও সত্যবতীর কাহিনী, সোমক রাজার কাহিনী উল্লেখ-যোগ্য। এইরূপ আকর্ষণের অভাব ও নীরস তত্ত্বালোচনার জন্য কবি বনপর্বের অন্তর্গত "মার্কণ্ডেয় সমস্যা" (বন ১৫৩-১৯৫) দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ (বন ১৯৬-১৯৮), মৃগস্বপ্নোদ্ভব (বন ২১৩), ব্রীহিদ্রৌণিক (বন ২১৪-২১৬) প্রভৃতি উপপর্বগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিরাটপর্বের প্রায় সমগ্র অংশ অনুসৃত হইয়াছে। পরিবর্জন নাই বলিলেই হয় কেবল যুদ্ধ বর্ণনা অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপে কবির রচনায় আকৃতি অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। কবি কাশীরামদাস অবশ্য সাধারণভাবে সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী

অনুসরণ করিয়াছেন। সচেতনভাবে কবি কাহিনীর মধ্যে পৃথকভাবসঞ্চারের প্রচেষ্টা করেন নাই, অথবা মূল কাহিনীকেও ভিন্নরূপে বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু কাব্য সৃষ্টির অনিবার্য নিয়মবশতঃ কবির দেশ ও কাল তাঁহার রচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ইহাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তিনি মহাভারতের কাহিনী কাঠামোটি মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাঠামোর উপর নিজস্ব উপকরণ দিয়া যে প্রতিমা তিনি নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে মহাকাব্যের বিশালতা ও মহিমা খর্ব হইয়াছে কিন্তু উহা সাধারণ মানুষের প্রাণের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কবির কাব্য বিচার করিয়া যে সকল অংশে প্রকৃতিগত পার্থক্যের এবং কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে পর্বানুসারে তাহাদের আলোচনা করা হইল।

আদিপর্ব

আদিপর্বে নিম্নলিখিত কাহিনীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ও নব সংযোজনের সন্ধান পাওয়া যায়—

১। সমুদ্রমন্থন কাহিনী
২। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান
৩। নাগরাজ্যে ভীম
৪। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর
৫। সুভদ্রা হরণ
৬। পারিজাত হরণ
৭। সত্যভামার ব্রত উদ্‌যাপন
৮। জনমেজয়ের ধর্মহিংসা ও অশ্বমেধ যজ্ঞ

বর্তমানে এই সকল কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

সমুদ্রমন্থন কাহিনী

সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্বের ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়-এ সমুদ্রমন্থন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনায় সমৃদ্ধ হইয়া একটি বিশেষ ভাবসৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। কবি কাশীরামদাস ইহার গল্পাংশকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নূতন গল্প সংযোজন করিয়াছেন কিন্তু বর্ণনামূলক অংশ প্রায় পরিহার করিয়াছেন।

সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী সুমেরু পর্বতের একটি সুন্দর বর্ণনার দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। দেবগণ এই সুমেরু পর্বতে বসিয়া সমুদ্রমন্থনের কথা আলোচনা করেন। "ইহা আপনার প্রভার গুণে সর্বদাই চকমক করিতেছে। তাহাতে তাহাকে একটি উৎকৃষ্ট

তেজঃপুঞ্জের ন্যায় দেখা যায়, সে নিজের স্বর্ণময় শৃঙ্গের দ্বারা সূর্যের প্রভাকে প্রতিহত করে, স্বর্ণই তাহার অলংকার, তাহাতে তাহাকে আশ্চর্য বলিয়াই বোধ হয়। তাহার উপরে দেবগণ ও গন্ধর্বগণ বিচরণ করিয়া থাকেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। অধার্মিক লোকেরা সেখানে আরোহণ করিতে পারে না, ভয়ংকর হিংস্র জন্তুরা তাহার উপরে সর্বদা বিচরণ করে, দিব্য লতা সমূহের কিরণে তাহার নানাস্থান উদ্ভাসিত হয়, সে নিজের উচ্চতার গুণে স্বর্গলোক আবৃত করিয়া রহিয়াছে, সে অন্য লোকের মনেরও অগম্য আর তাহাতে বহুতর নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে, বহুবিধ বৃক্ষ আছে এবং নানাবিধ পক্ষী মধুর রব করিয়া বিচরণ করে। সেই সুমেরু পর্বতে একটি শৃঙ্গ আছে তাহা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত এবং তাহাতে বহুতর রত্ন আছে, আর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন শৃঙ্গ নাই। একদা তপোনিয়মশালী মহাপ্রভাব সম্পন্ন স্বর্গবাসী সমস্ত দেবগণ সুমেরু পর্বতের সেই শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সে স্থানে বসিয়া অমৃত আহরণ করিবার জন্য মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন।" (আদি ১৩।৪-১০) এইরূপ একটি বর্ণনা রহিয়াছে সমুদ্রমন্থনের মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বতের। এই ধরণের বর্ণনার দ্বারা কাহিনী আরম্ভ হওয়ায়, কাহিনীর মধ্যে একটি মহিমময় ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। মনে হয় এই কাহিনী সাধারণ মানবলোকের সীমা অতিক্রম করিয়া দেবলোকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারতের এই বর্ণনা বাদ দিয়া কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন—

"ব্রহ্মারে কহিল পূর্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ লৈয়া মন্থহ সাগর॥
অমৃত উৎপত্তি হবে সমুদ্র মন্থনে।
দেবগণ অমর হৈব সে সুধা পানে॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্বত যথা করিল গমন॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
ঊর্দ্ধে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন॥
উপাড়িতে বহু শ্রম কৈলা দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে॥" পৃঃ ১২

পর্বতের বর্ণনার ন্যায় যুদ্ধ বর্ণনাও কাশীরামদাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনা উজ্জ্বল ও মনোগ্রাহী। কাশীরামদাস এই বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে অমৃতের জন্য দেবাসুরের তীব্র সংগ্রামের একটি দীর্ঘ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। মন্থন শেষে দৈত্যগণ যখন দেখিল দেবতাদের চক্রান্তে তাহারা অমৃত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তখন তাহারা দেবতাদের আক্রমণ করিল এবং "দুই পক্ষ হইতে সহস্র সহস্র বিশাল ও তীক্ষ্ণ কুন্ত, সুতীক্ষ্ণ তোমর ও নানাবিধ অস্ত্র পড়িতে লাগিল। তাহার পর কতগুলি অসুর চক্র দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া বহু পরিমাণে

রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। আবার অন্য কতকগুলি তরবারি শক্তি ও গদা দ্বারা আহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিল। অসুরগণের স্বর্ণালংকার-ভূষিত মস্তক-গুলি ভয়ংকর পট্টিশ দ্বারা ছিন্ন হইয়া অনবরত যুদ্ধস্থলে পতিত হইতে লাগিল। নিহত অসুরগণের সমস্ত অঙ্গ রুধিরে লিপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহারা ধাতুরাগরঞ্জিত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়াছিল।

সূর্য অস্তোন্মুখ হইলে দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই স্থানে হাহাকার হইতে লাগিল। দূরে লৌহময় তীক্ষ্ণ পরিঘ নিক্ষেপ করিয়া এবং নিকটে মুষ্টি প্রহার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের কোলাহল যেন স্বর্গে যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তুমি ছেদন কর। তুমি বিদারণ কর। তুমি ধাবিত হও। তুমি নিপাত যাও। এইরূপ ভয়ংকর শব্দ যুদ্ধের সকল দিকেই শুনা যাইতে লাগিল। এইরূপ ভয়ংকর শব্দ হইতে থাকিলে নর ও নারায়ণ সেই যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। তখন নরদেবের দিব্যধনু দর্শন করিয়া ভগবান নারায়ণও দানব দলনকারী সেই সুদর্শনচক্র স্মরণ করিলেন। তাহার পর চিন্তা করিবা-মাত্রই সেই ভয়ংকর সুদর্শন চক্র আকাশ হইতে আগমন করিল। সে চক্র অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ছিল এবং শত্রুপক্ষের ভয় জন্মাইত, তাহার কিরণজাল ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং গোল আকৃতি কোন স্থানেই বিকৃত ছিল না। হস্তী শুণ্ডের ন্যায় দীর্ঘবাহু নারায়ণ শত্রু-ধ্বংসকারী মহাশক্তিশালী অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল সেই ভীষণ সুদর্শনচক্র মহাবেগে অসুরগণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণের হস্তনিক্ষিপ্ত বেগবান সেই সুদর্শনচক্র অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিয়া সহস্র সহস্র দৈত্য দানবকে ভস্মীভূত করিল কোথাও দগ্ধ করিল এবং কোথাও ছেদন করিয়া ফেলিল, তাহার পর পিশাচের ন্যায় সেই অসুরগণের রক্ত পান করিল।

মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ মহাবলবান সহস্র সহস্র অসুরও অকাতরচিত্তে আকাশে উঠিয়া বারবার পর্বত নিক্ষেপ করিয়া তখন দেবগণকে দলিত করিতে লাগিল। তারপর নানা-বর্ণের মেঘের মত ভয়ংকর পর্বত সকল পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে সশব্দে ভূতলে পড়িতে লাগিল, তাহাতে সে পর্বতগুলির উপরের সংযুক্ত স্থানগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বারবার অত্যন্ত গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই যুদ্ধ স্থানে আকাশ হইতে অসুর নিক্ষিপ্ত বৃহৎ বৃহৎ পর্বত পতিত হওয়ায় সকল দিকের বন ও ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। তদনন্তর নরদেব সেই ভয়ংকর অসুর যুদ্ধে বাণ দ্বারা অসুর নিক্ষিপ্ত পর্বতশৃঙ্গগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া অপর স্বর্ণপুংখ বাণদ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সেই মহাসুরগণ দেবগণের নিকট পরাজিত হইয়া এবং আকাশে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সুদর্শনচক্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভূগর্ভে এবং সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করিয়া পলাইয়া গেল।" (আদি ১৫।১১-২৯)

এই ধরণের বর্ণনা সম্বলিত হইয়া সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী যে বিচিত্র রসমাধুর্য লাভ করিয়াছে কাশীরামদাসের কাহিনীতে তাহার পরিচয় নাই। তিনি এই জাতীয় যুদ্ধ বর্ণনা প্রায় সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন অথবা সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

কাশীরামদাস অমৃত হইতে বঞ্চিত দৈত্যগণের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"মারহ অমরগণে বলিয়া উঠিল।
প্রলয় কালেতে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে বরিষে প্রচুর।
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ কৈলা সুরাসুর ॥
সুরাপানে বলবান যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্লান্ত কলেবর ॥
না পারিল ভঙ্গ দিয়া গেল দৈত্যজন।
আপন আলয়ে চলি গেলা দেবগণ ॥" পৃঃ ২৫

যে কৌশলে সংস্কৃত মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনা কবি পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার মত। সুধাপানে দেবগণ বলবান হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাদের মন্থনজাত শ্রান্তিও দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা নবতেজে পূর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের সহিত মন্থনক্লান্ত দৈত্যগণের যুদ্ধ তীব্র হইল না। দৈত্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল।

এই জাতীয় বর্ণনা অংশের পরিবর্জন ব্যতীত কাশীরামদাসের বর্ণিত উপাখ্যানে কয়েকটি নূতন গল্পাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীতে অমৃত লাভই ছিল সমুদ্রমন্থনের লক্ষ্য। সমুদ্রমন্থনে যখন অমৃতলাভ হইল তখন মন্থন সমাপ্ত হইল। কিন্তু কবি কাশীরামদাস বর্ণিত কাহিনীতে পাওয়া যায় অমৃত নহে লক্ষ্মীর জন্য সমুদ্রমন্থন চলিতেছিল। সংস্কৃত মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র হইতে উদ্ভূত বহুবিধ সামগ্রীর মধ্যে লক্ষ্মীও সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। এই স্থলে কবি বর্ণনা করিয়াছেন মন্থনকালে ধন্বন্তরি যখন অমৃত কমণ্ডলু হস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলেন তখন দেবতারা আনন্দিত হইয়া পুনর্বার সিন্ধু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্বে জলপতি বরুণ মন্থনে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি পুনর্বার মন্থনের বেদনা সহ্য করিতে পারিলেন না। কিরূপে মন্থন বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে তিনি তাঁহার পাত্রমিত্র সকলের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। সেই মন্ত্রণায় জলরাজ বুঝিতে পারিলেন যে লক্ষ্মী স্বর্গত্যাগ করিয়া সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছেন, সেইজন্য স্বর্গ লক্ষ্মীচ্যুত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। তাই দেবগণ লক্ষ্মী লাভ করিবার জন্য সমুদ্র মন্থন করিতেছেন। সুতরাং দেবগণ লক্ষ্মীলাভ করিলেই সমুদ্রমন্থনে বিরত হইবেন ইহা জানিয়া বরুণদেব স্থির করিলেন নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীকে অর্পণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবিলম্বে "দিব্য রত্নগণে চতুর্দোল" নির্মাণ করিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া নারায়ণ সকাশে চলিলেন। ভক্তির আবেশে কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন দুন্দুভি শব্দ, হুলুধ্বনি এবং জয়ধ্বনির মধ্যে চতুর্দোলায় বরুণদেব বাহিত হইয়া লক্ষ্মী নারায়ণ সমীপে চলিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমরমণ্ডল করযোড় করিয়া ভূমিতলে প্রণাম করিয়া পড়িলেন এবং চতুর্দিকে দেবতা ও ঋষিগণের স্তবের মধ্যে নারায়ণের নিকট সকলে উপনীত হইলেন। নারায়ণের নিকট উপনীত হইয়া বরুণ বিষ্ণুস্তব করিয়াছেন এবং স্তবশেষে লক্ষ্মীকে নারায়ণের

নিকট সমর্পণ করিয়াছেন। কমলাসনা লক্ষ্মী বাঙ্গালীর বিশেষ আরাধ্যা। তিনি ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাঙ্গালী চিত্তে তাঁহার স্থান ও প্রভাব সর্বাধিক। কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্মীকে এইরূপ প্রাধান্য দিয়া কবি কাশীরামদাস বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিয়াছেন।

সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত কাশীরামদাসের মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানে আরও পার্থক্য রহিয়াছে। পুনর্বার সিন্ধু মন্থন করার এবং মহাদেবের কালকূট বিষপান সম্পর্কে সংস্কৃত মহাভারতে মাত্র তিনটি শ্লোক আছে (আদি ১৪।৪৩-৪৫)। সংস্কৃত মহাভাবতে আছে সমুদ্রকে অত্যধিক মন্থন করার জন্য কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। সেই বিষ জগৎকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা বাক্যে মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ কবিয়া নীলকণ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হন। কাশীরামদাসের কাহিনী একটু পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাশীবামদাস বর্ণনা করিযাছেন কলহপরায়ণ নারদ মুনি কৈলাসে হবগৌরীব নিকট সমুদ্রমন্থনেব সংবাদ প্রদান কবিয়া তাঁহাদের শান্ত দাম্পত্য জীবনযাত্রাব মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি কবিযাছেন। নাবদ মহাদেবকে বলিয়াছেন ত্রিলোচনকে বাদ দিয়াই অন্য দেবগণ সমুদ্রমন্থন কবিযাছে এবং মন্থনজাত সম্পদ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিযা লইযাছে। এই সংবাদে সর্বত্যাগী শঙ্করেব কিছু যায় আসে না, তিনি নিরুত্তব থাকেন। কিন্তু মহাদেব ইহাতে বিচলিত না হইলেও পার্বতীর পক্ষে পার্থিব সম্পদের প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব নয। তাই স্বামীব ঔদাসীন্যে পীড়িত হইয়া পার্বতী নাবদকে উদ্দেশ কবিযা মহাদেবের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ করেন। উদাসীন মহাদেবকে বিদ্ধ কবিযা পার্বতী বলিযাছেন—

"কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলে যথা না দেয় উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যাব।
কৌস্তুভাদি মণিরত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ যাব ভক্ষ্য সিদ্ধি গুলি ॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন।
পারিজাতে কি বা কাজ ধুতুরাভরণ ॥
এ সকল চিন্তি মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিয়া উহাবে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল ॥" পৃঃ ১৬

মহাদেব সহাস্যে পার্বতীর এই অভিমান মিশ্রিত ক্রোধকে গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাদেবেব হাস্যে পার্বতীর ক্রোধ প্রশমিত হয় না। স্বামীর ঔদাসীন্যকে তীব্র আঘাত করিয়া পার্বতী আরও বলেন—

"দেবী বলে ভার্যা পুত্রে গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যোগ্য এ সব বচন ॥

বিভূতি বিভব বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোনজনে॥
সংসারেতে যে জন বিমুখ এ সকলে।
তাহারেই কাপুরুষ সর্বলোকে বলে॥" পৃঃ ১৭

কবির এই বর্ণনা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে এই দেবতা কৈলাসবাসী নহে "ভার্যাপুত্রে গৃহী" সাধারণ বাঙ্গালী মাত্র। তাই স্ত্রীর নিকট হইতে 'কাপুরুষ' আখ্যা লাভ করিয়া মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"পার্বতীর হেন বাক্য শুনিয়া শংকর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থর থর॥" পৃঃ ১৭

এইরূপে হরগৌরীর সংবাদের মধ্য দিয়া কাশীরামদাস পরিবারকেন্দ্রিক বাঙ্গালীর জীবনচিত্র অংকন করিয়া তাঁহার পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্ত হরণ করিয়াছেন। এই অংশে মহাদেব ও পার্বতীর দেব দেবী পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। গার্হস্থ্য জীবনচিত্রের মধ্যে তাঁহাদের মানবিক রূপই পরিস্ফুট হইয়াছে। নারদও দেব ঋষি নহেন। তিনিও কলহসৃজননিপুণ সাধারণ মানুষ, যিনি নিজের প্রত্যক্ষ লাভ না হইলেও অপরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হন।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিব বোধ হয় সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। শিবকে কেন্দ্র করিয়া লৌকিক কাহিনীর অভাব নাই। শিবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বাঙ্গালীর সমস্ত কল্পনা উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কবি ক্রুদ্ধ মহাদেবের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ও মনোগ্রাহী। মহাদেব মন্থন স্থলে উপনীত হইয়া সমস্ত দেবগণকে ভর্ৎসনা করিয়া পুনর্বার সিন্ধু মন্থন করিতে বলেন। এই মন্থনে অমৃতের পরিবর্তে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। তখন দেবগণের স্তুতিতে মহাদেব সেই বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন।

সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে অন্য একটি ক্ষেত্রে সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কবি কাশীরামদাসের পার্থক্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপ ধারণ করিয়া অমৃত বণ্টনে দানবগণকে ছলনার কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে বলা হইয়াছে "নারায়ণ আশ্চর্য্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দানবগণের নিকট উপনীত হইলে দানবগণ ও দৈত্যগণ তদ্গত হইয়া সেই অমৃত সেই স্ত্রীলোকটির নিকট সমর্পণ করিল। কিন্তু দানবগণকে না দিয়া দেবতাদের মধ্যেই সেই অমৃত বণ্টন করেন। তাহাতেই দেবতা ও দানবের মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হইল।" (আদি ১৪।৪৭-৪৯)

কবি কাশীরামদাস এই কাহিনী বিবৃতিতে প্রথমে মোহিনী রূপধারী নারায়ণের একটি সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। মোহিনী বেশী নারায়ণের এই অপরূপ রূপে 'সুরাসুর তিনপুর ঢলিয়া পড়িল।' কবি বর্ণনা করিয়াছেন এমন কি যোগীশ্বর মহাদেব পর্যন্ত অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। চৈতন্যলাভ করিবার পর মহাদেবের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কবি—

"চৈতন্য পাইয়া হর একদৃষ্টে চান।
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান॥" পৃঃ ২১

ইহাতে মোহিনী মহাদেবকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন—

"কন্যা বলে যোগী তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাইয়া এস বুড়া হেন ছিন্ন মতি॥" পৃঃ ২২

কিন্তু এই সামান্য কথায় মহাদেব নিরস্ত হন না। নারায়ণ মহাদেবের প্রতি রূঢ়তর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন—

"কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
মোর পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ॥
তৈল নাই, অঙ্গে ছাই শিরে জটাভার।
তাম্বুল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার॥
কাঁকালে বসন নাই বেড়া বাঘছড়ি।
দীঘল হাতের নখ পাকা গোঁফ দাড়ি॥
না জানি আছয়ে কি না বদনে দশন।
অঙ্গের দুর্গন্ধে উঠে মুখেতে বমন॥
মোর গাত্র গন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটায় দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত॥
কোন লাজে চাহ মোরে করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুই আইস মোর পাশ॥" পৃঃ ২২

কিন্তু এইরূপ রূঢ় বাক্যেও কোনও ফলোদয় হয় না। শ্রোতৃচিত্তে বিপুল হাস্যের উদ্রেক করিয়া মহাদেব মোহিনীবেশী নারায়ণকে বিপুল মিনতি সহকারে বলেন—

"শিব বলে কন্যা এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা নাহি জানি আর॥
ত্যজিলাম সর্ব কর্ম ভার্যা পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন॥" পৃঃ ২৩

এইরূপে মোহিনীবেশী নারায়ণ ও মহাদেবের কথোপকথনে যথেষ্ট হাস্যরস সৃষ্টি করিয়া তাঁহার কাহিনীকে কবি আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। সবশেষে কবি বর্ণনা করিয়াছেন মোহিনীবেশী নারায়ণকে লাভ করিতে ব্যর্থ মনস্কাম হইয়া মহাদেব যখন স্বীয় বক্ষে ত্রিশূল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন হরি ও হরের মিলন হইয়াছে, এবং হরি ও হরের যুগ্মরূপের বর্ণনায় কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান

বর্ণনা, গল্পাংশ, সংলাপ, ও চরিত্র এই চারিটি ক্ষেত্রে পার্থক্যের জন্য দুইটি গ্রন্থের কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যানে এই চারিটি ক্ষেত্রেই পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত মহাভারতে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে আদি পর্বের ৮২-৮৪ অধ্যায়। এই কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে রাজা

দুষ্মন্তের চরিত্র এবং তাঁহার রাজত্বের অবস্থা বর্ণনার মধ্যে। আদি পর্বের ৮২ অধ্যায়-এর অন্তর্গত ১৩টি শ্লোকে এই বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। কবি কাশীরামদাস ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর সংস্কৃত মহাভারতে রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া যাত্রার ও মৃগয়ার বর্ণনা রহিয়াছে—"মহাবীর দুষ্মন্ত কোন সময় প্রচুর সৈন্য ও বাহন লইয়া হস্তী ও বাহন সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়া করিবার জন্য নিবিড় অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় অতি সুন্দর হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গে লইয়া এবং তরবারি, শক্তি, গদা, মুষল, কুন্ত ও তোমরধারী যোদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। সেইভাবে তিনি চলিতে লাগিলে, যোদ্ধাদিগের সিংহনাদ, শংখ ও দুন্দুভি ধ্বনি, হস্তীগণের বৃংহিত শব্দ, রথচক্রের শব্দ, নানাবেশধারী, ও নানাবিধ অস্ত্রধারী বীরগণের কণ্ঠধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব এবং বীরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটনের শব্দে ভয়ংকর কোলাহল হইতে লাগিল।" (আদি ৮৩।৩-৭) এই শোভাযাত্রা যখন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিল, তখন সেই কাননের এবং কাননাভ্যন্তরে রাজার মৃগয়ার সুন্দর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে—"তাহার পর সেই পুরবাসী ও কাননবাসীরা রাজার অনুমতিক্রমে ফিরিয়া গেল। তদনন্তর রাজা গরুড়তুল্য উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া তাহার শব্দে ভূমণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন এবং যাইতে যাইতে নন্দন কানন তুল্য একটি বন দেখিতে পাইলেন। সে বনে বহুতর বিল্ব, আকন্দ, খদির, কদ্বেল, ও ধব প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। পর্বতস্থ পাথর পড়িয়া প্রায় সকল স্থানই উঁচু নীচু করিয়াছিল। তাহাতে জল বা মানুষ ছিল না, আর সে বন সিংহ, হরিণ ও অন্যান্য জন্তুগণে ব্যাপ্ত ছিল এবং বহু যোজন বিস্তৃত ছিল। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজা দুষ্মন্ত, ভৃত্য, সৈন্য বা বাহন সমূহের সহিত মিলিয়া নানাবিধ পশুবধ করিতে থাকিয়া সেই বনটা তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। তিনি সেই বনে বহুতর ব্যাঘ্রকে নিপাতিত ও বিদারিত করিতে লাগিলেন। রাজা বাণ দ্বারা দূরবর্তী পশুগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন এবং তরবারি দ্বারা নিকটবর্তীদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন।......কতকগুলি পরিশ্রান্ত হরিণ ক্ষুধার্ত ও পিপাসায় কাতর হইয়া যখন ভূতলে পড়িল অমনি ক্ষুধার্ত নররূপী ব্যাঘ্রগণ সেগুলিকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য অস্থি হইতে হরিণের মাংস নিষ্কাশিত করিয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্বক যথানিয়মে তাহাতে পাক করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল। কতকগুলি বলবান হস্তী অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভয়ে শুঁড়ের অগ্রদেশ সংকুচিত করিয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল, অস্ত্রের আঘাতে বিশাল বন্য হস্তীগুলির শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় তাহারা বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতে করিতে দৌড়াইতে থাকিয়া বহুতর মনুষ্যকে নিষ্পেশিত করিতে লাগিল। রাজা সিংহগুলিকে মারিয়া ফেলিলেন, অবিশ্রান্ত বাণবর্ষী সৈন্য রূপ মেঘ সকল সে বনটাকে ছাইয়া ফেলিল, এই অবস্থায় সে বনটা নিহত পশুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।" (আদি ৮৩।১৫-৩১) সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী এইরূপ বিশদ বর্ণনা সম্বলিত হওয়ায় মৃগয়ারত রাজা দুষ্মন্ত এবং তাঁহার অনুচরদিগের দ্বারা আলোড়িত সমগ্র বনস্থলী চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কবি কাশীরামদাসের বর্ণিত কাহিনীতে এই বৈশিষ্ট্য নাই। তিনি অনেক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দান করিয়াছেন—

"মহাপরাক্রমে রাজা রূপগুণবন্ত ।
পৃথিবীতে একছত্র করিল দুষ্মন্ত ॥
মৃগয়ায় বড় রত মহাধনুর্দ্ধর ।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর ॥
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন ।
সসৈন্য-এ বেড়িল রাজা এক মহাবন ॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ ।
অনেক মারিল রাজা না হয় গণন ॥
যতেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয় ।
শকট-এ পূরিল কেহ কান্ধে করি লয় ॥
কোন কোন জন তথা খায় পুড়াইয়া ।
তবে এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া ॥" পৃঃ ৬৯

সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"কতকগুলি সৈন্য অস্থি হইতে হরিণের মাংস নিষ্কাশিত করিয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্বক যথানিয়মে পাক করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল।" "কবি কাশীরামদাসও বলিয়াছেন "কোন কোন জন তাহা খায় পুড়াইয়া।" সুতরাং কবি যে কত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা বোঝা যায়। কিন্তু উভয় গ্রন্থে প্রদত্ত বর্ণনাতে যে পার্থক্য তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত।

রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া যাত্রার এবং মৃগয়ার বর্ণনাব মধ্যে উভয় গ্রন্থের পার্থক্য যেরূপ সুপরিস্ফুট সেইরূপ পার্থক্য তপোবন বর্ণনাতেও। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া একাকীই একটি বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অন্য একটি মনোহর বনে প্রবেশ করিলেন। সংস্কৃত মহাভারতের আদি ৮৪।১৯-২৬ সংখ্যক ও আদি ৮৪।৩৮-৫২ সংখ্যক শ্লোকাবলীতে এই বনের মধ্যে অবস্থিত তপস্বীদিগের আশ্রমের বর্ণনা রহিয়াছে। এই বর্ণনা এত সুন্দর ও উজ্জ্বল যে ইহা কাহিনীর মধ্যে একটি তাৎকালিক রূপ সঞ্চারিত করিয়াছে। কিন্তু কবি কাশীরামদাসের প্রদত্ত বর্ণনাতে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হয় নাই। কারণ তাঁহার প্রদত্ত তপোবন বর্ণনা অনেকাংশেই প্রকৃতি বর্ণনাতে পরিণত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের বর্ণনাংশ অনুধাবন করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইবে। সংস্কৃত মহাভারতে কণ্বমুনির আশ্রমের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"সেই আশ্রমে বিস্তৃত ভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে প্রধান প্রধান ঋক্‌বেদী ব্রাহ্মণগণ পদ ও ক্রম অনুসারে ঋগ্বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন, রাজা তাহা শুনিতে লাগিলেন। যজ্ঞবিদ্যায় পারদর্শী ও অঙ্গ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রতনিষ্ঠ মধুর সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সেই যজ্ঞটি শোভা পাইতে লাগিল। ভারণ্ড নামক সামবেদের অংশ এবং অথর্ব বেদের শেষাংশ পাঠ করিবার সময় ব্রতনিষ্ঠ মুনিগণের সেই স্বরে তখন সেই আশ্রমটিও শোভা পাইতে লাগিল। প্রধান প্রধান অথর্ববেদী এবং সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ পদ ও ক্রমসংযুক্ত সেই সেই সংহিতা পাঠ করিতেছিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ উদাত্ত প্রভৃতি স্বর অনুসরণ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে ছিলেন। তাহাতে সেই আশ্রমটি দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যজ্ঞ

বিধান, যজ্ঞাঙ্গের পরিপাটি শিক্ষা শাস্ত্র, ন্যায়দর্শন, উপনিষদ এবং বেদশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ; উহা বিধানে এবং অন্য বেদোক্ত কর্মে অন্যবেদীরও অধিকার নিরূপণে নিপুণ; ধ্যানাদি কার্যাভিজ্ঞ ও মুক্তি সাধক কর্মনিরত ব্রাহ্মণগণ; পঞ্চাঙ্গ অধিকরণে বিশেষজ্ঞ, ব্যাকরণ, ছন্দ ও নিরুক্তজ্ঞ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ; রসায়নভিজ্ঞ আয়ুর্বেদবিৎ পশুপক্ষীর রবের অর্থজ্ঞ এবং বিশাল বিশাল পুস্তকধারী ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সুনিপুণ ব্রাহ্মণগণ যে সকল আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন, রাজা সেই সকল শুনিতে লাগিলেন। শত্রুহন্তা দুষ্মন্ত ভিন্ন স্থানে দেখিতে পাইলেন যে কেহ কেহ ধ্যান, কেহ কেহ জপ ও কেহ কেহ হোম করিতেছেন। নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর আসন যত্নপূর্বক পাতিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবতার ঘরগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা দেখিয়া রাজা নিজেকে ব্রহ্ম লোকস্থিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কণ্বের তপস্যায় সুরক্ষিত মঙ্গল জনক এবং তপোবনের সমস্ত গুণসম্পন্ন সেই আশ্রমটি দেখিয়া রাজার আশা মিটিল না।" (আদি ৮৪।৩৮-৫১)

কাশীরামদাস এই বর্ণনাকে প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে কাশীরামদাসের গ্রন্থে প্রায়ই মধুর প্রকৃতি বর্ণনা দেখা যায়। তাই সংস্কৃত মহাভারতের অনুরূপ না হইলেও বন বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে—

> "হিরণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
> চৈত্ররথ সম সে মুনির আশ্রম॥
> নানা জাতি বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
> নানা জাতি পক্ষী তথা সদা কেলি করে॥
> মধুচক্র ডালে ডালে ধরে তরুগণ।
> বায়ু তেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণ॥
> নানা পক্ষীগণ তাহে সদা ক্রীড়া করে।
> ভক্ষকেরে ভক্ষ্য নাই মুনিরাজ ডরে॥
> মালিনী নামেতে নদী দেখিলা নিকটে।
> মুনিগণ বৈসেন তাহার দুই তটে॥
> অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগণ।
> ব্রাহ্মণ বদনে যেন বেদ উচ্চারণ॥"

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতে সংস্কৃত মহাভারতের তপোবন বর্ণনার কোনও বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় "মালিনী" নদীর উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা হইতে বোঝা যায় কাশীরামদাস আক্ষরিক অনুবাদ না করিলেও সংস্কৃত মহাভারতকে অনুসরণ করিয়া স্বীয় প্রয়োজনানুরূপ অংশ আহরণ করিয়াছিলেন। বর্ণনাগত অংশ ছাড়া উভয় কাহিনীর সংলাপের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সংস্কৃত মহাভারতের পাত্র পাত্রীগণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে নীতিবাক্য, তত্ত্ব, ও তথ্যের বহুল উল্লেখ রহিয়াছে। কাশীরামদাসের পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথনে এইগুলি সংক্ষিপ্ত অথবা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংলাপ এইরূপে

সংক্ষিপ্ত হওয়ায় কাশীরামদাসের কাহিনী দ্রুতগতিতে পরিণতির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে ও গল্পের আকর্ষণ ঘনীভূত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের সংলাপ অনেক সময় দীর্ঘ হওয়ায় কাহিনীর গতি ব্যাহত হইয়াছে এবং মনোযোগ গল্পাংশ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কথোপকথনের পারস্পরিক তুলনা করিলে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

তপোবন কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত মুগ্ধ হন এবং অবিলম্বে শকুন্তলার পাণিগ্রহণে আগ্রহী হন। শকুন্তলা তাঁহাকে বলেন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে তিনি মহর্ষির অনুমতি লইয়া দুষ্মন্তকে বরণ করিবেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলিয়াছেন যে তিনি নিজেই নিজের পতি, সুতরাং মহর্ষি কণ্বের আগমনের এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। শকুন্তলা নিজেই নিজেকে দান করিতে সমর্থ। কিন্তু দুষ্মন্ত কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি বিবিধ প্রকার বিবাহ বিধির বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলাকে বলিয়াছেন—"দেখ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের পতি, সুতরাং তুমি ধর্ম অনুসারে নিজেই নিজেকে দান করিতে পার। ধর্মশাস্ত্রোক্ত এই আটটি বিবাহের কথা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। স্বয়ম্ভূব মনু এই বিবাহগুলির লক্ষণ যথাক্রমে বলিয়া গিয়াছেন। সুন্দরী, ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারটি প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রথম ছয়টি ধর্মসঙ্গত বলিয়া জানিবে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস বিবাহও ধর্মসঙ্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর বৈশ্য বা শূদ্রের পক্ষে আসুব বিবাহও অধর্মজনক নহে। কিন্তু প্রথমোক্ত পাঁচটি বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও প্রাজাপত্য এই তিনটি বিবাহ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অপর দুইটি (আর্ষ ও আসুর) উক্ত তিনটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ কখনও আসুর বিবাহ করিবেন না। আর ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই কখনই পৈশাচ বিবাহ করিবেন না, এই বিধান অনুসারেই সকলে বিবাহ করিবে, কেন না ইহাই ধর্মের পদ্ধতি। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে খাঁটি গান্ধর্ব বিবাহ অথবা খাঁটি রাক্ষস বিবাহ অথবা গান্ধর্ব রাক্ষস উভয় লক্ষণ মিশ্রিত বিবাহ ধর্মসঙ্গত বলিয়া কর্তব্য। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি কোনও আশংকা করিও না, কেন না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ হইয়াছে, সুতরাং তুমি গান্ধর্ব বিবাহ অনুসারে আমার ভার্যা হইতে পার।" (আদি ৮৭।১৩-২০) দুষ্মন্তের এই উক্তি হইতে মনে হয় তিনি যেন সামাজিক বিধান দিতে আগ্রহী সেইজন্যই তিনি প্রত্যেক বর্ণের কিরূপ বিবাহ প্রশস্ত তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাশীরামদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে এত কথা বলেন নাই, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"বিবাহ যে অষ্টবিধ বেদে সুপ্রচার।
গান্ধর্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয় আচার॥
স্বেচ্ছায় বিবাহ যদি করহ আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে॥" পৃঃ ৭১

কাহিনীতে গল্পাংশ প্রায় অভিন্ন থাকিলেও বিভিন্ন কারণে সংলাপের মধ্যে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাহা অভিব্যক্ত চরিত্রের মধ্যে ও কাহিনীর রস অভিব্যক্তিতে

পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণতঃ কার্যে ও বাক্যে মানুষের পরিচয় প্রকাশিত হয়। উভয় মহাভারতের কাহিনীর পারস্পরিক তুলনা করিলে দেখা যায় যে পাত্রপাত্রীগণের কার্য অভিন্ন থাকিলেও বাক্যে ঈষৎ পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক সময়ে বাক্য অভিন্ন হইলেও বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য থাকায় অভিব্যক্ত চরিত্রসমূহের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের দুষ্মন্ত শকুন্তলা কাহিনীর আলোচনায় সংলাপের মধ্যে যে পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই পার্থক্যের জন্য দুই গ্রন্থের দুই শকুন্তলাকে পৃথক নারী বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত মহাভারতের নারী চরিত্রসমূহ সাধারণতঃ অত্যন্ত তেজস্বিনী। সংস্কৃত মহাভারতের শকুন্তলা মহাতেজা তপস্বী বিশ্বামিত্র মুনির কন্যা ক্ষত্রিয়া রমণী। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের শকুন্তলার মধ্যে যে ক্ষাত্রতেজ বিদ্যমান বৈষ্ণব ভাবধারার মধ্যে পরিবর্ধিত স্বভাব কোমল বাঙ্গালী কবি কাশীরামদাসের অংকিত চরিত্রের মধ্যে তাহা নাই। দুষ্মন্তের রাজসভায় উপনীত শকুন্তলার রূপের মধ্যে এই পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলা দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজাকে তাঁহার পূর্ব শপথ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন তখন তপোবন দুহিতা শকুন্তলার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে শকুন্তলার এই সময়ের রূপ বর্ণিত হইয়াছে—"ক্রোধ ও অধীরতা বশতঃ তাঁহার নয়নযুগল তাম্রবর্ণ হইল, ওষ্ঠযুগল কাঁপিতে লাগিল, এবং কটাক্ষ দ্বারা তিনি যেন রাজাকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি রাজার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধভাব গোপন করিলেন এবং তপোবলে যে তেজ অর্জন করিয়াছিলেন তৎকালে সেই তেজ আসিয়া ক্রোধকে উদ্দীপিত করিতেছিল, তথাপি তিনি সেই তেজের সম্বরণ করিলেন. তাহারপর তিনি একটু কাল চিন্তা করিয়া দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এবং রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! আপনার স্মরণ থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি একটা প্রাকৃত লোকের মত এইরূপ বলিতেছেন, যে আমার স্মরণ হইতেছে না। আমি সত্য বা মিথ্যা বলিতেছি তাহা আপনার হৃদয়ই জানিতেছে সুতরাং আপনি সাধু সাক্ষীর মত সত্য বলুন, মিথ্যা বলিয়া আত্মাকে অবজ্ঞার পাত্র করিবেন না, যে লোক অন্যরূপ, আত্মাকে অন্যরূপ মনে করে, সে ত' আত্মাপহারী চোর, সুতরাং সে লোক কোন পাপ না করিয়াছে? মহারাজ! আপনি মনে করেন যে আমি একজন প্রধান জ্ঞানী, অথচ আপনারই হৃদয়ে যে অনাদি জীবাত্মা রহিয়াছেন, তাহা আপনি জানেন না, কারণ যে জীবাত্মা পাপ কার্যের সংবাদ জানিতে পারেন তাঁহারই নিকটে আপনি পাপ করিতেছেন। মানুষ নির্জনে পাপ করিরা মনে করে, যে আমাকে কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু তাহারই জীবাত্মা ও দেবগণ তাহা জানিয়া থাকেন। আর চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, জল, বন, যম, দিনরাত্রি প্রাতঃ সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা, এবং ধর্ম ইহারা মানুষের সমস্ত বৃত্তান্তই জানিতেছেন। কর্মের সাক্ষী ও জীবাত্মা যে ব্যক্তির সৎকর্ম দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন স্বয়ং যমই তাহার পাপ দূর করিয়া দিয়া থাকেন, আর সেই জীবাত্মাই দুষ্কর্ম দ্বারা যে দুরাত্মার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন

যমই সেই পাপাত্মাকে দারুণ যাতনা দিয়া থাকেন। যে লোক আপনই আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া মুখে অন্যরূপ বুঝাইয়া দেয় দেবতারা তাহার মঙ্গল করেন না। কেন না তাঁহার আত্মাই ত' তাঁহার নিকট প্রমাণ নহে। আমি পতিব্রতা, সুতরাং আমি নিজে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। কারণ ভার্যা পতির নিকট উপস্থিত হইলেও আদরের যোগ্য, তথাপি আপনি যে আদর করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত অনুচিত হইতেছে। আপনি সভার মধ্যে নীচ নারীর ন্যায় আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? এবং আপনি আমার সহিত কথা বলিতেছেন না বলিয়া ইহা কি আমার শূন্যে রোদন করা হইতেছে না? আমি আপনার নিকট থাকিব বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি, এ অবস্থায় আপনি যদি আমার প্রার্থনা রক্ষা না করেন, তবে আপনার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।" (আদি ৮৮।২১-৩৬) শকুন্তলার উক্তি এইখানেই সমাপ্ত হয় নাই। আরও ৩৬টি শ্লোক-এ আদি ৮৮ অধ্যায়-এর ৭২ শ্লোক পর্যন্ত শকুন্তলার উক্তি রহিয়াছে। তাঁহার বাক্যের অধিকাংশের মধ্যেই মানব জীবনে পত্নী ও পুত্রের অবদানের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী ৩৬টি শ্লোকের কিছু অংশ কাশীরামদাস গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু শকুন্তলার সমগ্র উক্তির অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়াছেন। শকুন্তলার উক্তির যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও আমাদের পূর্ব কথিত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের সংলাপ যে নীতিবাক্য ভারাক্রান্ত এবং দীর্ঘ তাহা এখানেও দেখা যায়। অধিকন্তু শকুন্তলার বর্ণনা হইতে এবং উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে তাঁহার চরিত্রেরও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। শকুন্তলার বাক্য তাঁহার সম্বন্ধে প্রদত্ত বর্ণনাকে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। তীব্র ক্রোধে ও ক্ষোভে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছেন রাজা যদি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ না করেন তাহা হইলে তাঁহার মস্তক শতধা ফাটিয়া যাইবে। কাশীরামদাসের শকুন্তলা দুষ্মন্তকে এইরূপ কথা বলেন নাই, কারণ বাঙ্গালী নারী স্বামীর সহস্র অত্যাচার ও অবিচার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু কোন সময়েই স্বামীর অনিষ্ট কামনা করে নাই। ইহা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। বাঙ্গালী নারীর এই সংস্কার এবং তাহার স্বভাব কোমল প্রকৃতির জন্য কবি কাশীরামদাসের শকুন্তলার পক্ষে এই জাতীয় কথা বলা সম্ভব হয় নাই। পরিবর্তে কবি ভিন্নরূপে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন—

"এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত।
ক্রোধে ওষ্ঠাধর হইল সঘনে কম্পিত॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা।
পূর্ব সত্য পাসরিলা রাজভোগে ভোলা॥
কি বাক্য বলিলা রাজা নাহি ধর্মভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয়॥
দৈবে সে সব কথা কেহ নাহি জানে।
আপনি ভাবিয়া রাজা দেখ মনে মনে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন।
সহস্র বৎসর তার নরকে গমন॥

লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কর্ম।
লোকে না জানিলেও জানেন তা ধর্ম॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ নরবৃত্তি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম ফল তারে দেয় ত' শমনে॥
মিথ্যা কথা বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্বশাস্ত্রে কহে॥
পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন্॥" পৃঃ ৭২

সংস্কৃত মহাভারতের শকুন্তলার যে কথাগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারই অনুরূপ অংশ কাশীরামদাসের গ্রন্থ হইতে উৎকলিত করা হইল। এই দুই অংশ পরস্পর তুলনা করিলে বোঝা যাইবে সংস্কৃত মহাভারতের নীতি বাক্যগুলি অধিকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য এমন দুই একটি বাক্য মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। অধিকন্তু শকুন্তলার উক্তির মধ্যে তেজ ও দর্প প্রায় বিলুপ্ত হইয়া অনুনয়ে পর্যবসিত হইয়াছে। শকুন্তলার পরবর্তী উক্তিতে দেখা যাইবে এই সকরুণ আবেদনের সহিত বঞ্চনার ক্ষোভ ও দুর্ভাগ্যজনিত আক্ষেপ পরিস্ফুট হইয়াছে। শকুন্তলা স্বীয় মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া যেন রাজার অনুকম্পা ভিক্ষা করিয়াছেন, এবং ন্যূনপক্ষে তাঁহার সন্তানকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজার নিকট সকাতর আবেদন জানাইয়াছেন—

"আলিঙ্গন দিয়া তোষ আপন কুমারে।
দুঃখ নাহি তাজ কিম্বা রাখহ আমারে॥
বিশ্বামিত্র পিতা মোর মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে থুয়ে গেল একাকিনী॥
জননী ত্যজিলা পূর্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভেবে॥
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তাহে দুখ।
এ পুত্র বিচ্ছেদে মোর বিদরিছে বুক॥" পৃঃ ৭৩

ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি সংস্কৃত মহাভারতের শকুন্তলার পৃথক রূপ। তিনিও তাঁহার জনক জননী বিশ্বামিত্র ও মেনকার কথা বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সেই কথা আত্ম-গৌরবকেই প্রকাশ করিয়াছে, বিস্মৃতচিত্ত রাজার অনুকম্পা প্রার্থনা করে নাই। শকুন্তলা রাজাকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—"মহারাজ! আপনি পূর্বে মৃগয়া করিবার জন্য বনে গিয়েছিলেন, তখন একটা মৃগ আপনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই অবস্থায় আপনি মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে যাইয়া কুমারী অবস্থাতেই আমাকে লাভ করেন। উর্বশী, পূর্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী এই ছয়জনই অপ্সরাদের মধ্যে প্রধান। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অপ্সরা ব্রহ্মার কন্যা স্বর্গ হইতে ভূমণ্ডলে আসিয়া বিশ্বামিত্র হইতে আমাকে উৎপাদন করেন। সেই নিষ্ঠুর স্বভাবা মেনকা

হিমালয়ের কোন সমতল ভূমিতে আমাকে প্রসব করেন এবং তখনই পরের সন্তানের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমি পূর্বজন্মে কি গুরুতর পাপই না করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না যাহার জন্য বান্ধবগণ আমাকে বাল্যকালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন আর সম্প্রতি আপনিও পরিত্যাগ করিতেছেন। তবে ইচ্ছা করিয়া আপনি পরিত্যাগ করিলে আমি নিজে আশ্রমেই চলিয়া যাইব। কিন্তু এই বালকটি আপনারই পুত্র সুতরাং আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।" (আদি ৮৮।৬৭-৭২) অবশেষে বিভিন্ন যুক্তি ও আবেদন যখন ব্যর্থ হইয়া গেল তখন রাজসভা পরিত্যাগের পূর্বে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছেন "সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরম সদাচার। সুতরাং আপনি সদাচার ত্যাগ করিবেন না। আপনার হৃদয়ে চিরকালই সত্য সংলগ্ন থাক। পক্ষান্তরে আপনি যদি মিথ্যাতেই আসক্ত হইয়া থাকেন এবং আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, হায়! তবে আমি নিজেই চলিয়া যাইতেছি। আপনার মত লোকের সঙ্গে আমার সম্মেলন সম্ভব হইবে না। দুষ্মন্ত! তোমা ব্যতীতও আমার পুত্র হিমালয় অলংকৃত চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবী শাসন করিবে। (আদি ৮৮।১০৬-১০৮) সেই আশ্রম বালিকা রাজসভা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে মহারাজ দুষ্মন্তকে এইরূপ স্পর্দ্ধিত কথা বলিয়া আসিয়াছেন।

ইহা ছাড়া দুষ্মন্ত শকুন্তলার উপাখ্যানে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বামিত্র ও মেনকার কাহিনীর মধ্যে গল্পাংশে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গের চক্রান্তে রূপমুগ্ধ বিশ্বামিত্র মেনকার চরণে স্বীয় তপস্যার ফল সমর্পণ করেন এবং "মালিনী" নদীর নিকটে হিমালয়ের মনোহর সমভূমিতে মেনকার গর্ভে শকুন্তলাকে উৎপাদন করেন। মেনকা কিন্তু কৃতকার্য হইয়া মালিনী নদীর নিকটে জাতমাত্র সেই কন্যাটিকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর ইন্দ্র সভায় চলিয়া গেল। (আদি ৮৬।১০-২১) এই কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত আছে।

সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনাতে দেখা যায় যে বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যা ভঙ্গ করাই ছিল মেনকার উদ্দেশ্য। যখনই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে তখনই মেনকা আপন কর্মাবসানে স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছে। এই অংশ কবি কাশীরামদাস ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার পাঠকবর্গকে একটি সুন্দর পারিবারিক জীবনচিত্র উপহার দিয়াছেন। কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন—

"পত্নীরূপে মেনকায় নিল নিজ ঘরে।
তপজপ ত্যজি তথা দোঁহে বাস করে॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
সন্ধ্যা বা বন্দনা পূজা নাহি মনে পশে॥
একদিন দিনগতে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বলে শীঘ্র জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এতদিনে সন্ধ্যা তব হইল স্মরণ॥
এত শুনি মুনি হইল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পালায় সত্বর॥" পৃঃ ৭০

এখানে দেখা যাইতেছে কাশীরামদাস দাম্পত্য পরিহাস মধুর একটি চিত্র অংকন করিয়া মেনকার স্বর্গপ্রস্থানের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই ছবিটি সংস্কৃত মহাভারতে নাই। কবি কাশীরামদাসের লেখনী মাঝে মাঝে এইরূপ নতুন পথে চলিয়াছে।

নাগরাজ্যে ভীম

এই অংশ সংস্কৃত মহাভারতের আদি পর্বের ১২৩ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনী অংশে কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারতকে অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু উপস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। দুর্যোধনের চক্রান্তে বিষ জর্জরিত হইয়া ভীম নাগলোকে গমন করেন এবং সেখানে রসায়ন পান করিয়া সহস্র হস্তীর বল লাভ করেন। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীতে ভীমের শক্তি লাভই প্রাধান্য পাইয়াছে কিন্তু কাশীরামদাসের কাহিনীতে রসায়নের আস্বাদ, ভীমের ভোজন লোলুপতা ও ঔদরিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। ভীম যখন নাগলোকে উপনীত হন তখন নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে আপন দৌহিত্র কুন্তি-ভোজশূরের দৌহিত্র জানিয়া পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। নাগরাজ বাসুকি ভীমকে ধন রত্ন অথবা অন্য কোন্ বস্তু দিয়া পরিতুষ্ট করা যায় ইহা জিজ্ঞাসা করিলে বাসুকির নিকট ভীমের সংবাদ দাতা নাগ বলেন, ধন রত্ন তুচ্ছ বস্তু তাহা না দিয়া ভীমকে রসায়ন দেওয়া উচিত। সংস্কৃত মহাভারতে এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে—"বাসুকি এই কথা বলিলে সেই নাগ বাসুকিকে বলিল, 'যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে উহাকে ধন দিয়া কি হইবে? আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে এই বালক রসায়ন পান করুক। যে রসায়নকুণ্ড সহস্র হস্তীর বল জন্মাইতে পারে এমন গুণ রহিয়াছে সেই কুণ্ডই পান করুক। এই বালক যতখানি রসায়ন পান করিতে পারিবে তাহাই উহাকে দান করুন।' তখন বাসুকি সেই নাগকে বলিলেন, 'তাহাই হউক।' তাহার পর নাগগণ রসায়নের কুণ্ড দেখাইয়া দিলে ভীমসেন পবিত্র ও পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া রসায়ন পান করিতে লাগিলেন। বলবান ভীমসেন এক এক নিঃশ্বাসে এক একটি কুণ্ডের রসায়ন পান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি আটটি কুণ্ডের রসায়ন পান করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! তাহার পর ভীমসেন নাগাদিগের প্রদত্ত উৎকৃষ্ট শয্যায় মহাসুখে শয়ন করিলেন।" (আদি ১২৩।৫৩-৫৮) এই বিবরণ হইতে দেখা যায় ধন রত্ন অপেক্ষা রসায়ন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় বাসুকি তাহাই তাঁহার স্নেহাস্পদ আত্মীয়কে দান করিয়াছেন। রসায়নের এই শ্রেষ্ঠতা ইহার আস্বাদের জন্য নহে, ইহা সহস্র হস্তীর বল সঞ্চার করে বলিয়া। বাসুকি তাঁহার দৌহিত্রের দৌহিত্রকে তুচ্ছ ধন রত্নের পরিবর্তে দুর্লভ রসায়ন দান করিয়া অসাধারণ বলবান করিয়া তুলিয়াছেন। এই কথা সংস্কৃত মহাভারতের পরবর্তী শ্লোকে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আদিপর্বের ১২৪ অধ্যায়ের ২২-২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"তাহার পর অষ্টম দিনে ভীম জাগরিত হইয়াও অসাধারণ বলবান হইলেন। তিনি জাগরিত হইয়াছেন দেখিয়া সেই নাগেরা সুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল এবং এই কথা বলিল

—ভীম! তুমি যখন এই বলকারী রসায়ন পান করিয়াছ, তখন তোমার দশ হাজার হস্তীর বল হইবে এবং যুদ্ধে তুমি অন্যের অজেয় হইবে।" সংস্কৃত মহাভারতের এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যেন পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য ভীমকে প্রস্তুত করিয়া শক্তি-শালী করিয়া তোলা হইল। সংস্কৃত মহাভারতের এই কথাগুলি কাশীরামদাসের মহাভারতে নাই। অবশ্য কাশীরামদাস ভীমের রসায়ন পানের কথা বলিয়াছেন, রসায়ন পানে যে সহস্র হস্তীর বল লাভ হয় এবং ভীম যে আট কুণ্ড রসায়ন পান করিয়াছিলেন সে কথা বলিয়াছেন কিন্তু উপস্থাপনার পার্থক্যের জন্য রসায়নের আস্বাদ এবং ভীমের ঔদরিকতা কিরূপ প্রাধান্য পাইয়াছে তাহা কাশীরামদাসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে বোঝা যাইবে।

"আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর॥
ধন রত্ন লহ তুমি যাহা ইচ্ছা মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া তুষ্টি জন্মাও ইহার॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভোজন॥
ইহারে লইয়া গৃহে করহ গমন।
যাহাতে এ তৃপ্ত হয় করহ রাজন্॥
এত শুনি ফণিরাজ লৈয়া বৃকোদরে।
গৃহে আনি বসাইল পালংক উপরে॥
নাগের আলয়ে আছে সুধাকুণ্ড চয়।
ভীমে বলে কর পান মন যত লয়॥
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে॥
একে পরিশ্রম আর বলবতী ক্ষুধা।
তাহে লোভী ভীমবীর পাইল কুণ্ড সুধা॥
একে একে অষ্ট কুণ্ড পান সে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল॥
রত্নময় পালংকেতে করিল শয়ন।" পৃঃ ১৪১

কাশীরামদাসের বর্ণনাতে দেখা যাইতেছে যে ভীমকে রসায়ন প্রদান করা হইয়াছে, কারণ 'ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভোজন।' আর ভীমসেনের "একে পরিশ্রম আর বলবতী ক্ষুধা" সেইজন্য তিনি হৃষ্ট হইয়া কুণ্ড কুণ্ড সুধা পান করিলেন। এইরূপ সামান্য কয়েকটি উক্তির পার্থক্যের জন্য এই অংশে কাহিনীগত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

সংস্কৃত মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে ভাব গম্ভীর পরিবেশে, সংযত ও মহিমান্বিত বর্ণনায়। ইহাতে সর্বপ্রথমে স্বয়ম্বর সমাজের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর বিবৃত হইয়াছে—"এইরূপে সমাজ সন্নিবিষ্ট হইলে ষোল দিনের দিন, দ্রৌপদী স্নান ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া সমস্ত অলংকারে অলংকৃত হইয়া এবং মণিখচিত সুবর্ণমালা ধারণ করিয়া সেই রঙ্গ স্থানে উপনীত হইলেন। তখন মন্ত্রজ্ঞ ও পবিত্র সোমক বংশীয়দের পুরোহিত অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে ঘৃত দ্বারা যথা বিধানে হোম করিলেন। তিনি হোম করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন পাঠ করাইয়া সকল দিকের সকল বাদ্য নিবারণ করিলেন। মহারাজ! সেই রঙ্গ স্থানটিকে নীরব করা হইলে, মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি সম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন যথা নিয়মে দ্রৌপদীকে লইয়া সেই রঙ্গমধ্যে যাইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে কোমল, সঙ্গত ও মনোহর এই কথা কয়টি বলিলেন—'সমবেত রাজাগণ! আমার কথা শ্রবণ করুন—এই ধনু, এই বাণ এবং ঐ লক্ষ্য, আপনারা এই সুধার পাঁচটি বাণ দ্বারা ঐ যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া ঐ লক্ষ্যটাকে বিদ্ধ করুন। উচ্চবংশ, মনোহর রূপ এবং অসাধারণ বলশালী যে রাজপুত্র এই গুরুতর কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন আমার ভগিনী এই দ্রৌপদী আজ তাঁহারই ভার্যা হইবেন। ইহা আমি মিথ্যা বলিতেছি না'।" (আদি ১৭৮।২৯-৩৬) কাশীরামদাসর মহাভারতে এইরূপ সংযত গম্ভীর বর্ণনা নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপের সুন্দর বর্ণনা আছে। সংস্কৃত মহাভারতে দ্রৌপদীর রূপের কথা একটি মাত্র ছত্রে বর্ণিত হইয়াছে, কাশীরামদাসের বর্ণনা এক্ষেত্রে বিশদ। দ্রৌপদীর সৌন্দর্য কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"পূর্ণ সুধাকর জিনি মনোহর
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা তিলফুল নাসা
দেখি মুনিমন সুখ॥
নেত্রযুগ মীন দেখিয়া হরিণ
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু উন্নত দেখিয়া মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর বিরাজে অধর
পূরব অরুণভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দুর চিকুর জালে॥" পৃঃ ২০৯

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা যেমন কবি কাশীরামদাসের নূতন সংযোজন সেইরূপ স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া কবি নূতন কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে সমবেত রাজন্যবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করিয়াছেন। কৃষ্ণও পাঞ্চজন্যের মঙ্গলধ্বনির

দ্বারা আপন উপস্থিতি ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে কৃষ্ণদ্বেষী রাজা শিশুপাল কৃষ্ণকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—

"সবা হৈতে ভাল শংখ বাজায় গোপাল ॥
তাই সে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকারগণ সহ বাদ্য করিবারে ॥" পৃঃ ২০৭

শিশুপালের এই ধরণের মন্তব্যে অনেকে রুষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর কৃষ্ণের মহিমা লইয়া জরাসন্ধ ও ভীষ্মের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের কথোপকথন কাশীরাম দাসের নব সংযোজন। এই বাদানুবাদে জরাসন্ধ কৃষ্ণকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়া বলিয়াছে—

"নন্দ গোপ গৃহে আছিল চিরকাল।
গোপ অন্ন খাইয়া চরাত গোরুপাল ॥" পৃঃ ২০৭

এ হেন কৃষ্ণকে ক্ষত্রিয়ের প্রণাম করা শোভা পায় না। জরাসন্ধ ও শিশুপালের এই জাতীয় উক্তিতে আপাতঃবোধে কৃষ্ণ বিদ্বেষ প্রকাশ পাইলেও একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বাঙ্গালীর প্রাণের দেবতার প্রতি সভক্তি ভালোবাসার সন্ধান পাওয়া যাইবে। আমাদের যাঁহারা অত্যন্ত প্রিয় তাহাদের প্রতি আমরা অনেক সময় যেমন ভালোবাসা বশতঃই বিরূপ উক্তি করিয়া থাকি এইগুলিও সেইরূপ। এই জাতীয় উক্তি সেইজন্য সাধারণ বাঙ্গালীর চিত্তকে আঘাত করে না, তাহাকে আকর্ষণ করে এবং কবির পাঠক ও শ্রোতৃমণ্ডলী ইহাকে ভক্তি বিমিশ্রিত প্রীতি স্নিগ্ধ স্মিতহাস্যের সহিত গ্রহণ করে। ভক্তির এই আবরণও শীঘ্র দূরীভূত হয় জরাসন্ধের প্রতি ভীষ্মের উক্তিতে। কৃষ্ণ মহিমা প্রকাশ করিয়া ভীষ্ম বলেন—

"গোপালের চরিত্র হয় বেদ অগোচর।
কেহ না কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলিয়ে এক চতুর্দ্দশ লোক।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিন অর্ধ কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধরে পায়।
এমত বিরাট যার নিঃশ্বাসে প্রলয় ॥" পৃঃ ২০৭

ইতিপূর্বে আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে দুইটি কাহিনী পৃথক সুরে বিবৃত হইয়াছে। এই পার্থক্য আরও পরিস্ফুট হইয়াছে পরবর্তী অংশে: সংস্কৃত মহাভারতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমবেত রাজাগণকে লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর তিনি নৃপতিগণের শৌর্য বীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দ্রৌপদীর উপস্থিতিতে তাহাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সংযত বর্ণনা দান করিয়াছেন মহাকবি—"কুণ্ডল প্রভৃতি সমস্ত অলংকারে অলংকৃত যুবক রাজাগণ অস্ত্রশিক্ষা ও দৈহিকবল নিজেদের আছে মনে করিয়া পরস্পর স্পর্ধা করিতে থাকিয়া, অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক লক্ষ্য ভেদের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। কুলশীল রূপ যৌবন বল ও বিত্ত থাকায় হিমালয় বাসী মদমত্ত শ্রেষ্ঠ হস্তীগণের ন্যায় তাঁহাদের দর্প প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া কামার্ত হইয়া, দ্রৌপদী আমারই হইবেন, এইরূপ বলিতে থাকিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজাসন হইতে উঠিলেন। পূর্বকালে হিমালয় কন্যা উমাকে লাভ করিবার জন্য সমবেত দেবগণ যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, সেই দ্রুপদ নন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য সমবেত সেই রাজাগণও রঙ্গস্থানে যাইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের চিত্ত দ্রৌপদীর উপর নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা কামবাণে পীড়িত হইতে থাকিয়া রঙ্গস্থানে যাইয়া পরস্পর বন্ধু হইয়াও দ্রৌপদীর জন্য পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন।" (আদি ১৮০।১-৫) ইহার পর লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে যাইয়া গুণ আরোপণে অসমর্থ রাজাগণের দুরবস্থার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এই বর্ণনাও সংযত—"গুণ আরোপণ করিবার নিয়মাভিজ্ঞ সেই রাজারা শক্তি অনুসারে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ভূতলে পতিত হওয়ায় তাঁহাদের তেজ নষ্ট হইয়া গেল এবং কিরীট ও হার প্রভৃতি অলংকার ছড়াইয়া পড়িল। এই অবস্থায় তাঁহারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া দ্রৌপদী লাভের আশা ত্যাগ করিলেন। সেই আঘাতে সেই রাজাদের হার, কেয়ূর ও বলয় প্রভৃতি অলংকার ছড়াইয়া পড়িলে অন্যান্য রাজারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারাও দ্রৌপদীর আশা ত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইলেন।" (আদি ১৮০।১৯-২০)

সংস্কৃত মহাভারতের এই সংযত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ বর্ণনা কবি কাশীরামদাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৎপরিবর্তে তিনি যেরূপ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে ইহা অনেক সময় লঘু হইয়াছে। দ্রৌপদীর আবির্ভাবে রাজাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"দ্রৌপদী সভায় যবে হৈলা উপনীত।
দেখি সব রাজাগণ হৈল মূর্চ্ছিত॥
কামাগ্নি দহিল চিত্তে হৈল অচেতন।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজগণ॥
কেহ কেহ সেই স্থলে পড়িল ঢলিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ কেহ ধন্য মানে প্রাণ আপনার॥" পৃঃ ২০৯

এই বর্ণনার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। কবি কাশীরামদাসের অতিশয়োক্তি এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্য রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের কথা প্রকাশ করিয়া একটি মাত্র শ্লোক অত্যন্ত সংযত ভাবে সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"তাঁহাদের চিত্ত দ্রৌপদীর উপর-নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা কামবাণে পীড়িত হইতে থাকিয়া রঙ্গস্থানে যাইয়া পরস্পর বন্ধু হইয়াও দ্রৌপদীর জন্য পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন।" (আদি ১৮০।৫) কিন্তু কাশীরামদাস রাজাদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের যে চিত্র অংকন করিয়াছেন তাহা অ-রাজকীয়। ইহা পরিবেশকে লঘু করিয়াছে কিন্তু সুলভ হাস্যরস সৃষ্টি করিয়া সাধারণ মানুষের কাছে কাহিনীকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

"দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সবাই উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করে সবে ধায় বায়ুবেগে।
সবে বলে, রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে সবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুকে বেড়িয়া খাড়াইল নৃপবৃন্দ ॥" পৃঃ ২০৯

এই "সুহৃদে সুহৃদে দ্বন্দ্বের" পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলিতে—

"তবে মৎস্য অধিপতি বিরাট নৃপতি।
ঠেলা ঠেলি করি ধনু ধরে দ্রুতগতি ॥
থাকুক বেধন কার্য্য তুলিতে নারিল।
হাসিয়া সুশর্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিবার নাহি শক্তি বিন্ধিবারে চাও।
এই মুখে মৎস্য দেশে রাজভোগ খাও ॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে ত্রিগর্তের ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥" পৃঃ ২১০

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় স্বয়ম্বর সভায় যেন এক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড চলিতেছিল। রাজাদের আচার আচরণ একেবারে সাধারণ বাঙালীতে পরিণত হইয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও লক্ষ্যভেদের দুরূহতায় অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে—

"কেহ ব্যথা পায় হাত ঘাড় স্কন্ধ নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলকে ॥
হাহাকার করি কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি ॥" পৃঃ ২১০

এই বর্ণনার পর লক্ষ্য বিদ্ধ করার দুরূহতার কথা কাশীরামদাস বলিয়াছেন। এইরূপ দুরূহ স্বয়ম্বর সভা রূপে কাশীরামদাস ভানুমতীর স্বয়ম্বর সভার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভানুমতীর স্বয়ম্বর কাহিনীর বর্ণনা সংস্কৃত মহাভারতে নাই। ইহা কাশীরামদাসের নূতন সংযোজনা। কাশীরামদাস এই সময় কৃষ্ণ বলরামের দীর্ঘ কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত মহাভারতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কথোপকথন বিবৃত করার পর কাশীরামদাস লক্ষ্য বিদ্ধ করার জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া নূতন কাহিনী রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে লক্ষ্য বিদ্ধ করার জন্য কেবল কর্ণের প্রচেষ্টারই উল্লেখ দেখা যায়। কাশীরাম দাস বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমে ভীষ্ম লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তিনি

ধনুতে গুণ আরোপ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার সময়ে সম্মুখে শিখণ্ডীকে দেখিয়া [illegible] ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করেন। ভীষ্ম প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দ্রোণাচার্য্য ধনুর্বাণ লইয়া অগ্রসর হন। দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রগুরু। সুতরাং তাঁহার পক্ষে লক্ষ্য বিদ্ধ করা কিছু দুরূহ ছিল না। কিন্তু চক্রধারী নারায়ণ পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ হইবে। অথচ ভীষ্ম ও দ্রোণ ঘোষণা করিয়াছেন যে তাহারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে তাঁহাদের পরিবর্তে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে লাভ করিবে। সেইজন্য চক্রধারী নারায়ণ সকলের অগোচরে সুদর্শন চক্রের দ্বারা লক্ষ্যের মধ্যপথে অবস্থিত যন্ত্রের ছিদ্রপথ আবৃত করেন। ইহার ফলে দ্রোণাচার্য্য নিক্ষিপ্ত শর সুদর্শন চক্রে প্রতিহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। পরে অশ্বত্থামা ও কর্ণ উভয়ে প্রচেষ্টা করিলে একই রূপে উভয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই সকলই কাশীরামদাসের নূতন সংযোজনা। এইরূপে তিনি কাহিনী-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে কেবল কর্ণের প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কর্ণ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী সুতপুত্রকে বরণ করিতে অস্বীকৃত হন। সংস্কৃত মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে—কর্ণকে "লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বলিলেন, আমি সুত পুত্রকে বরণ করিব না।" তখন কর্ণ ক্রোধ ও হাস্যের সহিত স্পন্দিত ধনুখানা পরিত্যাগ করিলেন।" (আদি ১৮০।২৩) ইহাই সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনা। ইহাতে কর্ণ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হওয়ার কথা বলিয়া কাশীরামদাস কর্ণ চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতে কর্ণ দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও স্বীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা বোধের জন্য দ্রৌপদীকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দেন নাই যে, তাঁহার ভ্রাতা সকলকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং যে কেহ এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে তাঁহাকেই দ্রৌপদী বরণ করিবে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তৎপরিবর্তে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও অবজ্ঞার হাস্যের সহিত ধনু পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা কেবল ধনু পরিত্যাগই নহে, কর্ণ যেন একই অবজ্ঞার সহিত দ্রৌপদীকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কাশীরামদাসের বর্ণনায় দেখা যায় কর্ণ দ্রৌপদীকে লাভ করিতে অশক্ত হইয়াছেন। কবি কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদী কণ্ঠের রূঢ় উক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালী মানসে কুমারী কণ্ঠে সম্ভাব্য পতিকে প্রত্যাখ্যান করা অশোভন মনে হইয়াছে, সেইজন্য তিনি এই অংশে ভিন্নরূপে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রভৃতির ব্যর্থ প্রচেষ্টা বর্ণনার পর কাশীরামদাস অর্জুনের লক্ষ্য বিদ্ধ করার কথা বলিয়াছেন। অর্জুনের কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এবং শ্রোতাদের সবিস্ময় কৌতূহল উদ্রেক করিবার জন্য কাশীরামদাস এই লক্ষ্যকে যতখানি সম্ভব দুরূহ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্র ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ান।
সেই মৎস্য চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন॥

সেই হবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে চাহে পার্থ মহাবীর ॥" পৃঃ ২২১

জলেতে প্রতিবিম্ব দেখিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে এমন কথা সংস্কৃত মহাভারতে নাই। সেখানে কেবলমাত্র চক্রপথে লক্ষ্য বিদ্ধ করার কথা আছে। এইরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করা যে অতীব দুরূহ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জুন সহজেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করেন। বিশেষতঃ অর্জুন যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে উদ্যত হন তখন চক্রধারী নারায়ণও যন্ত্র ছিদ্রপথ হইতে তাঁহার চক্রকে অপসৃত করেন।

"জগন্নাথ সুদর্শন করেন অন্তর।
মৎস্য চক্ষু ছেদিলেক অর্জুনের শর ॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্বার ॥" পৃঃ ২২১

কবি কাশীরামদাস তাঁহার কাহিনীর মধ্যে আরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করার পূর্বে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে এ কথা বর্ণিত হয় নাই। কাশীরাম দাস এই উপলক্ষে নূতন কাহিনী সৃজন করিয়াছেন। কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন লক্ষ্য বিদ্ধ করার পূর্বে অর্জুন শর দ্বারা কৃষ্ণ ও বলরামের এবং দ্রোণ ও ভীষ্মের চরণ বন্দনা করিয়াছেন। শর দ্বারা গুরু দ্রোণাচার্য্যের চরণ বন্দনা করিতেই তিনি নিঃসংশয়ে জানিয়াছেন ইহা তাঁহার শিষ্য ধনঞ্জয়ের কার্য। দ্রোণাচার্য্য তখন পুলকিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে জানাইয়াছেন যে পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহে দগ্ধ হয় নাই এবং যে ব্যক্তি লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে উদ্যত সে অন্য কেহ নহে স্বয়ং পার্থ। ইহা শ্রবণ করিয়া স্নেহ প্রবণ বাঙ্গালী ভীষ্ম শোকে আকুল হইয়াছেন। তিনি পার্থের নাম শ্রবণ করিয়াই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। শোকেতে বিহ্বল হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলিয়াছেন—

"কি বলিলা আচার্য্য করিলা কোন কর্ম।
জ্বালিয়া নির্বাণ অগ্নি, দগ্ধ কৈলা মর্ম ॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কানে।
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে ॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোক মন ॥" পৃঃ ২২০

ভীষ্ম দ্রোণের এই কথোপকথন সংস্কৃত মহাভারতে নাই কাশীরামদাসের নূতন রচনা।

অতঃপর পার্থ যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন তখনকার কাহিনীও নূতন পথে চলিয়াছে। কাশীরামদাস বর্ণনা কয়িয়াছেন, পার্থের লক্ষ্য বিদ্ধ করার পর বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে—"শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে। দুষ্টে বলে নয়।" এই বিতণ্ডার মধ্যে অর্জুন পুনর্বার লক্ষ্য কাটিয়া মাটিতে নামাইয়াছেন। কিন্তু দ্রৌপদী যখন তাঁহাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন অর্জুন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। ইহাতে সমবেত রাজারা মনে করিয়াছে যে ব্রাহ্মণের ভার্যাকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল অর্থের প্রলোভনে ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং অর্থের বিনিময়ে দ্রৌপদীকে লাভ করার প্রস্তাব সহ ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের নিকট তাঁহারা দূত প্রেরণ

করিয়াছেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দূতকেই প্রতি প্রস্তাব দিয়া সেই সকল রাজার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন—

"কহ গিয়া তোমার সে মহারাজগণে
অভিলাষ সে সবার থাকে যদি ধনে ॥
আমি দিব সে সবা পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানারত্ন দিব যে আনিয়া ॥
সেই সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভা স্থলে কহিবা আপনি ॥" পৃঃ ২২৩

ইহাতে ক্ষত্রিয় রাজাগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্জুনকে সাহায্য করিতে ভীম এক বিশাল বৃক্ষ হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং ভীমার্জুনের সহিত অন্যান্য ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের ভীষণ যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্রৌপদীকে লাভ করার পর ভীমার্জুন-এর সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজাগণের যুদ্ধের কথা সংস্কৃত মহাভারতেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধের কারণ স্বরূপ কাশীরামদাস যে কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সংস্কৃত মহাভারতে নাই। ইহা ছাড়া সংস্কৃত মহাভারত ও কাশীরামদাসের যুদ্ধ বর্ণনাও পৃথক। তবে এই অংশ হইতে উভয় গ্রন্থে কাহিনীগত ঐক্য রহিয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় একাধিক ক্ষেত্রে কবি কাশীরামদাস দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কাহিনীকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করিয়া ইহাকে পৃথক আস্বাদ দান করিয়াছেন।

সুভদ্রাহরণ কাহিনী

সংস্কৃত মহাভারতের সুভদ্রাহরণ কাহিনীর সহিত কাশীরামদাসের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী সরল ও বৈচিত্র্যহীন কিন্তু কাশীরামদাসের কাহিনী বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া অতীব মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের সুভদ্রাহরণ কাহিনীতে সুভদ্রার মনোভাবের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে নারদ বাক্য অবহেলা করার জন্য দ্বাদশ বৎসর বনবাসে অতিক্রম করার সময় অর্জুন দ্বারকা নগরীতে উপনীত হইয়া রৈবতক পর্বতে বাৎসরিক উৎসব মুখর নর-নারীদের মধ্যে সুভদ্রাকে দর্শন করেন। সুভদ্রার রূপ দর্শনে বিমোহিত চিত্ত অর্জুনকে সুভদ্রার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন স্বয়ং কৃষ্ণ এবং কিরূপে সুভদ্রাকে লাভ করা যাইতে পারে তাহারও পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিষয়ে বলিয়াছেন—"ইনি আমার ভগিনী; সারণের সহোদরা এবং আমার পিতার প্রিয়তমা কন্যা; ইহার নাম 'সুভদ্রা' ইনি তোমার পক্ষে মঙ্গলময়ীই হইবেন। সুতরাং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি নিজেই পিতৃদেবকে বলিব। (আদি ২১২।১৭)......অর্জুন, ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বর বিবাহ আছে বটে; তবে তাহা তোমার পক্ষে সন্দিগ্ধ। কেননা স্ত্রীলোকের স্বভাব অনিয়ত (হয়ত সুভদ্রা স্বয়ম্বরে অন্য পুরুষকেও বরণ করিয়া ফেলিতে পারেন)। তারপর বিবাহের জন্য বীর

ক্ষত্রিয়দের কন্যাহরণও প্রশস্ত ; ইহা ধর্মজ্ঞরা বলিয়া থাকেন। অতএব অর্জুন তুমি বলপূর্বকই আমার ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করো। কারণ সে স্বয়ম্বরে কাহাকে বরণ করিবে তাহা কে জানে।" (আদি ২১১।২১-২৩) কৃষ্ণের পরামর্শক্রমে ও যুধিষ্ঠিরের অনুমত্যনুসারে ইহার পর অর্জুন সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছেন। ইহার জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে আপন রথ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। রৈবতক পর্বতে পূজা সমাপন করিয়া সুভদ্রা যখন দ্বারকাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময় অর্জুন আকস্মিকভাবে সুভদ্রাকে বলপূর্বক রথে উত্তোলন করিয়া হরণ করিয়াছেন। অপহৃতা হইবার পূর্বে সুভদ্রা এই বিষয়ে কিছুই জানিতেন না, সেইজন্য অর্জুনের প্রতি তাহার পূর্ব অনুরাগ সৃষ্টি হইবার কোনও অবকাশ হয় নাই। এইরূপে আকস্মিকভাবে সুভদ্রাকে অপহৃত হইতে দেখিয়া যাদবগণ তুমুল কোলাহল করিয়া যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অর্জুনের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলরাম কৃষ্ণকে বলিয়াছেন— "অর্জুন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এবং তোমাকেও অগ্রাহ্য করিয়া আজ নিজের মৃত্যু-স্বরূপ সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে। সুতরাং অর্জুন আমাদের মস্তকের মধ্যস্থানে পদার্পণ করিয়াছে। অতএব কৃষ্ণ! সর্পের ন্যায় আমি সেই পদার্পণ কি করিয়া সহ্য করিব? অতএব আমি একাকীই পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করিব। কারণ অর্জুনের অত্যাচার সহ্য করিবার নহে।" (আদি ২১৩।২৯-৩১) কিন্তু ইহার পর কৃষ্ণের যুক্তি-যুক্ত বাক্যে বলরামের ক্রোধ এবং দ্বারকাবাসীগণের রণোন্মাদনা উভয়ই প্রশমিত হইয়াছে। কৃষ্ণ বাক্যে সকলে অগ্রসর হইয়া অর্জুনকে সমাদর করিয়া দ্বারকায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন ও অবশেষে সুভদ্রা অর্জুনের বিবাহ হইয়াছে। অর্জুনের সহিত দ্বারকা-বাসীগণের কোনও যুদ্ধ হয় নাই এবং অর্জুনকে সুভদ্রাহরণ করিতে কোনও বাধারও সম্মুখীন হইতে হয় নাই। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী এইরূপ সরল ও বৈচিত্র্যহীন পথে চলিয়াছে। কিন্তু কাশীরামদাসের গ্রন্থে সুভদ্রাহরণ কাহিনী বহুবিধ বৈচিত্র্যে মনোহর হইয়াছে।

সুভদ্রার একটি সুন্দর রূপ বর্ণনার দ্বারা কবি কাশীরামদাসের সুভদ্রাহরণ কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে—

"বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুল।
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরুবক ফুল॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দিকে ঝংকারিয়া অনুক্ষণ বুলে॥
দুইগণ্ড কুণ্ডল মণ্ডিত শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসা দুলে॥
বদন নিন্দিয়ে চাঁদ, নাসা তিল ফুলে।
কটাক্ষের চাহনিতে মুনি মন ভুলে॥
কুচযুগ সমপূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুল॥
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী যূথীহার পরে মালতী বকুল॥" পৃঃ ২৬৭

রূপ বর্ণনার পর, আরম্ভ হইতেই কাহিনী ভিন্ন পথে চলিয়াছে। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে সংস্কৃত মহাভারতে অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার পূর্ব অনুরাগের কোনও পরিচয় নাই। কিন্তু কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন এই অপূর্ব সুন্দরী সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া অর্জুন যেমন অন্যমনা ও আকৃষ্ট হইয়াছেন, তেমনই সুভদ্রাও অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বিদ্যাপতির রাধার অনুরূপ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-পত্নী সত্যভামার নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কবি কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন—

"সুভদ্রা বলিল, দেবি ! ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাত।
দেখেন পদেতে নাহি কণ্টকাঘাত ॥
সত্যভামা বলেন, কি হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা বলিলা ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে, কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল তা কোথা পাবে দেখি ॥
অর্জুনের মনোজ্ঞ অপাঙ্গ তীক্ষ্ণ শর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জরজর ॥" পৃঃ ২৬৭

সংস্কৃত মহাভারতে সুভদ্রাকে লাভ করিবার জন্য অর্জুনের আগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণ পরামর্শে অর্জুন আকস্মিকভাবে সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছেন কিন্তু এখানে অর্জুনকে লাভ করিবার জন্য সুভদ্রার ব্যগ্রতা কাহিনীর মধ্যে অতিরিক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে ও নূতন গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। ধনঞ্জয়কে লাভ করিবার ব্যগ্রতায় সুভদ্রা সত্যভামাকে বলিয়াছেন—

"আজি যদি ধনঞ্জয় আমারে না দিবে।
নিশ্চিত আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥
সত্যভামা বলে ভদ্রা চল এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থ সহ করাব মিলন ॥" পৃঃ ২৬৮

সত্যভামা সুভদ্রাকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। রজনীতে তিনি কৃষ্ণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। কৃষ্ণও সুভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে সমর্পণ করিতে আগ্রহী কিন্তু সেই রাত্রের মধ্যে তাঁহার পক্ষেও সুভদ্রা অর্জুনের মিলন সাধন সম্ভব নহে। কৃষ্ণের নিকট হইতে কোনও সহায়তা না পাইয়া সত্যভামাকে নিজেই এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হয়। তিনি সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া গভীর নিশীথে অর্জুনের শয়নগৃহে উপনীত হন। এই অংশে পারিবারিক জীবনের সহজ হাস্য পরিহাসের কথা উল্লেখ করিয়া কবি তাঁহার কাহিনীকে মনোহর করিয়াছেন। অর্জুন কক্ষে উপনীত হইয়া সত্যভামা অর্জুনকে বলিয়াছেন—

"তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে ॥

এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখ নিবাস।
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব আর এক পরমাসুন্দরী ॥" পৃঃ ২৬৯

সেই পরমাসুন্দরীর পরিচয় লাভ করিয়াও অর্জুন সত্যভামার অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তখন নারীসুলভ পরিহাসে বিদ্ধ করিয়া সত্যভামা অর্জুনকে বলিয়াছেন—

"........ ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
একতিল পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥
যে লোভে নারদ বাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কি মতে করিবা বিভা দ্রৌপদীর ভয় ॥" পৃঃ ২৬৯

ইহার উত্তরে অর্জুনও পরিহাসে সত্যভামাকে প্রতিবিদ্ধ করেন—

"পার্থ বলিলেন, "দেবি, না নিন্দ দ্রৌপদী।
ত্রিজগৎ জনে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোড়শ সহস্র-শত-অষ্ট পাটরাণী।
সবা হইতে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা কি রূপহীনা হীন কুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি কন্যা পাটরাণী শত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমাব সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥
দিব্য রত্ন বসন ভূষণ অলংকার।
যেখানে যে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবি ইহা কোন গুণে কর ॥" পৃঃ ২৬৯

কাশীরামদাস এইরূপে সত্যভামা ও অর্জুনের মধ্যে সহজ হাস্য পরিহাসের একটি পারিবারিক চিত্র উত্থাপন করিয়াছেন। এই সকল হাস্য পরিহাস সত্বেও সত্যভামা বুঝিতে পারিলেন ভদ্রাকে বিবাহ করিতে পার্থকে প্ররোচিত করা সম্ভব নহে। পার্থ স্বীয় সংকল্পে অটল, দৃঢ় চরিত্র সংযমী বীর। তখন তিনি পার্থকে প্ররোচিত করিবার জন্য পৃথক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। পার্থের সুদৃঢ় মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি ভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া অর্জুনগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন

এবং মায়াবতী কামপ্রিয়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীরামদাসের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

"নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্র তারে আনেন ডাকিয়া ॥
একান্তে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে ঠাকুরাণি এ কোন বিচিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব করে।
অস্থি সার অনাহারী পারি মোহিবারে ॥
এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
যাহ দেবী এইক্ষণে যাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥" পৃঃ ২৮৫

এইরূপে মন্ত্রপূত সিন্দূর ও কজ্জলে শোভিত হইয়া ভদ্রা যখন অর্জুন শয়নগৃহে উপনীত হইয়াছেন তখন অর্জুন তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সাধারণ পাঠকের সুলভ মনোরঞ্জন করিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি।
স্ত্রী নহিলে কাটিতাম খড়্গেতে এখনি ॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লইয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কান কাটিব এ খড়্গে ॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥" পৃঃ ২৮৫

কিন্তু সুভদ্রার সিঁথিতে মন্ত্রপূত সিন্দূর ও নয়নে কজ্জল দর্শন করিয়া অর্জুন কামনায় বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি সুভদ্রার মৃদু বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্বক তাঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ মিলিত হন। এই সময় সখীগণসহ সত্যভামা উপস্থিত হইয়া সুভদ্রা ও অর্জুনের গান্ধর্ব বিবাহ সম্পাদন করান। এইরূপে সত্যভামা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন, সেই রাত্রের মধ্যেই ভদ্রার সহিত অর্জুনের বিবাহ দিয়া ভদ্রার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গোপন মিলন ও বিবাহ সাধিত হইলেও সমস্ত বাধা তখনও বিদূরিত হয় নাই। সুভদ্রা ও অর্জুনের চিরস্থায়ী মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া কাশীরামদাস কাহিনীকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন, সুভদ্রার বিবাহ ব্যাপারে কৃষ্ণ-বলরামের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে। কৃষ্ণ অর্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিতে উৎসুক হইলেও বলরাম অর্জুনকে পছন্দ করেন না: তিনি দুর্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিতে দৃঢ়সংকল্প। তিনি সকলের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া এই মর্মে দুর্যোধনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং বিবাহোদ্দেশ্যে দ্বারকাতে সত্বর উপনীত হইতে বলেন। দুর্যোধন সহর্ষে সৈন্য সামন্ত ও আত্মীয়বর্গ সমভিব্যাহারে দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির সুভদ্রার সহিত দুর্যোধনের বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে কয়েক দিন পূর্বে সুভদ্রার সহিত

অর্জুনের বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। এই ঘটনা কৃষ্ণের অন্তঃপুরেও বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। সুভদ্রা যে অর্জুনকে গোপনে বিবাহ করিয়াছে তাহা রোহিণী, দেবকীকে জানাইয়াছেন। রোহিণী ও দেবকী উভয়ে মিলিয়া বলরামকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রোহিণী বলরামকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন—

"যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি ॥" পৃঃ ২৮৮

অর্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিবার কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলরাম মাতাকে বলিয়াছেন—

"বাতুলের প্রায় মাতা কহিছ বচন।
অন্য হইলে কোথা তার রহিত জীবন ॥" পৃঃ ২৮৮

সকলের সমস্ত অনুরোধ, উপেক্ষা করিয়া বলরাম দুর্যোধনের সহিত বিবাহ দিবার জন্য সুভদ্রার অধিবাসের আদেশ দিয়াছেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধনও প্রায় দ্বারকায় উপনীত হইয়াছেন। এই চরম মুহূর্তে আত্মীয়গণ সুভদ্রাকে যখন সরস্বতী সলিলে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছেন সেই সময় কৃষ্ণের পরামর্শক্রমে অর্জুন মৃগয়ার ছলে কৃষ্ণেরই রথে সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছেন। এইরূপে কাহিনীর মধ্যে সংকটকে ঘনীভূত ও একটি বিশেষ সময় সীমা নির্দিষ্ট করিয়া কবি কাহিনীর গতি ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সংস্কৃত মহাভারতে অর্জুনের সহিত দ্বারকাবাসীর সংগ্রামের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু কাশীরামদাস সেই সংগ্রামের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অর্জুন যখন সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন সেই সময় যাদবগণ তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তখন অর্জুন বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণ-রথের সারথি দারুক তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় অর্জুন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া রথ পরিচালনা করিয়াছেন এবং যুদ্ধও করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের সবিস্ময় আনন্দের উদ্রেক করিয়া কবি কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন—

"পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বাঁধিলেন রথস্তম্ভে আপন দক্ষিণে ॥
একপদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টংকারিয়া রহেন বাহুড়ি ॥" পৃঃ ২৯৮

এইরূপে যুদ্ধ করা সম্ভব কি না তাহা প্রশ্ন করা যাইতে পারে কিন্তু সাধারণ পাঠক যে এই বর্ণনাতে মুগ্ধ হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার পরবর্তী বর্ণনা পাঠক-চিত্তকে আরও মোহিত করে—

"ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে, চালাই অশ্বগণে ॥
... ...
আজ্ঞা কর, রথ চালাইব কোন পথে।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাতে ॥

চালাইয়া দিল রথ বায়ুবেগে চলে।
না দেখিতে গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে ॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল হয়বর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া যতেক সৈন্যগণ।
সৈন্য মধ্যে ভ্রমে যেন নর্ত্তক খঞ্জন ॥
বিদ্যুৎ বরণ ভদ্রা, পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পশে মেঘের ভিতর ॥" পৃঃ ২৯৮

সংস্কৃত মহাভারতে সুভদ্রার রথ পরিচালনার কোনও উল্লেখ নাই। এখানে সুভদ্রার রথ পরিচালনা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করিয়াছে।

এইরূপে সুভদ্রাকে কেন্দ্র করিয়া কবি কাশীরামদাসের কাহিনীতে কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে একটা মর্যাদার লড়াই সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে বলরামের দৃঢ় অভিমত, মধ্যযুগীয় গৃহকর্তার অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় বহন করিতেছে। ইহার সহিত সুকুমারমতি কিশোরী বালিকা সুভদ্রার ভালবাসার মধ্যে যেন একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কাহিনী গতি ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি নাটকীয় চরম মুহূর্তের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই মুহূর্তে অর্জুন সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়া কাহিনীর পরিসমাপ্তি আনিয়াছেন।

পারিজাতহরণ কাহিনী

এই কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতে নাই। কবি কাশীরামদাসের নূতন সংযোজন। কাহিনী অংশে বিবৃত হইয়াছে যে একদিন রৈবতক পর্বতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণীর সহিত বিহার করিতেছিলেন তখন মহর্ষি নারদ সেইখানে উপনীত হন এবং তাঁহার বীণায় যে পারিজাত কুসুম ছিল তাহা কৃষ্ণের নিকট অর্পণ করেন। কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া সেই স্বর্গীয় কুসুম রুক্মিণীকে দান করেন এবং রুক্মিণী ইহা তাঁহার কেশে ধারণ করেন। ইহা দর্শন করিয়া কলহসৃজন-নিপুণ ঋষি নারদ কৃষ্ণের পরিবারে দারুণ কলহের সৃষ্টি করেন। তিনি এই সংবাদ কৃষ্ণের অন্যতম মহিষী সত্যভামার নিকট পরিবেশন করেন। সপত্নীর এই সমাদরে সত্যভামা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। প্রেয়সী পত্নীর অভিমানের সংবাদে কৃষ্ণ ত্বরিত গমনে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু পারিজাত কুসুম ভিন্ন তাঁহার ক্রোধ দূরীভূত করা যাইবে না। অনন্যোপায় কৃষ্ণ রুক্মিণীর নিকট এই কুসুম প্রার্থনা করেন। কিন্তু সপত্নীর জন্য কেহ এই স্বার্থত্যাগ করে নাই, সেইজন্য রুক্মিণী তাহা কৃষ্ণকে দেন নাই। শেষ পর্যন্ত এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কৃষ্ণ সত্যভামা সমভিব্যাহারে পারিজাত কুসুমের জন্য স্বর্গপুরীতে গমন করেন। সেখানে ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম হয়। তদপেক্ষা তুমুলতর কলহ হয় সত্যভামার সহিত শচীর। অবশেষে মহাদেবের মধ্যস্থতায় ইন্দ্র ও কৃষ্ণের বিরোধ সমাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণ পারিজাত কুসুম লাভ করেন।

সত্যভামার ব্রত উদযাপন

সত্যভামার ব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতে নাই। জগতে কৃষ্ণপ্রেমই যে একমাত্র লক্ষ্য এবং জীবনের পরমতম সম্পদ, নাম ও নামী যে অভিন্ন, এই বৈষ্ণব চেতনা ও জীবন বোধ এই কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। নারদ সত্যভামাকে বলেন পার্বতী শচী প্রভৃতি এমন এক ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন যাহার পুণ্যফলে তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীকে জন্ম জন্মান্তরে লাভ করিবেন। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে স্বামীকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নারদ ঋষিকে দান করা প্রয়োজন। নারদ বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া সত্যভামা এই ব্রতপালনে আগ্রহী হন। কৃষ্ণপ্রেমে গর্বিত হইয়া অহংকার মদে মত্ত চিত্তে তিনি মনে করেন কৃষ্ণের উপর তাঁহারই একমাত্র অধিকার এবং সেই অধিকারে তিনি কৃষ্ণকে দান করিতে সক্ষম। এই অধিকার বোধে তিনি কৃষ্ণকে নারদের নিকট দান করেন। কৃষ্ণকে সত্যভামার নিকট হইতে দানরূপে গ্রহণ করিয়া নারদ কৃষ্ণকে সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত করেন এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করেন। নারদ কৃষ্ণকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাঁহার অগণিত ভক্ত ও আত্মীয় স্বজনের সহিত সত্যভামাও ক্রন্দনে আকুল হইলেন। সত্যভামা ব্রত পালন করিয়া পুণ্যলাভের আকাংখায় এতই আগ্রহী ছিলেন যে এই বেদনাদায়ক পরিণতির কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই। বর্তমানে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হইয়া নারদকে বারংবার অনুনয় করিলেন কৃষ্ণকে পুনঃপ্রত্যর্পণ করিতে। অবশেষে সত্যভামার কাতর ক্রন্দনে নারদ বলিলেন তৌলদণ্ডে কৃষ্ণের সমান ওজনের ধনরত্ন দান করিলে তিনি কৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ইহাতে সকলেই সুখী হইলেন এবং যাঁহার কাছে যত ধন রত্ন আছে সমস্ত আনয়ন করিলেন। কিন্তু সমস্ত ঐশ্বর্য একত্রে কৃষ্ণের সমতুল্য হইল না। যাঁহাকে ভক্তিতে ভালোবাসাতে লাভ করা যায়, তাঁহাকে অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। এই সময় নারদ নূতন সত্যের সন্ধান দিলেন। তিনি বলিলেন অর্থসম্পদ কখনও কৃষ্ণের সমতুল্য হইতে পারে না। নাম ও নামী অভিন্ন। সুতরাং অর্থ সম্পদের পরিবর্তে তুলসীপাতায় কৃষ্ণ নাম লিখিলে তাহা সমান হইবে। নারদ বাক্যে তুলসীপাতায় কৃষ্ণ নাম লিখিয়া তৌলদণ্ডের একদিকে রাখা হইল তখন দেখা গেল তুলসীপাতা নীচে রহিয়াছে নারায়ণ উঠিয়াছেন উপরে।

জনমেজয়ের ধর্মহিংসা ও অশ্বমেধযজ্ঞ

এই কাহিনী কবি কাশীরামদাসের গ্রন্থে নূতন সংযোজন। কিন্তু কাহিনীর প্রকৃতি বিচারে মনে হয় ইহা অন্য কোনও পুরাণ হইতে আহরিত। রাজা জনমেজয় যখন জানিতে পারিলেন ব্রহ্মশাপে তাঁহার পিতা পরীক্ষিৎ তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করেন তখন তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য স্থির করেন যেখানে যত ব্রাহ্মণ আছে সকলকেই তিনি বধ করিবেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য তিনি মন্ত্রীগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাহাদের পরামর্শে তিনি সমস্ত কুশ বিনষ্ট

করিতে সচেষ্ট হইলেন কারণ কুশ না পাইলে ব্রাহ্মণেরা পূজার্চনা করিতে পারিবেন না এবং তখন আচার ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা বিনষ্ট হইবেন। ব্যাসদেব ইহা জানিতে পারিয়া জনমেজয়কে এইরূপ দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত করেন। তখন জনমেজয় সর্প-যজ্ঞে অসংখ্য সর্প হত্যা করার পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে এই অনুমতিও দান করেন নাই। কারণ কলিতে অশ্বমেধ, মাংস শ্রাদ্ধ, সন্ন্যাস, গোমেধ এবং দেবর হইতে পুত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাজা জনমেজয় কিন্তু ব্যাসদেবের নিষেধ অমান্য করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ফলে যজ্ঞের সময় যখন অশ্বের মুণ্ড কাটিয়া যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইল তখন দেখা গেল ছিন্ন অশ্বমুণ্ড লাফাইতেছে। ইহা দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ বালক হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা মনে করিলেন এই বালক তাঁহাকে বিদ্রুপ এবং উপেক্ষা করিয়া হাসিতেছে। তিনি ইহাতে চরম অপমানিত বোধ করিয়া খড়্গাঘাতে সেই ব্রাহ্মণ বালকের শিরশ্ছেদ করিলেন। ইহাতে রাজার যজ্ঞ পণ্ড হইল, সকলেই রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজার দুর্গতির কথা ধ্যানে জানিতে পারিয়া ব্যাসদেব রাজার নিকট পুনরাগমন করিয়া রাজাকে মহাভারত শ্রবণ করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে তাঁহার পাপ দূরীভূত হইবে। কৃষ্ণচন্দ্রাতপ তলে উপবেশন করিয়া মহাভারত শ্রবণ করিতে থাকিলে যখন সেই চন্দ্রাতপ শুক্ল বর্ণ ধারণ করিবে তখনই বোঝা যাইবে রাজা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ব্যাসদেবের উপদেশানুসারে রাজা জনমেজয় কৃষ্ণচন্দ্রাতপের নীচে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট হইতে মহাভাবত শ্রবণ করিতে আরম্ভ করেন।

সভাপর্ব

সভাপর্বে কবি কাশীরামদাসের রচনায় নিম্নলিখিত অংশ সমূহে মূল মহাভারতের সহিত পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় :—

(১) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বর্ণনা (পৃঃ ৩৪৭-৩৫৮)।

(২) দুই সতীনের ঝগড়া (পৃঃ ৩৫৮-৩৬১)।

(৩) বিভীষণের যজ্ঞে আগমন এবং বিভিন্ন দ্বারে যজ্ঞে প্রবেশে প্রতিহত হইয়া অপমান (পৃঃ ৩৬১-৩৬৬)।

(৪) শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চারিজন রাজার প্রাণদান (পৃঃ ৩৬৬-৩৬৮)।

(৫) শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে সর্বলোকের মূর্চ্ছা (পৃঃ ৩৭১-৩৭৪)।

(৬) রাজসভায় দ্রৌপদীর নিগ্রহ (পৃঃ ৩৯৭-৪০৭)।

(৭) বনবাস গমনোদ্যত দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ (পৃঃ ৪১৯-৪২১)।

ইহাদের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বর্ণনা

পূর্ব বিবৃত (১) হইতে (৫) সংখ্যক কাহিনীতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য এইগুলির একসঙ্গে আলোচনা করা হইল। সংস্কৃত মহাভারতের সহিত তুলনায় ইহাদের বিশেষ পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রাজ্যের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজারাও এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভা ৩৩।৬-১৬ এই এগারোটি শ্লোকে এই সকল রাজাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। হস্তিনানগর হইতে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়াছেন। নিমন্ত্রিতদের যে বিবরণী সংস্কৃত মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত। কিন্তু কবি কাশীরামদাসের রচনায় নিমন্ত্রিতদের বিবরণে কবির কাল্পনিকতা ও কাহিনীর অস্বাভাবিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ কেবলমাত্র এই ভুবনেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ইহা ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত। এ বিষয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তথা হৈতে বিশেষ কর মহাভাগ॥
তার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইল ভুবন।
ত্রিভুবন লোক তুমি করহ নিমন্ত্রণ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজেশ্বর॥" পৃঃ ৩৪৮

কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অর্জুন অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া দেবলোকে নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা করেন। অর্জুন কুবেরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কৈলাসে হরপার্বতীর নিকট গমন করেন। তথা হইতে তিনি সুরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রেতলোকে প্রেতপতি যমের নিকট উপনীত হন। যমলোক হইতে বরুণলোক, বরুণলোক হইতে পৃথিবীদক্ষিণে লঙ্কাধিপতি পরম কৃষ্ণভক্ত বিভীষণকে নিমন্ত্রণ সমাপন করিয়া নাগলোকে বাসুকির নিকট উপনীত হন। সেখানে পৃথিবী ধারণরত শেষ নাগকে রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানাইলে শেষ নাগ বলেন—

"মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে, কে ধরিবে ক্ষিতিভার॥" পৃঃ ৩৫৫

অর্জুন শেষ নাগকে তাহার কর্তব্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া স্বয়ং সেই ভার গ্রহণ করেন। শেষ নাগ মস্তক হইতে পৃথিবী ভার ত্যাগ করিয়া অর্জুনকে তাহা ধারণ করিতে বলেন। অর্জুন শেষ নাগের কাজ কিরূপে পালন করিতে সমর্থ হইবেন তাহা জানিবার

জন্য পাঠকের আগ্রহ তীব্র হইয়া উঠে। সেই ঔৎসুক্য নিবারণ করিয়া কাশীরামদাস বর্ণনা করেন—

"ইহা শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব॥
ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন॥
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে নিয়া।
জুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্র বসাইয়া॥
ধরেন ধরণী, শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল॥" পৃঃ ৩৫৬

অর্জুনের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এইরূপে কবি নূতন কাহিনী রচনা করিয়াছেন।

কবির কাহিনী রচনাশক্তি আরও সুন্দর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে সংযোজিত দুই সতীনের কলহ (পৃঃ ৩৫৮-৩৬১) এই অধ্যায়ে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আত্মীয় বর্গ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। অন্যান্য আত্মীয় বর্গের সহিত পঞ্চ পাণ্ডবদের একান্ত আপনার জন মধ্যপাণ্ডব ভীমের মহিষী ঘটোৎকচ জননী হিড়িম্বাও সপুত্র আসিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে গমন করিয়া হিড়িম্বা তাঁহার মর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে যেখানে দ্রৌপদী, ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে যাইয়া দ্রৌপদীকে কোনও সম্ভাষণ না করিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থলে হিড়িম্বা উপবেশন করিলেন। হিড়িম্বার আচরণে আপন মর্যাদা সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা ছিল। কিছুটা উগ্রতাও ছিল। তাঁহার আসন পরিগ্রহ করিবার যে বিশেষ ভঙ্গী কবি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কলহের বীজ রোপন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। উপ্ত বীজ কালবিলম্ব না করিয়া অঙ্কুরিত হইল এবং কলহের বনস্পতি রূপ ধারণ করিল। দ্রৌপদী হিড়িম্বার এই উদ্ধত আচরণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি পঞ্চপাণ্ডবের প্রধানা মহিষী। হিড়িম্বার কিছু পরে পাণ্ডব পরিবারে তাঁহার আগমন হইলেও তাঁহার গুরুত্বই সর্বাধিক। তিনি সেই আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কলহপরায়ণা বাঙ্গালী নারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া হিড়িম্বাকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন না করিয়াও লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

'·নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ পায় যার যেই রীতি॥
কি আহার, কি আচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ॥
পূর্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন॥
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
তুই ত' ভজিলি সেই ভ্রাতৃহন্তা জনে॥
সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন।
একে কুপ্রবৃত্তি তায় নাহিক বারণ

সম্ভ্রানিয়া বেড়াস ভ্রমরী যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হৈয়া কুলবধূ॥
মানে মানে বস গিয়া তোর যোগ্য স্থানে।
বসিবার যোগ্য তুই নহিস এখানে॥" পৃঃ ৩৬০

হিড়িম্বা দ্রৌপদীর কটুবাক্য নির্বিবাদে সহ্য করিবার পাত্রী নহেন। তিনি দ্রৌপদীর বাক্যের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া বলিলেন—

"অকারণে পাঞ্চালি করিস অহংকার।
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার॥
কুরূপ কুৎসিৎ লোক নিন্দে ততক্ষণ।
যতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন॥" পৃঃ ৩৬০

হিড়িম্বা দ্রৌপদীকে বলেন যে তিনি যেমন ভ্রাতৃহন্তাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, সেইরূপ যাহারা পাঞ্চালীর পিতাকে অপমান করিয়াছিল তাহাদের তিনিও বিবাহ করিয়াছেন। সর্বোপরি হিড়িম্বা দ্রৌপদীকে স্মরণ করাইয়া দেন--

"আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তব বিবাহের আগে বিবাহ আমার॥" পৃঃ ৩৬০

নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করিবার জন্য হিড়িম্বা যখন পুত্র ঘটোৎকচের উল্লেখ করিতেছিলেন তখন দ্রৌপদী আর থাকিতে না পারিয়া অন্তরের অসহ্য ক্রোধে বলিয়াছেন—

"পুনঃ পুনঃ যতেক কহিস্ পুত্র কথা।
পুত্রের করিস গর্ব, খাও পুত্রমাথা॥" পৃঃ ৩৬১

হিড়িম্বাও মূক রহিলেন না, তিনিও বলিলেন—

"আমার নির্দোষ পুত্রে দিলে তুমি শাপ।
তুমিও পুত্রের শোকে পাবে মনস্তাপ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র করে স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হৈবে নাশ॥" পৃঃ ৩৬১

দুই সপত্নীতে যখন এইরূপ শাপ শাপান্ত চলিতেছিল তখন কুন্তীদেবী আসিয়া কোনক্রমে কলহের অবসান ঘটান।

এইখানে কাশীরামদাসের হিড়িম্বা ও দ্রৌপদী উভয়েই যেন বাঙ্গালী নারী। পরস্পর আত্মীয়া এইরূপ রমণীরা যখন কোন উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালী গৃহে সমবেত হন তখন অনেক সময়েই মিলনের হাস্য কলরোলের সহিত কলহের কর্কশ ধ্বনিও শ্রুতিগোচর হয়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রচণ্ড কলরবের মধ্যে কবি কাশীরামদাসের কণ্ঠে বাঙ্গালী উৎসবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক এই ধ্বনি শ্রুত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা ও কৃষ্ণ মহিমা প্রকাশ করিয়া কবি কাশীরামদাস নূতন কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল কাহিনীতে বিভীষণ অন্যতম ব্যক্তি। কৃষ্ণের নির্দেশে পার্থ বিভীষণকে রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। পার্থের আমন্ত্রণে বিভীষণ কৃতার্থ হইয়া যজ্ঞে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার আজীবনের বাসনা চরিতার্থ

হইয়াছে। কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন যে এই যজ্ঞে এত বিপুল সংখ্যক রাজার সমাবেশ হইয়াছে যে সকলকে প্রবেশ করিতে দেওয়া সম্ভব নহে। চার দ্বারে চারজন দ্বারী দ্বার পাহারা দিতেছে। তাহারা উপযুক্ত আদেশ না পাইলে কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতে পারে না। সেইজন্য উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চার দ্বারেই বিভীষণ ও শ্রীকৃষ্ণ প্রতিহত হইয়াছেন। প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাতে একদিকে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ মহিমা যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, সর্বলোক স্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা হইয়াও ভক্তের প্রতি ভালোবাসায় স্বেচ্ছায় ভক্তের নিয়ম মানিয়া লইয়াছেন এবং যজ্ঞে প্রবেশের জন্য বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। আবার যখন তিনি যজ্ঞে প্রবেশ করিয়া সমাগত অমরগণের সমক্ষে দর্শন দান করিয়াছেন তখন সকলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। কৃষ্ণ মহিমার কথা প্রকাশ করিয়া কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন—

"দেবতা গন্ধর্ব আর অপ্সরা কিন্নর।
দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি রক্ষ খগবর॥
একজন বিনা আর যে ছিল যথায়।
কতদূরে পড়ি সবে হইল নমস্কার॥" পৃঃ ৩৭২

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন আশ্রয় করিয়া কাশীরাম দাস এখানেও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ॥
... ...
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভিত হৃদয়॥
গলে দোলে আজানু লম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা॥" পৃঃ ৩৭২

বিশ্বপতির বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া দেবগণ অচেতন হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অচেতন দেবগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"করজোড় করি বলে দেব ভগবান।
পূর্বদিকে মহারাজ কর অবধান॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্মুখ অষ্টভুজ জুড়ি॥
তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ॥

কার্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
স্তুতি করি নমে তোমা, ধন্য তুমি তাত॥
দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি রাজ ঋষিগণ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ॥" পৃঃ ৩৭৩

শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে মনে হইতেছে এই সকল দেবগণ যেন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সমাগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকেই প্রণাম জানাইতেছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ অপেক্ষা যুধিষ্ঠির পঞ্চাশ সোপান ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল তাঁহারা বুঝি যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম জানাইতেছেন। এইরূপে কৃষ্ণের কৌশলে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ত্রিলোকের সকলেই যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম জানাইয়াছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণও বাদ যান নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে॥" পৃঃ ৩৭৪

শ্রীকৃষ্ণের এই আচরণে তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে একটি জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। বিভীষণের প্রতিজ্ঞা ছিল যে কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রণাম করিবেন না। ইহার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াও যদি বিভীষণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম না করিতেন তাহা হইলে এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইত। কৃষ্ণের কৌশলে এই জাতীয় কোন ঘটনা ঘটে নাই। বিভীষণের চিত্তে আঘাত লাগে নাই, যুধিষ্ঠিরের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

কাশীরামদাসের বর্ণিত এই কাহিনীতে কবি কল্পনার আতিশয্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাহিনী অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ইহাতে নরপতি অপেক্ষা দেবতাদের প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় যুধিষ্ঠিরের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী রাজন্যবর্গের কাহিনী। রাজন্যবর্গ আনীত অসংখ্য উপহার দ্রব্যের বিবরণীতে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত নৃপতিগণ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহারা রাজা এবং তাঁহাদের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করা যজ্ঞের হোতা যুধিষ্ঠিরের অন্যতম কর্তব্য। সেইজন্য সমাগত নৃপতিগণের অবস্থানের ও পরিচর্যার বিশদ বিবরণ সংস্কৃত মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল বিবরণ তৎকালীন রাজকীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশকে প্রকাশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে কবি কাশীরামদাসের কাহিনীতে আমরা যে বিবরণ পাই তাহা রাজাদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা প্রকাশ করে না। এই সকল রাজাদের আচরণ যেমন রাজকীয় বৈশিষ্ট্য বর্জিত তেমনই তাঁহাদের প্রতি যে আচরণ করা হইয়াছে তাহাও নিম্ন-স্তরের সাধারণ মানুষের উপযুক্ত কোন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরূপ নহে।

রাজসভায় দ্রৌপদীর নির্যাতন

সভাপর্বে প্রকাশ্য রাজসভায় প্রবল পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ স্বামীর সমক্ষে তাঁহাদের প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা মহাভারতের একটি অনন্যসাধারণ অংশ। কবি কাশীরামদাস মূল গ্রন্থকে এই অংশে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু উপস্থাপনার পার্থক্যের জন্য উভয় গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে।

সংস্কৃত মহাভারতে বিবৃত হইযাছে দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকেও যখন পণে হারাইলেন, তখন উল্লসিত রাজা দুর্যোধন রাজ অন্তঃপুব হইতে দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় আনয়ন করিবার জন্য প্রাতিকামীকে আদেশ দেন। প্রাতিকামী দুর্যোধনের আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত একাধিকবার দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়া ফিরিয়া আসিল কিন্তু দ্রৌপদীকে আনিতে পারিল না। তখন এই কার্যের ভার দুঃশাসনের উপর অর্পিত হইল। তিনি গর্বিত পদক্ষেপে অন্তঃপুরে উপনীত হইলে, দুঃশাসন-ভয়ভীতা দ্রৌপদী অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের অন্তরালে আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করিলেন কিন্তু দুঃশাসনের পাশব শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না। সংস্কৃত মহাভারতে এই অংশ নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"...তাহার পর দুঃশাসন ভ্রাতার আদেশ শুনিয়া আরক্ত নয়নে উঠিয়া যাইয়া পাণ্ডবগণের গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল। "পাঞ্চাল নন্দিনি! আইস, আইস কৃষ্ণে! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় বিজিত হইয়াছ; অতএব লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দুর্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ কর। হে সুদীর্ঘ পদ্মনয়নে! তুমি কৌরবদিগকে ভজনা কর। তুমি ধর্ম অনুসারেই লব্ধ হইয়াছ, অতএব সভায় আগমন কর।" তাহার পর অত্যন্ত দুঃখিতা দ্রৌপদী গাত্রোত্থান করিযা হস্ত দ্বারা মলিন মুখ মার্জনা করিয়া আকুল হইয়া যেখানে গান্ধারী ভিন্ন ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য ভার্যারা অবস্থান করিতেছিলেন সেইখানে দৌড়িয়া গেলেন। তদনন্তর দুঃশাসনও রোষবশতঃ অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিতে করিতে বেগে যাইয়া দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার দীর্ঘ নীল ও কুঞ্চিত কেশকলাপ ধারণ করিল।

যে কেশকলাপ রাজসূয় মহাযজ্ঞে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, দুঃশাসন পাণ্ডবগণের বলকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্বক সেই কেশকলাপ ধারণ করিয়াছিলেন।

দ্রৌপদীর স্বামীরা সেখানে বিদ্যমান ছিলেন, তথাপি তিনি স্বামীহীনের মতই হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই দুঃশাসন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া সভার নিকটে গিয়া বায়ু যেমন কদলীবৃক্ষকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ সভার মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিল।" (সভা ৬৪।২৫-৩০)

কাশীরামদাস এই অংশ কিছুটা পৃথক রূপে বর্ণনা করিয়া কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায় দ্রৌপদী যখন দুঃশাসন ভয়ে ভীতা হইয়া আত্মরক্ষার্থে অন্তঃপুরিকাদের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময় কুন্তীদেবী দুঃশাসনকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মদোন্মত্ত সেই পাষণ্ডকে প্রতিহত করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। সেই পাশব শক্তির

কাছে তাঁহার দুর্বল প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কবি কাশীরামদাস তাহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"দ্রৌপদীর দিকে চাহি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী, কর রাজাজ্ঞা পালন॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ এবে ত্যজ যুধিষ্ঠিরে॥
দুষ্টবুদ্ধি দুঃশাসনে দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদনা আর বিকৃত আকৃতি॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল॥
গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনেরে চাহিয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ, না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লয়ে যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের কলংক ভয় নাহিক তোমার॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে॥
যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয়॥
তাহা ধরি দুঃশাসন আনে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতি॥" পৃঃ ৪০১

অন্তঃপুরের মধ্যে কুলবধূকে যখন কেহ অসম্মান করিতে উদ্যত হয়, তখন সেখানে যত দুর্বলই হোক কিছুটা প্রতিরোধের সৃষ্টি হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কাশীরামদাসের বর্ণনায় সেই স্বাভাবিকতার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে অধিকন্তু কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়া ইহাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার পরবর্তী অংশে সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কাশীরামদাসের মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অথচ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দুঃশাসনের আকর্ষণে প্রবল বাত্যাকর্ষিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণা যখন প্রকাশ্য সভাক্ষেত্রে আনীত হইলেন এবং তাঁহার উপর জঘন্যতম নির্যাতন চলিতে লাগিল তখন মধ্যম পাণ্ডব পবন নন্দন ভীমের প্রতিক্রিয়া দুই মহাভারতে দুইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সভামধ্যে আনীত হইয়া দ্রৌপদী তীক্ষ্ণ বিলাপ করিতে করিতে পঞ্চ স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। দুঃশাসন তাঁহাকে নিষ্ঠুর ও কটুবাক্য বলিতেছিল। তিনি রজস্বলা ছিলেন। সেই অবস্থাতেই

দুঃশাসন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। তাহাতে তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়াছিল। এই নিগ্রহ দ্রৌপদীর সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের নিকটও ইহা অসহনীয় হইয়াছিল কারণ শক্তি থাকিতেও তিনি দুষ্কৃতকারী-গণকে নিবৃত করিতে ও যথোচিত শাস্তিদান করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অগ্রজের কৃতকর্মের জন্য তিনি ধর্মপাশ বদ্ধ। তাই তাঁহাকে প্রিয়তমা পত্নীর উপর নির্যাতন অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কারণ তাঁহার দ্যূতক্রীড়াসক্তিই দুর্বৃত্তগণকে এই সুযোগ দান করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীকে যাহারা নির্যাতন করিতেছে তাহাদের যেমন তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই তেমনই সেই নির্যাতনের যিনি কারণস্বরূপ তাঁহাকেও তিনি ক্ষমা করিবেন না। সেইজন্য একান্ত অনুগত হইয়াও শ্রদ্ধেয় অগ্রজকে তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"...মহারাজ যুধিষ্ঠির! দেশে দ্যূতকারদিগের বেশ্যা থাকে, তাহারা ত' তাহাদের দ্বারাও খেলা করে না। কারণ তাহাদের উপরেও তাহাদের দয়া থাকে। তারপর কাশীর রাজা যে ধন এবং অন্যান্য যে সকল উত্তম দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন; আর অন্যান্য রাজারা যে সকল রত্ন, বাহন, ধন, কবচ ও অস্ত্র দিয়াছিলেন সেই সকল বস্তু, রাজ্য, আত্মা এবং আমরা এ সমস্তই শত্রুরা ছলপূর্বক হরণ করিয়াছে। তাহাতেও আমার ক্রোধ হয় নাই। কারণ আপনি আমাদের এবং সমস্ত বস্তুরই স্বামী। কিন্তু এইটাই গুরুতর অন্যায় বলিয়া মনে করি যে দ্রৌপদীকে পণ ধরিয়াছেন। এই দ্রৌপদী পাণ্ডব-গণকে পাইয়া এরূপ কষ্ট পাইবার যোগ্য থাকেন নাই; তথাপি ক্ষুদ্র স্বভাব, নৃশংস প্রকৃতি ও অশিক্ষিত কৌরবেরা আপনার জন্যই ইহাকে কষ্ট দিতেছে। অতএব রাজা! দ্রৌপদীর জন্যই আপনার উপরে এই ক্রোধের ফল আরোপ করিব। আপনার হস্তযুগল দগ্ধ করিব। সহদেব! অগ্নি আনয়ন কর।" (সভা ৬৫।১-৬)

কবি কাশীরামদাসের ভীমের উক্তির সহিত সংস্কৃত মহাভারতের ভীমের উক্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তবুও কবির রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের ক্ষাত্রক্রোধের পরিবর্তে কোমলতা ও ভক্তিভাব প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ের কথার মধ্যে প্রায় ঐক্য থাকিলেও কণ্ঠস্বরের পার্থক্য আছে। কবির ভীমের উক্তি উদ্ধৃত করিলে উভয় গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে। এই অংশে ভীম যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"ওহে মহারাজ। কভু দেখেছ নয়নে।
আপন ভার্য্যাকে হারে বল কোন জনে॥
কপটে জুয়াড়ি করিয়াছে বহু জন।
তা সবার বশীভূত থাকে নারীগণ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম করিলা যেমন॥
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
তাহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর নাহি অন্যথা তাহার॥

এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী ॥
তব কৃত কর্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে ॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোক কহে কথা নাহি কিছু বোধ ॥" পৃঃ ৪০২।৪০৩

অগ্রজের প্রতি তিনি যে ঈষৎ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে কাশীরামদাসের ভীম অনুতপ্ত হইয়াছেন। ধনঞ্জয় যখন ভীমকে এই রূঢ়তা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছেন তখন ভীম অনুতপ্ত চিত্তে বলিযাছেন—

"...ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
শত্রুবাক্য সাহিতে না পারি অনিবার ॥" পৃঃ ৪০৩

হীনজন বাক্য সহ্য করিতে অসমর্থ ভীমের রূঢ়তা ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি মাত্র। তিনি সচেতন হইয়া সর্ব অবস্থাতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন এবং অগ্রজের পরিবর্তে নিজ হস্তই অগ্নি দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভীম বলিয়াছেন—

"হীনজন বাক্য মম নাহি সহে আব।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নি মধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥" পৃঃ ৪০৩

এই উক্তি অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সংস্কৃত মহাভারতের তুলনায় কবি কাশীরামদাসের ভীমের উক্তি অনেক শান্ত ও ভক্তিভাবে ভাবিত এবং আত্মনিগ্রহের মনোভাব সঞ্জাত।

কাহিনীগত না হইলেও এইরূপ প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে দ্রৌপদীর উক্তিতে। সভা মধ্যে নির্যাতিতা পাঞ্চালনন্দিনী পাঞ্চালী কৌরব কুলের অশেষ নির্যাতনের সময় যে তীক্ষ্ণ বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষাত্র রমনীর পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া কাহিনীতে একটি ক্ষাত্র দীপ্তি সঞ্চার করিযাছে। তৎপরিবর্তে কাশীরামদাসের দ্রৌপদীচিত্তের বাঙ্গালী সুলভ কোমলতা তাঁহার বিলাপকে বাঙ্গালী নারীর কাতর ক্রন্দনে পরিণত করিয়াছে। উভয় মহাভারতের দ্রৌপদীর উক্তিসমূহ পারস্পরিক তুলনা করিলে তাহাদের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য বোঝা যাইবে।

সংস্কৃত মহাভারতে দেখা যায় সভা মধ্যে নির্যাতিতা দ্রৌপদী বংশ গৌরব ও স্বামী গৌরব স্মরণ করিয়া কেবল বিলাপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। ন্যায় অনুসারে তিনি কৌরবগণ কর্তৃক অজিতা অথবা জিতা এই প্রশ্ন সভাসদগণের নিকট উপস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দ্রৌপদী বারংবার এই প্রশ্ন করিলেও বিকর্ণ ও বিদুর ব্যতীত কেহ ইহার সদুত্তর প্রদান করেন নাই। কৌরবগণের নির্যাতনে বাধা প্রদান করিতেও কেহ অগ্রসর হন নাই। সমগ্র কৌরব সভা সেদিন ক্লীবের ন্যায় এই নারী নির্যাতন প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তাঁহাদের ক্লৈব্যকে ধিক্কার দিয়া সেদিনের নারী কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছিল—

"পূর্বে স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজারা যাহাকে দেখিয়াছিলেন, অন্য কোন স্থানেই দেখেন নাই ; হায় ! সেই আমি আজ সভায় আসিয়াছি।

পূর্বে রাজভবনে বায়ু এবং সূর্য পর্যন্ত যাহাকে দেখিতে পায় নাই, হায়! সেই আমাকে আজ সভার মধ্যেই কুরুবংশীয়রা যুগপৎ দর্শন করিতেছেন।

পূর্বে রাজভবনে বায়ু আসিয়া যাহাকে স্পর্শ করিলেও পাণ্ডবেরা সহ্য করিতে পারিতেন না, হায়! আজ দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকেই স্পর্শ করিতেছে। তথাপি পাণ্ডবেরা সহ্য করিতেছেন।

আমি কাহারও পুত্রবধূ স্থানীয়া, আবার কাহারও কন্যা স্থানীয়া এবং এইরূপ কষ্ট পাইবার যোগ্যও নহি; তথাপি দুঃশাসন আমাকে কষ্ট দিতেছে; অথচ এই কুরু-বংশীয়েরা তাহা সহ্য করিতেছেন। সুতরাং আমি মনে করি কালের পরিবর্তন হইয়াছে।

ইহা অপেক্ষা অধিক দৈন্যের বিষয় কি হইতে পারে যে আমি সুলক্ষণা সতী স্ত্রী হইয়া আজ সভার মধ্যে বিচরণ করিতেছি। রাজাদের ধর্ম কোথায় গেল। পূর্ববর্তী লোকেরা ধর্ম নিষ্ঠা নারীকে সভায় নিতেন না, ইহা আমাদের শুনা আছে। হায়! আজ সেই সনাতন পূর্বধর্ম কুরুবংশে নষ্ট হইয়া গেল।

সভ্যগণ! আমি পাণ্ডবগণের ভার্য্যা, দ্রুপদরাজার কন্যা এবং কৃষ্ণের সখী হইয়া কি করিয়া রাজসভায় যাইতে পারি?

কৌরবগণ! আমি ধর্মরাজের সবর্ণা ভার্য্যা; সেই আমাকে আপনারা দাসী বা অদাসী যাহা বলিবেন আমি তদনুরূপই কার্য্য করিব।

কৌরবগণ! কুরুবংশের যশোনাশক এই ক্ষুদ্র দুঃশাসন আমাকে বড়ই কষ্ট দিতেছে, আমি এ কষ্ট দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে পারিব না।

রাজগণ! কৌরবগণ। আপনারা আমাকে জিতা বা অজিতা যাহা বলিবেন, আমি তদনুরূপই উত্তর করিব।" (সভা ৬৬।১-১০)

পক্ষান্তরে কাশীরামদাসের দ্রৌপদী এই অংশে বলিয়াছেন—

"পূর্বেতে উত্তম কর্ম আমার না ছিল।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল॥
পূর্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ংবর কালে।
আমারে দেখিয়া ছিল নৃপতি সকলে॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্যজন।
আজি পুনঃ সেই সভা করিল দর্শন॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আদি আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্বলোকে॥
চন্দ্র সূর্য্য নিরখিলে যারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি, সে সবার গোচরে॥
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার।
এক বাক্যে বল সবে করিয়া বিচার॥
দ্রুপদ নন্দিনী আমি পাণ্ডব গৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদা চক্রপাণি॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছে সবে মোরে হইবারে দাসী॥

আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধান।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ॥" পৃঃ ৪০৮

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কৌরবগণের নিগ্রহ উভয় দ্রৌপদীর নিকট সহনাতীত হইলেও কবি কাশীরামদাসের দ্রৌপদী স্বীয় দুর্দশার কথা ব্যক্ত করিয়া বিলাপ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীর কণ্ঠে সহনাতীত বেদনার সহিত তথায় উপস্থিত সকলের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে।

কৌরবগণ কর্তৃক দ্রৌপদীর নির্যাতন প্রসঙ্গে কাশীরামদাসের ভক্তিভাবও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নারীর নির্যাতনের সময় যখন পার্থিব কোন শক্তির নিকট সহায়তা পাওয়া যায় নাই তখন উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় নির্যাতিতা নারী দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে এই জন্য একটি মাত্র শ্লোক ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু কাশীরামদাস একটি দীর্ঘ অধ্যায় কৃষ্ণ স্তুতিতে এবং কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় ব্যয় করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—

"...তাহার পর দুঃশাসন বলপূর্বক দ্রৌপদীর বস্ত্র ধারণ করিয়া সভার মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া লইবার উপক্রম করিল—

তখন দ্রৌপদী লজ্জা নিবারণের জন্য সর্বদুঃখহর্তা নরমূর্তিধারী কৃষ্ণ নামক বিষ্ণুকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম আসিয়া বস্ত্র রূপ ধারণ করিয়া নানাবিধ বস্ত্রসমূহ দ্বারা দ্রৌপদীকে আবৃত করিলেন।

মহারাজ! তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিলে সেইরূপ অন্য অনেক বস্ত্র আবির্ভূত হইতে থাকিল।" (সভা ৬৫।৪০-৪২)

কবি কাশীরামদাস এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"এক বস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি॥
ছাড়, ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তাঁর অঙ্গ বস্ত্র কাড়ে॥
সংকটে পড়িয়া দেবী সজল নয়নে।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে নারায়ণে॥" পৃঃ ৪০৪

কৃষ্ণার নারায়ণকে আহ্বান কাশীরামদাস "দৌপদী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ"-এর সময় বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রৌপদীর দীর্ঘ উক্তির মধ্যে কৃষ্ণ স্তুতি কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কাশীরামদাসের গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই বোঝা যাইবে। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কাতর কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
হেথায় সভার মাঝে ই.থে নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন॥

যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি সংহার করিতে সৃষ্টি
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষদন্তী খরক্রোধে ভুজঙ্গ দন্তীর পদে
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণযুগে দ্রৌপদী স্মরণ মাগে
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥" পৃঃ ৪০৫

বনবাস গমনোদ্যত দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ

এই কাহিনী কবির নব সংযোজন। পৃঃ ৪১৯-৪২১ এর মধ্যে ইহা বিবৃত হইয়াছে। রাজঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের বনগমন একটি অত্যন্ত বেদনা-বহ ঘটনা। বনবাস যাত্রার প্রাক্‌কালে তাঁহাদের পরিধানে ছিল অরণ্যচারীর বল্কল বেশ। এই পরিবর্তন মাতৃহৃদয়ে যে গভীর বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া কবি পৃথক কাহিনী রচনা করিয়া পাঠকচিত্তে করুণ রসের উদ্রেক করিয়াছেন।

বনপর্ব

বনপর্বের নিম্নলিখিত অংশ সমূহে কবির রচনা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে—

(১) ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন এবং কুবের উদ্যান হইতে পদ্ম আহরণ (পৃঃ ৫৪৯-৫৫১)।
(২) কৌরবগণের ঘোষ যাত্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ (পৃঃ ৫৬৫-৫৮০)।
(৩) জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণ (পৃঃ ৫৯৯-৬০৩)।
(৪) দুর্যোধন চক্রান্তে সশিষ্য দুর্বাসার পাণ্ডবগণের নিকট আগমন (পৃঃ ৫৮৪-৫৯৫)।

এই পর্বে কয়েকটি নূতন কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়—

(১) শ্রীবৎস চিন্তার কাহিনী (পৃঃ ৪৪৬-৪৭১)।
(২) হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর কাহিনী ও প্রহ্লাদ চরিত্র (পৃঃ ৬১০-৬১৭)।
(৩) দ্রৌপদীর অহংকার ও অকাল আম্রের বিবরণ (পৃঃ ৬৪৪-৬৫১)।

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও কুবের উদ্যান হইতে পদ্ম আহরণ

এই কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতের বন ১২১-১২৯ অধ্যায়ে এবং কাশীরামদাসের রচনায় পৃঃ ৫৪৯ হইতে ৫৫১-র মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। দুইটি গ্রন্থের কাহিনীর মধ্যে ঈষৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কবি কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন দ্রৌপদীর অনুরোধে স্বর্গীয় পদ্মের অন্বেষণে গমন করিয়া ভীম হনুমানের কদলীবন প্রাপ্ত হন। সেখানে সুবর্ণ কদলীসমূহ দর্শন করিয়া ঔদরিক ভীম প্রথমে যথা সুখে কদলী ভক্ষণ

করিয়া উদর পূর্তি করিলেন এবং ভীমের যাতায়াতে কদলীবন বিধ্বস্ত হইল। কদলীবন ভগ্ন হওয়ার শব্দে সচকিত হইয়া হনুমান আসিয়া দেখেন কোন মানুষ দর্পভরে তাঁহাকে না জানাইয়া তাঁহার কদলীবন ভগ্ন করিয়াছে। তখন সেই দর্পিত মানুষটির দর্পচূর্ণ করিবার জন্য হনুমান জরাগ্রস্ত শরীর ধারণ করিয়া ভীমের পথ রোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীম পথিমধ্যে জরাগ্রস্ত বানরকে দেখিয়া অবহেলাভরে বাম হস্তে তাঁহাকে সরাইতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু দেহের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহাতে সক্ষম হইলেন না। তখন বিস্মিত হইয়া বিনীতভাবে বানরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পরিচয় লাভ করিলেন।

কাশীরামদাসের কাহিনীতে ভীমের ঔদরিকতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভীমের দর্পচূর্ণের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবজনসুলভ বিনয়ের মহিমাও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীতে ভীমের ঔদরিকতার উল্লেখ নাই। ভীমের আচরণে মহাকাব্যের মর্যাদা লাঘব হয় নাই। অধিকন্তু হনুমানের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতেও মহাকাব্যের ভাব গাম্ভীর্য ও গৌরব সমুন্নতি প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে ভীমের কদলীবনে প্রবেশ করিয়া কদলী ভক্ষণের উল্লেখ নাই। ভীম স্বর্গীয় পদ্মের অন্বেষণে এক সুবর্ণ পদ্ম পরিপূর্ণ মনোহর সরোবরে উপনীত হইয়াছেন। সেখানে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে জলক্রীড়া করিয়া সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশাল শঙ্খধ্বনি ও বাহ্বাস্ফোটন শব্দ করিয়া আপনার শক্তির কথা ঘোষণা করিয়াছেন (বন ১২১।৫৯-৬২)। হনুমান সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ভীমসেনকে দর্শন করেন এবং ভ্রাতা বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখন ভ্রাতার মঙ্গলেচ্ছায় হনুমান তাহার বিশাল লাঙ্গুল দিয়া ভীমের স্বর্গগামী পথ রোধ করেন কারণ সেই পথে গমন করিলে ভীমের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া হনুমান যখন তাঁহার বিশাল লাঙ্গুল দ্বারা প্রচণ্ড শব্দ করিতেছিলেন তখন সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া ভীম দেখেন—"কদলীবনের মধ্যে বিশাল একখানা শিলার উপরে হনুমান রহিয়াছেন; তাঁহার আকৃতি বিদ্যুৎপুঞ্জের মত দুর্দশনীয়, বর্ণও বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় পিঙ্গল, শব্দও বিদ্যুৎপাতের ন্যায় বিকট এবং শরীরও বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় চঞ্চল, ও স্থূল খর্ব গ্রীবাটাকে ত্রিকোণীকৃত বাহুর উপরে রাখিয়াছেন, স্কন্ধ দেশ স্থূল থাকায় কটি দেশ কৃশ ছিল, এবং রোমব্যাপ্ত ধ্বজের ন্যায় উত্তোলিত এবং ঈষদ্বক্রপ্রাপ্ত দীর্ঘ লাঙ্গুল দ্বারা শোভা পাইতেছে। ওষ্ঠ যুগল খর্ব, জিহ্বা, ও মুখ তাম্র বর্ণ, অপর অংশও রক্তবর্ণ, ভ্রূযুগল চঞ্চল, সম্মুখের দন্ত ও অপর দন্তসকল এবং সেই দন্তসমূহের তীক্ষ্ণ ও শুক্লবর্ণ অগ্রভাগ দ্বাবা মুখখানা শোভা পাইতেছিল, আর অভ্যন্তরস্থিত শুক্লবর্ণ দন্ত দ্বারা অলংকৃত ছিল, সুতরাং ভীমসেন হনুমানের মুখখানাকে রশ্মিযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিসেন (বন ১২১।৭৫-৮০)।" ভীমসেন আরও দেখিলেন, "মহাতেজা, বৃহৎকায় ও মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান স্বর্ণবর্ণ কদলীবনের মধ্যে অশোকপুষ্প রাশির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উজ্জ্বল দেহে প্রজ্বলিত অগ্নিপুঞ্জের ন্যায় রহিয়াছেন। মধুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ নয়ন দ্বারা দর্শন করিতেছেন এবং স্বর্গের পথ রোধ করিয়া হিমালয়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।" ইহার পরবর্তী অংশে উভয় গ্রন্থের কাহিনীগত ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের হনুমানের বর্ণনাই এই কাহিনীর প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়াছে।

কৌরবগণের ঘোষযাত্রা ও গন্ধর্ব হস্তে নিগ্রহ

পাণ্ডবগণ যখন দীন দরিদ্র অবস্থায় দ্বৈতবনে বনবাসে কাল যাপন করিতেছিলেন সেই সময় দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনির মধ্যে স্থির হয় হৃতসম্পদ পাণ্ডবগণকে নিজেদের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখাইতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবগণ নিজেদের দৈন্য ও দুর্যোধনের ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা করিয়া ঈর্ষানলে জর্জরিত হইবেন। এই উদ্দেশ্যে কৌরবগণ সস্ত্রীক ও সপারিষদ ঘোষ যাত্রা করেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। গন্ধর্বগণের নিকট তাঁহারাই পরাভূত ও নিগৃহীত হইলেন এবং অবশেষে পাণ্ডবগণের কৃপায় তাঁহারা উদ্ধার পাইলেন। কাহিনীর এই অংশ সংস্কৃত মহাভারতে বন ১৯৯-২০৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনী যে রাজা ও রাজপরিবারকে আশ্রয় করিয়া রচিত তাহা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কাশীরামদাসের কাহিনীতে সাধারণ মানুষের পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে কয়টি ক্ষেত্রে কাহিনীগত পার্থক্য পরিস্ফুট তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

(ক) ঘোষ যাত্রার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপে প্ররোচিত করা যাইবে এ বিষয়ে দুর্যোধন প্রভৃতির মধ্যে দীর্ঘ মন্ত্রণা হইয়াছে। ইহাব জন্য সমঙ্গ নামে পূর্ব' নির্দিষ্ট এক গোপ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপনীত হইয়া দ্বৈতবনের নিকট অবস্থিত গোপ পল্লীতে গো-গণের সংখ্যা গণনা, গোবৎস সমূহকে চিহ্নিত করা প্রভৃতি কার্যের জন্য কৌরব-গণকে আমন্ত্রণ করিয়াছে। (বন ২০১।২, ৪, ৫) রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের দুষ্ট প্রকৃতি ও পাণ্ডবগণের পরাক্রমের কথা জানিতেন তাই কৌরবগণের পাণ্ডব সন্নিকটে গমন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। পরে শকুনির তীক্ষ্ণ যুক্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছেন। (বন ২০২।১৮-২২) এইরূপে ঘোষ যাত্রার মন্ত্রণা করিতে এবং ঘোষ যাত্রায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্ররোচিত করিতে সংস্কৃত মহাভারতে কিছু অংশ ব্যয়িত হইয়াছে। রাজা ও রাজপরিবাবের গমনাগমনের পূর্বে বহু বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়। সেই বিচার বিবেচনার পরিচয় সংস্কৃত মহাভারতে আছে। কাশীরামদাস তাঁহার কাহিনীতে কৌরবগণের ঘোষ যাত্রার জন্য এইরূপ দীর্ঘ যুক্তির অবতারণা করেন নাই, তিনি একটি মাত্র সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দ্বৈতবনের নিকট প্রভাস তীর্থ অবস্থিত, তীর্থ স্নানের অজুহাতে কৌরবগণ ঘোষ যাত্রা করিয়াছেন। এইখানে কাশীরামদাসের কাহিনীর সহিত সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীর প্রথম পার্থক্য।

(খ) দ্বৈতবনে গমন করিয়া কৌরবগণ গন্ধর্বগণের উদ্যান বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে গন্ধর্বাধিপতি চিত্রসেনের সঙ্গে কৌরবগণের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাভূত কৌরব-গণকে গন্ধর্বগণ সস্ত্রীক বাঁধিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে অবশিষ্ট কৌরব সৈন্যগণ ও বৃদ্ধ কৌরব মন্ত্রীগণ পাণ্ডবগণের নিকট উপনীত হইয়া কৌরবগণকে উদ্ধার করিবার আবেদন জানায়। (বন ২০৫।৯, ১৩) কাশীরামদাস এই অংশকে কিছু বৈচিত্র্যময় এবং কৌরবগণের আবেদনকে আরও একটু হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। কবি কাশীরামদাস আরও বর্ণনা করিয়াছেন, কৌরব রমণীগণ মন্ত্রীদের মাধ্যমে পাণ্ডবগণের নিকট গন্ধর্ব হস্ত হইতে রক্ষার আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের কাতর

আবেদনে কাশীরামদাসের কাহিনীতে যথেষ্ট কারুণ্যের সঞ্চার হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত মহাভারতে নাই। কাশীরামদাস বিপন্না কৌরব নারীগণের বিলাপ ও প্রার্থনা বর্ণনা করিয়াছেন—

"ঘোর আর্তনাদ করি কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কংকণাঘাত ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপত্তি সাগরে॥
অমি সর্ব ধর্মহীন পাপ কর্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তিলেশ নহি মনে।
সত্য মোরা হীনতপা কেবল করহ কৃপা
দীনবন্ধু নামের কারণে॥" পৃঃ ৫৪৭

"দীনবন্ধু" যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইয়া দুর্যোধনমহিষী বার্তা প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন—

"স্বামী মোর অপরাধী ইহাতে অবজ্ঞা যদি
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
বংশের এতেক নারী বিষ অগ্নি ভর কর করি
কিংবা জলে প্রবেশি মরিবে॥" পৃঃ ৫৫৭

এইরূপে কাশীরামদাস তাঁহার কাহিনীতে কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(গ) শব্দ প্রয়োগগত ও বর্ণনাগত পার্থক্যের জন্য উভয় কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বৈতবনে কৌরব সৈন্যের উপস্থিতি দর্শনে পাণ্ডবগণের যে প্রতিক্রিয়া কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবলই হাস্যকর নহে সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীগত গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কৌরবসৈন্য ও দুর্যোধন প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণ ভাবিলেন যে তাহারা পাণ্ডবগণের কোনও অনিষ্ট করিতে আসিতেছে। সেইজন্য তাঁহারা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছেন। কাশীরামদাস সেই যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা দিয়াছেন—

"সুসজ্জ করিল সবে যে যার বাহন।
তূণ হৈতে লন তুলি দিব্য-অস্ত্রবাণ॥
আড়া ভাঙ্গি তূণ মধ্যে রাখে পুনর্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টংকার॥
কবচে আবৃত-তনু, নানা অস্ত্র পেঁচি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ কৈল সব্যসাচী॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবন-নন্দন।
তখন কহেন ধর্ম মধুর বচন॥" পৃঃ ৫৬৯

যুদ্ধ প্রস্তুতির এই বর্ণনা, বিশেষভাবে পবননন্দনের পুনঃ পুনঃ গদা লোফা হাস্যকর। মহাকাব্যের কাহিনীর গাম্ভীর্য ও ভাবসমুন্নতির উপযুক্ত নহে।

শব্দপ্রয়োগের জন্যও কাহিনীর প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে দেখা যায়।

কৌরবগণ গন্ধর্ব কানন লণ্ডভণ্ড করিতে আরম্ভ করিলে উদ্যানরক্ষী কর্ণের নিকট অভিযোগ করিতে উপনীত হন। তখন কর্ণ তাহাকে বলেন—

"ওরে দুষ্ট, এত কর কার অহংকার।
কি ছার গন্ধর্ব তোর, কিবা গর্ব তার॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মোর কাছে।
এতক্ষণ জীয়ে রহে, হেন কেবা আছে॥
সহজে অত্যল্প বুদ্ধি, দ্বিতীয় নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া তোমার ঈশ্বর॥
বলাবল বুঝি লব সংগ্রামের কালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখ মনে রক্ষী কান্দিয়া চলিল॥" পৃঃ ৫৭১

চিত্ররথের উদ্দেশে সম্মানসূচক সর্বনাম প্রয়োগ না করায়, কর্ণের 'ঢেকা' মারিয়া রথীকে বাহির করিয়া দেওয়ায় এবং সেই ঢেকার আঘাতে রথীর "মহাদুঃখ মনে কাঁদিয়া চলায়"; কাহিনী রাজা মহারাজার পরিবর্তে নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের জগতে নামিয়া আসিয়াছে।

দুর্যোধন চক্রান্তে সশিষ্য দুর্বাশার কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের নিকট আগমন

পাণ্ডবগণ যখন কাম্যক বনে বনবাসের কাল অতিক্রম করিতেছিলেন সেই সময় দুর্যোধনের চক্রান্তে অযুত শিষ্য সমভিব্যাহারে মহাক্রোধী মুনি দুর্বাসা তথায় উপনীত হন। দুর্যোধন জানিতেন বনবাসকালে দ্রৌপদী সূর্যদত্ত স্থালীর সাহায্যে সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন, বনবাসের প্রাক্কালে সূর্যের নিকট তপস্যা করিয়া যুধিষ্ঠির এই স্থালী প্রাপ্ত হন। ইহার নিয়ম ছিল যে যতক্ষণ দ্রৌপদীর আহার সমাপ্ত না হইবে ততক্ষণ এই স্থালী হইতে যথেচ্ছ আহার্য পাওয়া যাইবে এবং যে কোনও সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা যাইবে। কিন্তু দ্রৌপদী আহার গ্রহণ করিলে সেই দিনের মত আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। দুর্যোধনের এই কথা জানা ছিল সেইজন্য তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে দ্রৌপদী যখন আহারান্তে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন সেই সময়ে দুর্বাসা মুনি তথায় উপনীত হন। এই বিশেষ অবস্থায় অসংখ্য শিষ্য সহ দুর্বাসা মুনিকে আশ্রমে দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে তাঁহাদের পরিচর্যা করিবেন তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া যুধিষ্ঠির মুনিগণকে স্নানাহ্নিক করিয়া আসিতে বলিলেন। অথচ স্নানান্তে মুনিগণ ফিরিয়া আসিলে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু মহাক্রোধী মুনি যুধিষ্ঠিরের অসহায়তার কথা না ভাবিয়া ইহাকে তাঁহার অবজ্ঞা মনে করিয়া যে দারুণ অভিশাপ দিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই, সেই ভয়ে যুধিষ্ঠির

অত্যন্ত ভীত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত পতিব্রতা দ্রৌপদীও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং অবশেষে নিরুপায় হইয়া ব্যাকুল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর আহ্বানে কৃষ্ণ বিচলিত হইলেন এবং শয্যালগ্না পার্শ্ববর্তী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কাম্যক বনে দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। সংস্কৃত মহাভারতে বন ২১৮।১৫, ১৬ শ্লোকে এই ঘটনাটি মাত্র বিবৃত হইয়াছে। কবি কাশীরামদাস এই ঘটনাকে কিছুটা সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রুক্মিণীর পার্শ্বে শয়নরত কৃষ্ণ যখন দ্রৌপদীর আকস্মিক আহ্বানে বিচলিত হইয়াছেন তখন রুক্মিণী তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন—

"চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় যাইতে হৈল মন ॥" পৃঃ ৫৮৭

ইহার উত্তরে কবি কাশীরামদাসের কৃষ্ণ যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে ভক্তিভাব ও কৃষ্ণ-মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণ কহেন, শুন প্রাণ প্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা ॥
ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখ দুঃখ দাতা ॥
ভক্তজন যথা মম থাকে দেবী সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে ॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার, হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
সে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপৎ সাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির ॥
দুঃখ পেয়ে মোরে ডাকে কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই কণ্টকের ঘাত ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন ॥" পৃঃ ৫৮৭।৫৮৮

এইরূপ ভাবগত ছাড়া কাহিনীগত পার্থক্যের সন্ধানও এই অংশে পাওয়া যায়। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী প্রদত্ত কণামাত্র শাকান্ন ভোজন করিলে সমগ্র জগৎ পরিতৃপ্ত হইল, সশিষ্য দুর্বাসাও উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহাদের উদর যেন পর্যাপ্ত ভোজনে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। (বন ২১৮।১২-১৩, ২৭) অথচ ইতিপূর্বে তাঁহারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে রন্ধন করিতে আদেশ করিয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং স্নানান্তে তাঁহাদের ভোজন করা উচিত কিন্তু কৃষ্ণ মহিমায় সেই সময় পুনর্বার ভোজন করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং পাছে পাণ্ডবগণের নিকট তাঁহাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়িতে হয় এবং পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন সেইজন্য তাঁহারা পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়ন করেন। (বন ২১৮।২৮-৩৩)

কবি কাশীরামদাস তাঁহার কাহিনীকে পৃথকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন : সেই বর্ণনার মধ্যেও কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের মত কাশীরামদাসও বলিয়াছেন যে কণামাত্র শাকান্ন ভোজন করিলে সমগ্র জগতের সহিত সশিষ্য দুর্বাসাও তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে কাশীরামদাসের কাহিনী পৃথক পথ অনুসরণ করিয়াছে। কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন যে পর্যাপ্ত ভোজনের পর যেরূপ অবস্থা হয় দুর্বাসা মুনি ও তাঁহার শিষ্যদেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। তখন তাঁহারা প্রভাস তীরে উঠিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। স্থির করিলেন পরদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে দ্রৌপদীর রন্ধন সমাপ্ত হইয়াছে মুনিগণকে ডাকিয়া পাঠান হউক। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম মুনিগণকে ভোজনে আহ্বান জানাইলে তাঁহারা মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কারণ তাঁহারাই কিছুক্ষণ পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে রন্ধনের আয়োজন করিতে বলিয়াছিলেন অথচ এখন তাঁহাদের পক্ষে আহার গ্রহণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহারা সর্ববিপদত্রাতা কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই বিপদ হইতে ত্রাণ করিলেন। মুনিগণকে ভোজনে যেন আহ্বান না করিয়া ভীম প্রত্যাগমন করে, কৃষ্ণ এইরূপ নির্দেশ প্রেরণ করিলেন।

ইহার পরেও কাশীরামদাসের গ্রন্থে আরও কিছু নূতন কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তিনি সশিষ্য দুর্বাসার কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে সেই নিশীথে শিষ্য সমভিব্যাহারে দুর্বাসা মুনি নিদ্রিত থাকিয়া পরদিন যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী প্রচুর রন্ধন করিয়া সেই অসংখ্য শিষ্যকে পর্যাপ্ত ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। শিষ্যগণ সহ দুর্বাসা মুনির ভোজনের বর্ণনা দিয়া কবি তাঁহার কাহিনী সমাপ্ত করিয়াছেন।

জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণ

পাণ্ডবগণ যখন কাম্যক বনে তাঁহাদের বনবাসের কাল অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়ে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করার চেষ্টা করেন। জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণের কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতের বন ২১৯-২২৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীতে উভয় মহাভারতের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

সংস্কৃত মহাভারতে দেখা যায় জয়দ্রথ বিবাহোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া কাম্যক বনে দ্রৌপদীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে হরণ করিতে মনস্থ করেন (বন ২১৯।৬)। জয়দ্রথের কার্য নিন্দনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের জয়দ্রথ ভীরু নহেন। তিনি পঞ্চ-পাণ্ডবের পরাক্রম জানিয়াও স্বেচ্ছায় দ্রৌপদীকে হরণ করেন (বন ২২২।১০, ১২-২৫)। কিন্তু কাশীরামদাসের মহাভারতের জয়দ্রথ ভীরু। তিনি দুর্যোধনের প্ররোচনাতেই এই দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য দুর্যোধন মন্ত্রণা করিয়া এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডবগণের অনুপস্থিতিতে জয়দ্রথকে দ্রৌপদী হরণ করিতে বলিয়াছিলেন। জয়দ্রথ দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট

করিবার জন্য একান্ত বাধ্য হইয়া ইহাতে সম্মত হইয়াছেন কিন্তু পঞ্চ-পাণ্ডবের ও দ্রৌপদীর তেজস্বিতার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত শংকিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ সংস্কৃত মহাভারতে বীর যোদ্ধাগণের ক্ষত্রিয় পরিচয় বিলুপ্ত হয় না, তাহাদের মধ্যে ভয়ের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কাশীরামদাসের কাহিনীতে ভীরু জয়দ্রথের কথা বিবৃত হইয়াছে। দুর্যোধনের প্রতি জয়দ্রথের উক্তিতে তাঁহার ভীরুতা প্রকাশিত হইয়াছে—

"তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ যেমন॥
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশ সমান তার নাহি মোরা সব॥
বিশেষ, আপনি মনে কর অবধান।
গন্ধর্ব সমরে একা পার্থ কৈল ত্রাণ॥
জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমেষেতে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ॥
বিশেষ দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা॥" পৃঃ ৫৯৯

এই উক্তি মহাভারতের বীর ক্ষত্রিয়ের উক্তি নহে, ইহা নিতান্তই প্রাণভয়ে ভীত ভীরুর কথা। সংস্কৃত মহাভারতে জয়দ্রথের এইরূপ কথাও নাই, সে দুর্য্যোধনের আদেশেও দ্রৌপদীকে অপহরণ করে নাই।

দ্রৌপদীকে জয়দ্রথের নিকট হইতে উদ্ধার করিবার পর জয়দ্রথকে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণে দুই মহাভারতের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে দ্রৌপদীকে রক্ষা করার পর ভীমার্জুন জয়দ্রথকে শাস্তি দিতে তাহার সহিত যুদ্ধরত হইয়াছেন এবং যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে লইয়া স্বীয় রথে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রত্যাগমন করিবার পূর্বে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ ভীমার্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে জয়দ্রথ দুরাত্মা হইলেও দুঃশলার স্বামী, সুতরাং তাহাকে বধ করা উচিত হইবে না (বন ২২৫।৪৩) কিন্তু জয়দ্রথের হাতে অপমানিতা দ্রৌপদী এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি ক্ষাত্র নারী, প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্তা হইয়া ভীম ও অর্জুন দুই স্বামীকে বলিয়াছেন—"আমার প্রিয় কার্য যদি আপনাদের কর্তব্য হয় তবে সেই নরাধম ও পাপাত্মা, দুর্মতি ও কুলদূষক নিকৃষ্ট সিন্ধুরাজকে বধই করিবেন।" (বন ২২৫-৪৫) কবি কাশীরামদাসের কাহিনীতে দ্রৌপদীর এই ক্রুদ্ধ ও দৃপ্ত পরিচয় নাই। কাশীরামদাস জয়দ্রথকে যে শাস্তি দিয়াছেন তাহাতে কাহিনীর ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুন্ন হইয়াছে এবং দ্রৌপদীও সাধারণ নারীতে পরিণত হইয়াছেন। দ্রৌপদী সেইরকম নারী যাঁহার ক্রোধ বহ্নিতে একসময় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ভস্মীভূত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে অপমান করিয়া সহজে কেহ নিষ্কৃতি

পাইতে পারে না। দ্রৌপদী যাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন তাহার তেমনই কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন। কিন্তু কাশীরামদাসের দ্রৌপদী পতির নির্দেশে জয়দ্রথের মুখে লাথি মারিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কাশীরামদাস বলিয়াছেন—

"যেমত তোমাকে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি ॥
আছিল মনের ক্রোধ দ্রুপদ নন্দিনী।
সংবরিতে নারে ক্রোধ, দহিছে পরানী ॥
তাহাতে ভীমের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অধর্ম নাহিক ইথে বিচারে জানিল ॥
তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিন বার পদাঘাত করে তার মুখে ॥" পৃঃ ৬০৩

ইহার অনুরূপ অংশে সংস্কৃত মহাভারতের বিবরণ পাঠ করিলে উভয় গ্রন্থের পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে—"জয়দ্রথ, ভীম ও অর্জুনকে অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক আসিতে দেখিয়া অতি দুঃখিত প্রাণরক্ষার্থী হইয়া অবিহ্বলভাবে সত্বর পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন বলবান ও ক্রুদ্ধ ভীম সেন রথ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত যাইয়া ধাবনশীল জয়দ্রথের কেশকলাপ ধারণ করিলেন এবং ভীমসেন জয়দ্রথকে উত্তোলন পূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষণ করিলেন, পরে আবার মস্তক ধারণ করিয়া তাড়ন করিলেন। পরে জয়দ্রথ আবার কিঞ্চিৎ সজীব হইয়া আবার উঠিবার ইচ্ছা এবং বিলাপ করিবার উপক্রম করিলেন ; ভীম তখন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন এবং ভীম তাহার জানু-যুগলের উপর নিজের জানুযুগল রাখিলেন এবং কফোণি দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই দারুণ প্রহারে পীড়িত হইয়া জয়দ্রথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন" (বন ২২৬ ঃ ১-৫)। এই সময় অর্জুন ক্রুদ্ধ ভীমকে, জয়দ্রথকে বধ না করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন ভীম একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিবৃত্ত হইলেন কিন্তু তাহাকে পুনর্মুক্ত কবিয়া দিলেন না। তিনি অর্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া পাঁচটা জটা করিয়া দিয়া বলিলেন যে জয়দ্রথ যদি লোক সমাজে পাণ্ডবদের দাস বলিয়া পরিচয় দেন তবেই তাহার জীবন ভিক্ষা দিবেন। জয়দ্রথ এইরূপ বলিবার প্রতিজ্ঞা করিলে ভীম তাহাকে মুক্তি দেন। আঘাতের তীব্রতার সহিত অপমানের জ্বালা মিশ্রিত হইয়া সংস্কৃত মহাভারতে জয়দ্রথের শাস্তির যে প্রচণ্ডতা প্রকাশিত হইয়াছে কাশীরাম-দাসের মহাভারতে তাহা হয় নাই।

শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী

এই কাহিনী কবির নব সংযোজন। রাজা শ্রীবৎস ও রাণী চিন্তা শনির কোপে পড়িয়া অসহনীয় দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন এবং শনি মাহাত্ম্যে সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া সুখ সম্পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অংশে সেই কাহিনী বিবৃত

হইয়াছে (পৃঃ ৪৪৬ হইতে ৪৭১)। এই কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতের নল ও দময়ন্তীর কাহিনীর অনুরূপ। ইহা যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ যে আজিও শনির কোপ জনমানসে যুগপৎ ভীতি ও ভক্তি সঞ্চার করে।

হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুর কাহিনী ও প্রহ্লাদ চরিত্র

৬১০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষী জয় ও বিজয় ব্রহ্ম অভিশাপে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা অত্যন্ত গর্বিত ও অত্যাচারী ছিলেন। বরাহরূপী ভগবান নারায়ণের সহিত যুদ্ধে হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়। হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রহ্লাদ নারায়ণ ভক্ত। পিতা হিরণ্যকশিপু সেইজন্য পুত্র প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করেন কিন্তু হরির কৃপায় পুত্রের কোনও অনিষ্ট হয় না। শেষ পর্যন্ত স্তম্ভ নির্গত নৃসিংহ অবতাররূপী নারায়ণের হাতে তিনি নিহত হন। কবি কাশীরামদাসেব রচনায় এই কাহিনীর বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহা সংস্কৃত মহাভারতে নাই।

দ্রৌপদীর অহংকার ও অকাল আম্রের বিবরণ

কবি কাশীরামদাসের কল্পনা সৃজিত ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন কাহিনী। ইহাতে দ্রৌপদীর দর্প চূর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীদের সহিত অনুগমন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিবার জন্য মুনি ঋষি সকলেই দ্রৌপদীর সতীত্বের প্রশংসা করিতেন ইহাতে দ্রৌপদীর মনে হইয়াছিল যে তাঁহার ন্যায় এরূপ সতী কেহ নাই। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর এই অহমিকার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে মনস্থ করেন। কৃষ্ণের মায়ায় দ্রৌপদী অকালে কোনও বৃক্ষে একটি মাত্র আম্রের সন্ধান পান। তাঁহার প্রার্থনায় পার্থ দ্রৌপদীকে সেই আম্র আনিয়া দেন। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ পার্থকে বলেন যে তিনি অত্যন্ত সর্বনাশের কার্য করিয়াছেন। কারণ ঐ আম্রটি ছিল সন্দীপন মুনির, উহাই তাঁহার সারাদিনের একমাত্র আহার। সারাদিনের তপস্যা শেষে উনি যদি ওই আম্রটিকে নির্দিষ্ট স্থানে দেখিতে না পান তাহা হইলে সকলকেই ভস্ম করিবেন। পঞ্চপাণ্ডব এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় জানিতে চাহেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদের এইকথা বলেন যে তাঁহারা সকলেই যদি তাঁহাদের মনের গোপনতম কথা অকপটে প্রকাশ করেন তাহা হইলে সেই আম্র পুনর্বার যথাস্থানে বিরাজ করিবে। পঞ্চভ্রাতা যখন সকলেই মনের কথা সত্য সত্যই ব্যক্ত করিলেন তখন আম্র অনেকদূর উঠিয়া শাখা সমীপবর্তী হইল। কিন্তু দ্রৌপদী যখন তাঁহার কথা বলিলেন তখন আম্রের গতি হইল

অধোগামী। সকলের নিকট ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে দ্রৌপদী সত্য কথা প্রকাশ করেন নাই। শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে স্বীকার করিতে হইল যে সেই সময়ে তাঁহার কর্ণের কথা মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে স্বয়ম্বর সভায় যখন তিনি কর্ণকে দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল যে কর্ণ যদি কুন্তীর পুত্র হইতেন তাহা হইলে তাঁহার ষষ্ঠ স্বামী হইতেন। স্বয়ম্বর কালে কর্ণ সম্পর্কে অনুভূতি সেইসময় দ্রৌপদীর মনে উদিত হইয়াছিল। দ্রৌপদীর এই অকপট স্বীকৃতিতে আম্র শাখাসংলগ্ন হইল। এইরূপে দ্রৌপদীর সতী গর্ব চূর্ণ হইল।

এই কাহিনীতে কবির কাহিনী রচনাবৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে। কাহিনীতে সতীত্বের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। সতীকে অনন্যচিত্ত হইয়া পতিপরায়ণ হইতে হইবে। অধিকন্তু বৈষ্ণব জীবন বোধের জন্য কোনরূপ অহংকারও মনে স্থান দেওয়া চলিবে না। কোনওরূপ অহংকার, যত সামান্যই হউক না কেন তাহা অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে। অন্যথায় সংসারের অমোঘ নিয়মে সেই অহংকার অবশ্যই চূর্ণ হইবে এবং ইহা অশেষ দুঃখ কষ্ট ও লজ্জার কারণ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংযোজিত কাহিনীর উৎস সন্ধান ও কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য বিচার

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গিয়াছে কবি স্বীয় রচনাকে মনোহর করিবার জন্য কয়েকটি নূতন কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন। এই সকল সংযোজিত কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মৌলিক সৃষ্টি এবং কয়েকটি জনপ্রিয় পুরাণাদি হইতে আহরিত। মহাভারত ছাড়া অন্যান্য পুরাণ হইতে যে সকল কাহিনী তিনি আহরণ করিয়াছেন সেগুলিকে তিনি মূলানুগ করিয়া বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার স্বীয় কল্পনা সৃজিত মৌলিক কাহিনীতে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া কাহিনীগুলিতে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে সকল কাহিনীর মহাভারত ছাড়াও অন্যান্য পুরাণে উল্লেখ আছে তাহাদের কয়েকটির উৎসের সন্ধান দেওয়া হইল এবং কাহিনী রচনায় কবির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

সমুদ্রমন্থন কাহিনী

মহাভারত ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশের নবম অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ স্বর্গ খণ্ড ৪১শ অধ্যায় ও ব্রহ্মখণ্ড ৯ম অধ্যায়ে এবং ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধ ৭ম, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থনের উল্লেখ আছে। এই পুরাণগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের কথা শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য তাঁহার সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গলের ভূমিকায় সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও পদ্মপুরাণ, এই চারি গ্রন্থ নির্দিষ্ট মন্থনোদ্ভূত দ্রব্যাদি ও তাহাদের পর্যায় লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে যে বিষ, অমৃত, ধন্বন্তরী, লক্ষ্মী ও পারিজাত, মহাভারত ও সকল পুরাণেই সাধারণ। সুরভি ও অপ্সরাগণ মহাভারত ব্যতীত সকল পুরাণে, চন্দ্র—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণে; বারুণী—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে; ঐরাবত—মহাভারত, ভাগবত ও পদ্মপুরাণে; উচ্চৈঃশ্রবা—ভাগবত ও পদ্মপুরাণে; কৌস্তুভ—মহাভারত ও ভাগবতে সাধারণ। মহাভারতের পাণ্ডুবর্ণ তুরগ এবং ভাগবত ও পদ্মপুরাণের উচ্চৈঃশ্রবা অভিন্ন কল্পনা করা যাইতে পারে। পদ্মপুরাণে অলক্ষ্মী ও তুলসী নূতন।"* ইহাদের সহিত কবি কাশীরামদাসের রচনার তুলনা করিলে দেখা যায় যে

* শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গল—ভূমিকা—পৃঃ ২৯

বিষ্ণুপুরাণের সহিত কবির রচিত কাহিনীর অংশতঃ মিল রহিয়াছে। কারণ উভয় গ্রন্থেই লক্ষ্মীর ও বিষ্ণুর স্তুতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং উভয়েই মন্থন শেষে লক্ষ্মী উদ্ভূত হইয়াছে। লক্ষ্মী উদ্ভূত হইবার পর মন্থন সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কবি কাশীরামদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য হইল যে অন্যান্য পুরাণে বিষ্ণুর স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়া অমৃত বণ্টন করিবার উল্লেখ থাকিলেও মোহিনীবেশী নারায়ণকে লাভ করার জন্য মহাদেবের প্রাকৃত জনের মত ব্যাকুলতা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র মন্থনকে কেন্দ্র করিয়া হর-পার্বতীর যে সুন্দর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা কবি কাশীরামদাস দিয়াছেন তাহাও কোনও পুরাণে নাই। এই দুই বিষয়ে কবি কাশীরামদাস অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বাংলা মঙ্গলকাব্য বা শিবায়ন কাব্যসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কবির রচনার সহিত অন্যান্য পুরাণ ও মহাভারতের সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে সংস্কৃত মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে একটি গুরুগম্ভীর ভাব আছে। এই ভাবগাম্ভীর্য কোথাও বিনষ্ট হয় নাই। কবির রচনায় হাস্য পরিহাসের সুর থাকায় এবং দেবদেবীর মধ্যে প্রাকৃত-জনের বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হওয়ায় এই আবহাওয়া লঘু ও তরল হইয়াছে।

পারিজাতহরণ কাহিনী ঃ—ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে পারিজাতহরণ কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। ভাগবতপুরাণেব ১০ম স্কন্ধের ৫৯ অধ্যায়েব ৩৮-৪৯ শ্লোকে এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া অদিতির কর্ণ ও কুণ্ডল পুনরুদ্ধাব করেন। ইহা অদিতিকে স্বর্গে প্রত্যর্পণ কালে শচীদেবী ও ইন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণ পূজিত হন। এই সময়ে সত্যভামার অনুরোধে কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করেন এবং ইন্দ্রসহ দেবগণকে পরাজিত করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে ঐ বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করেন। এখানে কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কবি কাশীরামদাসের রচনায় বিবৃত রুক্মিণী ও সত্যভামার পারস্পরিক ঈর্ষা বিদ্বেষের এবং শচী ও সত্যভামার কলহের উল্লেখ নাই।

ভাগবত অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণে এই কাহিনী অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রিংশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি পৃথিবীপুত্র নরকাসুরকে বধ করিয়া কৃষ্ণ, ইন্দ্র-জননী অদিতিব অপহৃত কুণ্ডল উদ্ধার করেন। অদিতিকে সেই কুণ্ডল অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে গরুড়বাহনে কৃষ্ণ ও সত্যভামা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে স্বর্গে গমন করেন এবং ইন্দ্র ও শচী সমভিব্যাহারে অদিতির নিকট কুণ্ডল প্রত্যর্পণ করেন। শচী ও সত্যভামা একত্রে অদিতিকে প্রণাম করেন এবং অদিতির আজ্ঞানুসারে ইন্দ্র সসম্মানে কৃষ্ণের পূজা করেন। কিন্তু মানুষী মনে করিয়া শচী সত্যভামাকে পারিজাত কুসুম না দিয়া নিজে ঐ পুষ্প দ্বারা ভূষিত হন।

পরে সত্যভামা কৃষ্ণের সহিত স্বর্গোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পারিজাত বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন এবং সত্যভামার প্রার্থনায় কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ সত্যভামাকে দিবার জন্য গরুড়ের উপর তুলিয়া রাখিলেন। ইহাতে ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইন্দ্র কৃষ্ণের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু সে বজ্র ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্র পলায়নপর হইলে, সত্যভামা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পারিজাত বৃক্ষ প্রত্যর্পণ করেন। তিনি ইন্দ্রকে বলেন যে পতি-গর্বে গর্বিতা শচী সত্যভামাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। রূপে ও পতি-গর্বে গর্বিতা হওয়া নারীদের পক্ষে স্বাভাবিক। তিনিও স্ত্রীলোক, লঘুচিত্ত

ও পতির গৌরবাকাঙ্খী। সেইজন্য তিনি ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যথায় তাঁহার পারিজাত বৃক্ষের প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রকে পারিজাত বৃক্ষ দান করিয়াছেন। ইন্দ্রও কৃষ্ণ মহিমা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি বিশ্বরূপী ভগবানের কাছে পরাজিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কোনও ক্ষোভ নাই।

এই কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতে নাই। প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরাণ আশ্রয় করিয়া কবি কাশীরামদাস তাঁহার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের সহিত তুলনায় কাশীরাম-দাস রচিত কাহিনীর পার্থক্য প্রদত্ত হইল ঃ—

১। কবি কাশীরামদাসের কাহিনীতে বিবৃত রুক্মিণী ও সত্যভামার পারিজাত কুসুম লইয়া কলহ বিবাদের কোনও উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে নাই।

২। ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ উভয়েই পারিজাতহরণের পটভূমি হিসাবে নরকাসুরের নিকট হইতে কুণ্ডল উদ্ধার করিয়া স্বর্গে অদিতিকে প্রত্যর্পণ করার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কবি কাশীরামদাস এই প্রসঙ্গে রুক্মিণী ও সত্যভামার সপত্নী বিরোধের কাহিনী রচনা করিয়াছেন।

৩। বিষ্ণুপুরাণে শচী ও সত্যভামাব মধ্যে পতিগর্ব লইয়া কলহের উল্লেখ আছে কিন্তু কাশীরামদাসের রচনায় এই কলহের যে সরস বর্ণনা আছে এবং আত্মসম্মান বোধের সূক্ষ্ম ও তীব্র অভিব্যক্তি আছে তাহা বিষ্ণুপুরাণে নাই।

৪। বিষ্ণুপুরাণে প্রধানতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। এই শক্তিমহিমায় দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত কৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছেন। কাশীরামদাসের রচনায় কৃষ্ণের শক্তিমহিমা প্রকাশিত হয় নাই। সরস কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫। পুরাণের ভাবগাম্ভীর্য দেবদেবীদের প্রাকৃত ব্যবহারে কাশীরামদাস রচিত এই কাহিনীতেও ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

সুভদ্রাহরণ কাহিনী ঃ—এই কাহিনী ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধের ৮৬ অধ্যায়ের ১-১১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে পাওয়া যায় অর্জুন তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে এক সময় প্রভাসে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন, মাতুল কন্যা সুভদ্রাকে বলদেব দুর্যোধনের হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন কিন্তু ইহাতে বসুদেব প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয়দের সম্মতি নাই। অর্জুন ঐ কন্যা গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দ্বারকায় উপনীত হন। পরে একদিন সুভদ্রা কোন দেবোৎসব উপলক্ষে রথারোহণে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলে মহারথী অর্জুন, দেবকী, বসুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে হরণ করেন।

এই কাহিনী কবি কাশীরামদাসের রচনায় পল্লবিত হইয়া মনোহর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি রচিত কাহিনীর বৈশিষ্ট্য—১। সুভদ্রার রূপ বর্ণনা,
২। সুভদ্রার পূর্বরাগের বর্ণনা,
৩। সত্যভামা ও অর্জুনের সরস হাস্য পরিহাসের বিবরণ।

ভাগবতপুরাণে এসকল বৈশিষ্ট্য নাই।

দুর্যোধনকন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর :—এই কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতে নাই। ভাগবত-পুরাণের দশম স্কন্ধের ৬৮ অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা কবি কাশীরামদাস বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কবির নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় নাই।

সংস্কৃত মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ অবলম্বনে রচিত এবং তাঁহার কল্পনা সৃজিত এই সকল কাহিনী পর্যালোচনা করিলে কাহিনী রচনায় কবির বৈশিষ্ট্যসমূহের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কবি সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনামূলক অংশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া গল্পাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রায়শঃই দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। কাহিনীর গতি সেইজন্য অপেক্ষাকৃত মন্থর। কবির রচনায় এই সকল তাত্ত্বিক আলোচনাসমূহ পরিত্যক্ত অথবা সংক্ষিপ্ত হওয়ায় কাহিনী অপেক্ষাকৃত লঘুগতি সম্পন্ন হইয়াছে। কবি সর্বাংশে কাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীকে অত্যন্ত সহজ ও সরল-ভাবে সাধারণের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করার জন্য কবি বাঙ্গালীর পরিচিত পারিবারিক জীবন-আশ্রয়ী কাহিনী রচনা করিয়াছেন। পারিবারিক জীবনযাত্রা কখনও দ্বন্দ্বে কলহে, কখনও হাস্যে পরিহাসে মুখর। কাহিনীর মধ্যে নিজেদের জীবনের পরিচয় পরিস্ফুট হইলে তাহা অতীব আকর্ষণীয় হইবে। সেইজন্য সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে পার্বতী-পরমেশ্বর সংবাদ, সুভদ্রাহরণ কাহিনীতে কৃষ্ণ-সত্যভামার কাহিনী, বিশ্বামিত্র-মেনকার কথোপকথন প্রভৃতিতে দাম্পত্য জীবনচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। দাম্পত্য জীবনের দুইটি দিক—এক দিকে মধুর হাস্য পরিহাস এবং অপর দিকে দ্বন্দ্ব কলহ মান অভিমান। সাধারণের নিকট দ্বন্দ্ব কলহের ন্যায় আকর্ষণীয় আর কিছুই নাই। কবি তাঁহার রচনায় এই দ্বন্দ্ব কলহের এমন সুন্দর চিত্র অংকন করিয়াছেন যে মনে হয় তাহা যেন প্রত্যক্ষগম্য। কলহে বর্ষিত বাক্য বাণের তীক্ষ্ণতা, শ্লেষের অমোঘতা, নেহাৎ উদাসীন প্রকৃতির মানুষকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে পার্বতী-পরমেশ্বরের কলহে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীর প্রতি পার্বতীর প্রত্যক্ষ কোনও সম্বোধন নাই। কোন অনুরোধ বা অভিযোগ উপস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু পার্বতী যে শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে মহাদেবের পক্ষেও সেগুলি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। পার্বতী মহাদেবকে উদ্দেশ করিয়া নারদকে বলেন—

"কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলে যথা না দেয় উত্তর॥" পৃঃ ১৬

পার্বতীর এই সকল কথা মহাদেবকে বলা না হইলেও তাঁহার পক্ষে উদাসীন হইয়া থাকা সম্ভব হয় না। আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আচরণের কৈফিয়ৎ দান করিতে হয়। কিন্তু ইহা যে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে তাহা পার্বতীর পরবর্তী বাক্যে প্রকাশিত হয়। এই বাক্যের ধার এতই অধিক যে মহাদেবের পূর্বের ঔদাসীন্য ও লঘু মনোভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কর্মে উদ্যত হন।

এই দ্বন্দ্ব ও কলহ বাঙ্গালীর কেবল দাম্পত্যজীবনে সীমাবদ্ধ নহে। দুই সপত্নীর মধ্যে কলহ কুলীন বাঙ্গালী জীবনের প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বিশেষ ক্রিয়া-

কর্মের উপলক্ষে এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্রৌপদী-হিড়িম্বার কলহে বিবাদমান দুই সতীনের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। এখানেও পরস্পরের উদ্দেশ্যে বর্ষিত বাক্যবাণ তীক্ষ্ণধার। এইসকল সংলাপ রচনায় কবির কৃতিত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। পারিজাতহরণ কাহিনীতে সত্যভামা ও রুক্মিণী এই দুই সতীনের বিরূপ চিত্তের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

কলহ বিবাদ কেবল আত্মীয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। পরস্পর অনাত্মীয় দুই নারীর মধ্যে কলহ ব্যক্ত হইয়াছে শচী ও সত্যভামার বিরোধে। অধিকাংশ বিরোধের মূল কারণ হইল আত্মসম্মানের দ্বন্দ্ব। দ্রৌপদী-হিড়িম্বার কলহেও একই কারণ বিদ্যমান ছিল। এখানেও সেই কারণে শচীর সহিত সত্যভামার বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। পারিজাত বৃক্ষের জন্য ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের সংগ্রাম হইয়াছে সত্য, কবি সেই সংগ্রামের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা আমাদের চিত্তে কোনওরূপ রেখাপাত করে না। সেই সংগ্রাম অপেক্ষা যাহা বহুগুণ অধিক আকর্ষণীয় তাহা হইল শচী ও সত্যভামার কলহ। এই কলহ এতই আকর্ষণীয় যে, "মুখে হাত দিয়া হাসে দেবতা সকল।" শেষ পর্যন্ত মহাদেবের মধ্যস্থতায় কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে মিলন সাধিত হইয়াছে। কৃষ্ণ সত্যভামার জন্য পারিজাত বৃক্ষ লাভ করিয়াছেন , কিন্তু বিবাদের মূল দূরীভূত হয় নাই। সেই মূল নিহিত শচী ও সত্যভামার মানসিক দ্বন্দ্বে। যদিও পারিজাত বৃক্ষ সত্যভামার জন্য কৃষ্ণ আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিন্তু শচীর গর্ব চূর্ণ হয় নাই। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া স্ববলে ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই। মহাদেবের মধ্যস্থতায় ইন্দ্রের ঔদার্যেই ইহা কৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন, তাই শচী তখনও দাতা, সত্যভামা গ্রহীতা। সেই গর্বে শচী সত্যভামার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঈষৎ হাসিয়াছেন। কটাক্ষের এই হাস্য যে গভীর ব্যঞ্জনাবহ এবং কলহলিপ্ত ব্যক্তির সর্বাঙ্গে অপমানের যে তীব্র দাহের সঞ্চার করে, তাহা সত্যভামার আচরণ ও উক্তিতে প্রকাশ পায়। এই সূক্ষ্ম অথচ গভীর ব্যঞ্জনা কাশীরামদাসের বৈশিষ্ট্য। সত্যভামা কৃষ্ণের নিকট এই অপমানের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাহা ঔদাসীন্যে ও ঔদার্যে উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভক্তের সকল অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। যখনই অপরের প্রতি স্বামীর কিছুমাত্র ভালবাসা বা আকর্ষণ প্রকাশ পায় তখনই অভিমানে স্ত্রীর অধর স্ফুরিত হয়। কবির কাহিনীতে সত্যভামার কৃষ্ণের প্রতি অভিমান সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি কাশীরামদাসের কাহিনীতে এই জাতীয় সূক্ষ্ম অথচ ব্যঞ্জনাময় বৈশিষ্ট্যের প্রায়ই সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বন্দ্ব কলহের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অথচ ব্যঞ্জনাময় উক্তিতে, অথবা পাত্র-পাত্রীদের আচরণে তিনি যেমন কাহিনীর মধ্যে নূতন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করিয়াছেন, হাস্য পরিহাসের ক্ষেত্রেও কবির একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ও মেনকার কাহিনীতে মেনকার সংক্ষিপ্ত, অথচ মৃদু পরিহাসময় উক্তি, দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছে এবং কাহিনীর মধ্যে পৃথক প্রাণরস সঞ্চার করিয়াছে। বিশ্বামিত্র সর্বতপস্যা মেনকার পায়ে সমর্পণ করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার পর যখন একদিন মেনকাকে সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য জল দিতে বলিয়াছেন তখন মেনকা বিশ্বামিত্রের আত্মবিস্মৃত গভীর ভালোবাসা ও প্রমত্ত কামনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া পরিহাসের সহিত বলিয়াছেন "তবু

ভাল এতদিনে সন্ধ্যা হইল স্মরণ।" এইরূপ হাস্য পরিহাসের সন্ধান সুভদ্রাহরণ কাহিনীতে অর্জুন ও সত্যভামার কথোপকথনে পাওয়া যায়। অর্জুন ও সত্যভামার মধ্যে হাস্য পরিহাসের সম্পর্ক, তাঁহাদের কথোপকথনও সেইজন্য পরিহাসে উজ্জ্বল।

পারস্পরিক পরিহাস ছাড়াও হাস্যরসের অবতারণা করিয়া কাহিনীকে সাধারণ পাঠকের মনোগ্রাহী করিয়াছেন কবি কাশীরামদাস। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্য সমবেত রাজাদের পারস্পরিক স্পর্ধার যে চিত্র কবি অংকন করিয়াছেন, তাহাতে রাজাদের আচরণ যতই অরাজকীয় হোক সাধারণের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন। রূপসী কন্যা দেখিয়া তাঁহাকে লাভ করার জন্য রাজন্যবর্গের যে বিসদৃশ আচরণ এবং পরস্পরের প্রতি কটূক্তির যে বিবরণ কবি দান করিয়াছেন তাহা আমাদের গভীর হাস্যের উদ্রেক করে। কাহিনীতে অস্বাভাবিক ব্যাপারের অবতারণা করিয়া কবি হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

দেব-দেবীগণের এইরূপ অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত আচরণের বর্ণনা দান করিয়া কবি হাস্যের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় সমুদ্র-মন্থন কাহিনীতে মহাদেবের আচরণে। মোহিনীরূপী নারায়ণকে দেখিয়া মহাদেবের ব্যাকুলতা পাঠক চিত্তে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করে। সাধারণভাবে বৃদ্ধের তরুণীর প্রতি আকর্ষণ হাস্যোদ্রেককারী ঘটনা। কামবিহ্বল বৃদ্ধ যখন সুন্দরীর প্রতি আকর্ষণে দারা-পুত্র পরিবার সমস্ত ত্যাগ করিতে উদ্যত হন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন তখন তাহা যে সাধারণের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ এই বৃদ্ধ যখন মহাদেব তখন তাঁহার মধ্যে লৌকিক ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া চিত্ত পুলকিত হয়। তাঁহাকে একান্ত আপন বলিয়া মনে হয় এবং ভক্তির সহিত ভালোবাসা সংযুক্ত হয়।

কাহিনীর মধ্যে প্রায়শঃই ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। ভক্তিভাবমূলক কয়েকটি নূতন কাহিনী রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে রচিত হইয়াছে। সত্যভামার ব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনীতে অবিমিশ্র ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, রূপবর্ণনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মহিমার কথা সমগ্র কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ কিরূপে আর্ত এবং নিঃসহায় পাণ্ডুপুত্রগণকে সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন তাহা বলা হইয়াছে।

মহাকাব্যের মহিমময় জগতের পরিবর্তে কাহিনীর লৌকিক রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে কবির রচনায়। দেব-দেবী ও রাজা রাজড়াদের লইয়া যে কাহিনী রচিত তাহাদের মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালীর রূপ এবং বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া তাহাকে আমাদের একান্ত আপন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য মহাকাব্যের কাহিনীতে যে ভাব সমুন্নত ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। ভক্তির আতিশয্যে, হাস্যকর অস্বাভাবিক আচরণে, সাধারণ মানবোচিত কার্য ও বাক্যে মহাকাব্যের মহিমা বিসর্জিত হইয়াছে কিন্তু কাহিনী সাধারণের প্রাণের সম্পদে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

চরিত্র

সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী একটি রাজপরিবারের আন্তর্বিরোধকে অবলম্বন করিয়া রচিত। সুতরাং ইহার পাত্রপাত্রী সকলেই রাজপুরুষ অথবা রাজপরিবার সম্পর্কিত মানব মানবী। সেইজন্য ইহাদের আচার আচরণে, চিন্তায়, চেষ্টায়, কার্যে ও বাক্যে রাজোচিত ক্ষাত্র পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবি কাশীরামদাস ইঁহাদের অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীর মূল ঘটনাকে তিনি প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং উভয় গ্রন্থের পাত্রপাত্রীগণের কার্যের মধ্যে ঐক্য দেখা গিয়াছে। কার্যের মধ্যে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে প্রকাশিত হয়। দুইটি গ্রন্থের মধ্যে পাত্রপাত্রীগণের কার্যের ঐক্য থাকার জন্য তাহাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতকগুলি সাধারণ ঐক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কবি কাশীরামদাসের মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্রসমূহকে পরিবর্তিত করিবার কোনও সজ্ঞান প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই সংস্কৃত মহাভারতের মত কবির যুধিষ্ঠিরও ধর্মভীরু শান্তস্বভাব রাজা, ভীম মহাবাহু মহাবলশালী শক্তিধর বীর, অর্জুন মহাধনুর্ধর অদ্বিতীয় যোদ্ধা, দুর্যোধন অহংকারমত্ত দাম্ভিক নরপতি, কর্ণ অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত মহাশক্তিধর পুরুষ, আর দ্রৌপদী অনিন্দ্যসুন্দরী পঞ্চপাণ্ডব মহিষী। কিন্তু চরিত্রের এই সাধারণ ধর্মের মধ্যে, তাহাদের প্রাণ প্রকৃতির যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে তাহারা বাহ্যরূপে অভিন্ন হইলেও প্রাণপ্রকৃতিতে পৃথক।

কাব্য রচনার অনিবার্য নিয়মে কবি কাশীরামদাস সৃষ্ট চরিত্রসমূহ সংস্কৃত মহাভারতের মূল চরিত্র হইতে পৃথক প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্রসমূহ তাঁহাদের ক্ষাত্র বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। তাঁহারা আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাহুবল তাঁহাদের অন্যতম পরিচয়। বাহুবলে তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করার শক্তি ধারণ করেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস তাঁহাদের চরিত্রে দৃঢ়তা দান করিয়াছে। তাঁহাদের স্বশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বলদীপ্তি দান করিয়াছে। অপরের আঘাত ও অসম্মান তাঁহারা নতশিরে স্বীকার করেন নাই। আঘাতে ও অবমাননায় ক্ষিপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণ বিষধর ভুজঙ্গের মত উদ্যত ফণা বিস্তার করিয়া আঘাতকারীকে দংশনোন্মুখ হইয়াছেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইয়াছে ততক্ষণ রুদ্ধ রোষে অশান্তচিত্তে অধীর কাল যাপন করিয়াছেন। এই দুর্নিবার প্রতিহিংসা স্পৃহায়, আত্মশক্তির উজ্জ্বল আলোকে, তেজে ও দর্পে মহাভারতের ক্ষাত্র চরিত্রসমূহ অগ্নিসম দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহারা মহাকাব্যের গগনস্পর্শী মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছেন।

সংস্কৃত মহাভারতে ঘটনার সহিত অপূর্ব বর্ণনার সমন্বয় সাধিত হওয়ায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের আলোচনাতে দেখান হইয়াছে যে মূল ঘটনা এক থাকিলেও উভয় কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃজিত হইয়াছে। ইহার জন্য সংস্কৃত মহাভারতের চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্যসমূহ সুপ্রকাশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কবি কাশীরামদাসের কাব্যে তাহারা অনেক সময় উল্লেখমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্রসমূহ যত উজ্জ্বল ও সুন্দর, কবির সৃষ্ট চরিত্রসমূহ সেই তুলনায় অনেক ম্লান ও নিষ্প্রভ।

দ্বিতীয়তঃ কবি কাশীরামদাসের রচিত চরিত্রে ক্ষত্রিয়বীর আর্য চরিত্রের পরিবর্তে সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষাত্র-চরিত্রের দার্ঢ্য ও কঠোরতার পরিবর্তে পাওয়া গিয়াছে বাঙ্গালীর শান্ত কোমল প্রকৃতি। বাহুবলের বিপুল শক্তির পরিবর্তে রহিয়াছে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রিত চিত্তের অসীম ভক্তি, এবং আত্মবিশ্বাসের পরিবর্তে ভগবদ্-নির্ভরতাজনিত আত্মনিবেদন। ক্ষত্রিয়ের সাহস ও বীর্য কবির কাব্যে অনেকাংশে বিলুপ্ত। তৎপরিবর্তে কোনও কোনও অংশে ভীরুতা ও বিদ্যমান। অধিকন্তু চরিত্রগুলি আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সাধারণ মানুষের বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাধারণ লৌকিক বৈশিষ্ট্য-সমূহ পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় সংস্কৃত মহাভারতের মহিমময় সুউচ্চ লোক হইতে স্খলিত হইয়া আমাদের পরিচিত জগতের সমতলে তাঁহারা নামিয়া আসিয়াছেন। মহাভারতের প্রধান চরিত্রসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিলে উপরিবিবৃত মন্তব্যসমূহের সার্থকতা প্রকাশিত হইবে।

যুধিষ্ঠির

সংস্কৃত মহাভারতের পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের আলোচনা করা যায়। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, যুধিষ্ঠির বয়োপ্রাপ্ত হইলে হস্তিনাবাসীগণ নগরে চত্বরে, তাঁহার গুণাবলী আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি যে রাজা হওয়ার উপযুক্ত সে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। হস্তিনাবাসীগণ এই নির্বাচন অকারণে করেন নাই। স্থির, ধীর, সংযতবাক্, তীক্ষ্ণব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শক্তিধর পুরুষকেই তাঁহারা রাজপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তখনকার দিনে রাজার দ্বিবিধ গুণাবলীর প্রয়োজন ছিল। এই দুই গুণ হইল অসীম বাহুবল ও প্রখরবুদ্ধিবল। রাজাকে রণ-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইত। শক্তি ও বীর্যের প্রচণ্ড মহিমায় স্বসৈন্যদলকে অনুপ্রাণিত করিয়া সুষ্ঠুভাবে চালনা করিতে হইত। আবার সাম, দান ও ভেদ প্রয়োগ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে হইত। সর্বোপরি তাঁহার প্রয়োজন হইত তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের। তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের সহিত নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই শ্রেষ্ঠ পরিচয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সংস্কৃত মহাভারতে প্রকাশিত। সংস্কৃত মহাভারতের কয়েকটি অংশ আলোচনা করিলে রাজা যুধিষ্ঠিরের তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত হইবে এবং তাঁহার সহিত তুলনায় কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠির কতখানি ম্লান ও নিষ্প্রভ তাহা বুঝা যাইবে।

বিরাট রাজসভায় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী যখন অজ্ঞাতবাসে কাল যাপন করিতে-ছিলেন, সেই সময় কীচক কর্তৃক দ্রৌপদী অপমানিত হন। রাজসভায় যখন কংকবেশী যুধিষ্ঠির ও বল্লভবেশী ভীম উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহাদের সমক্ষেই কীচক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করে। ইহা একটি আশ্চর্য চিত্র। দ্রৌপদীর ন্যায় মহিষী একটি দুর্বৃত্তের হস্তে তাঁহার অতুলশক্তি সম্পন্ন বীর স্বামীগণের সমক্ষেই নিগৃহীত অথচ পারিপার্শিক অবস্থা এমনই যে সেই দুর্বৃত্তের যথোচিত শাস্তিদান করা সম্ভব নয়। প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীর এই গঞ্জনা দর্শন করিয়া নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকা একমাত্র প্রাণহীন পাষাণের পক্ষেই সম্ভব। যাঁহার ধমনীতে উষ্ণ ক্ষাত্র রক্ত প্রবাহিত, তাঁহার পক্ষে ইহা সহ্য করা দুরূহ। সেইজন্য এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভীম দন্ত দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কীচককে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন রাজা যুধিষ্ঠির। ভীমের কার্যের মধ্যে যে আসন্ন সর্বনাশ নিহিত আছে তিনি তাহা মুহূর্তে উপলব্ধি করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত মহা-ভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"এই সময়ে লোকে বুঝিয়া ফেলিবে এই ভয়ে রাজা যুধিষ্ঠির আপন চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভীমের চরণাঙ্গুষ্ঠ মর্দন করিয়া ভীমকে নিষেধ করিলেন।" (বি ১৫।১৪) ইহাকে বলা হয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ইহাই নেতার উপযুক্ত কার্য। বিচলিত হইবার, ধৈর্যচ্যুত হইবার, আত্মবিস্মৃতি ঘটিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও যিনি নিজেকে সংযত করিয়া সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহাকেই নেতৃত্বে বরণ করা হয়। এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে তৎকালীন চিত্রটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। রাজা যুধিষ্ঠির যে কীচকের এই স্পর্ধায় ও মহিষীর অপমানে উত্তেজিত হন নাই, এরূপ নহে। ভীম ও যুধিষ্ঠির উভয়েই উত্তেজিত, কিন্তু একজন যখন স্থান কাল পাত্র সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আত্মপ্রকাশে উদ্যত, উত্তেজনার সেই চরম মুহূর্তে অন্যের অলক্ষিতে রাজা তাঁহার যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে যুধিষ্ঠিরের যে তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কবি কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখ হয়ে ভীম সভায় বসিল॥" পৃঃ ৬৮৮

কাশী কবির এই বিবৃতিতে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু দুই যুধিষ্ঠিরের কার্যের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। অঙ্গুলি নাড়িয়া নয়নের ইঙ্গিতে ভীমকে নিবারণ করার মধ্যে যে নিষ্প্রাণতার পরিচয় আছে সেই নিষ্প্রাণতায় নিষ্প্রভ কবি কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠির। পক্ষান্তরে সংস্কৃত মহাভারতের যুধিষ্ঠির প্রাণশক্তিতে ও তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অঙ্গুলি মর্দন করার মধ্যে তৎকালীন উত্তেজনাকর মুহূর্তটি সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ইহার পরবর্তী অংশে যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কীচক হস্তে অপমানিতা দ্রৌপদী অগ্নিসম প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছেন। তীক্ষ্ণ বাক্যে তিনি তাঁহার অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিয়াছেন। অপমানিতা দ্রৌপদী যখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে তাঁহার স্বামীগণ উপস্থিত থাকিতেও দুরাত্মা কীচক তাঁহাকে এইভাবে অপমান করিল

অথচ কেহ তাহার প্রতিবিধান করিতে উদ্যত হইলেন না। তখন অপমানের বেদনার সহিত মিশ্রিত হইল অভিমানের জ্বালা। তখন ক্ষোভে বেদনায় আত্মহারা হইয়া দ্রৌপদী তীব্র ভাষায় অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সভাসদগণ কীচকের নিন্দা করিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিয়াছেন। সভাসদজনের প্রশংসায় ও দ্রৌপদীর বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কংকবেশধারী যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সুদেষ্ণার গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দান করিয়াছেন—"দেখ বীরপত্নীরা ভর্তাদের অনুসরণ করিতে থাকিয়া কষ্ট পাইয়াই থাকেন এবং ভর্তৃ-শুশ্রূষার দ্বারা কষ্ট পাইতে থাকিয়া পতিলোক জয় করেন। আমি মনে করি তোমার ভর্তারা এখন ক্রোধের সময় বলিয়া মনে করিতেছেন না। সেইজন্য সূর্যতুল্য তেজস্বী সেই গন্ধর্বেরা প্রতিকার করিবার জন্য তোমার নিকট ধাবিত হইয়া আসিতেছেন না। অতএব সৈরিন্ধ্রি! তুমি যাও। গন্ধর্বেরা তোমার প্রিয় কার্য করিবেন এবং যে লোক তোমার অপ্রিয় কার্য করিয়াছেন তাহার দণ্ড দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিবেন।" (বি ১৫।৩৬-৩৯) ইহা রাজার আদেশ। এই আদেশ যিনি দান করিতে পারেন ব্যক্তিত্বের রাজটীকা তাঁহার ললাটে লাঞ্ছিত। দ্রৌপদী যতই ক্রুদ্ধা এবং অপমানিতা হন না, রাজার এই আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। তিনিও ব্যক্তিত্বশালিনী রমণী, তদুপরি ক্রোধে, অভিমানে, তিনি সেই বিশেষ মুহূর্তে উত্তেজনার চরমশিখরে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সেই আন্দোলনকে একটি ভর্ৎসনায় স্তব্ধ করিয়া দিয়া সুস্পষ্ট আদেশ দান করিয়াছেন রাজা যুধিষ্ঠির। কবি কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে রাজার এই আদেশ শোনা যায় না। তাঁহার কণ্ঠ দুর্বল, তিনি কৃতকর্মের কথা উল্লেখ করিয়া বেদনার্ত মহিষীকে ঈষৎ আশ্বস্ত করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন মাত্র—

"তবে ধর্ম কহিছেন কংক নামধারী।
সৈরন্ধ্রী না কর খেদ, যাও অন্তঃপুরী॥
ধর্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে॥
দেখিতেছে গন্ধর্বেরা তব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন॥
কালেতে কীচকে তারা দণ্ডিবে উচিত।
কীচক হইতে কিছু নাহি হও ভীত॥
দুঃখিনীর মত কেন কান্দহ সভায়।
আত্ম পাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায়॥" পৃঃ ৬৯০

এই অংশ আলোচনা করিলে দেখা যায় সংস্কৃত মহাভারতের কথার সহিত কবি কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠিরের আংশিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বামীগণ যথা সময়ে ইহার প্রতিবিধান করিবেন কিন্তু এই উক্তিতে যে প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে সেখানেই সূচিত হইয়াছে ব্যবধান। যে শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী, সে জীবনের দুঃখ দুর্যোগের কারণ অনুসন্ধান করে এবং নিজ শক্তি বলে সেই কারণ দূরীভূত করে ও দুরবস্থার প্রতিকার করে। কিন্তু যে শক্তিহীন অক্ষম, অপারগ, সে সমস্ত দুঃখ দুর্বিপাকের জন্য পূর্বজন্মকৃত কর্মকে দায়ী করে। জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনা সহ্য করে এবং দুঃখ দুর্দশার কারণরূপে চিন্তা

করে পূর্ব জন্মকৃত পাপই সমস্ত অনর্থের মূল। শক্তিমান ক্ষত্রিয় এরূপ চিন্তা করেন না। শক্তিহীন সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ চিন্তা ও চেতনা স্বাভাবিক। কবি কাশীরাম-দাসের সৃষ্ট চরিত্র রাজবেশে সজ্জিত হইলেও সাধারণ বাঙ্গালী। সেই বাঙ্গালী চেতনা প্রকাশিত হইয়াছে যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে—

"আত্ম পাপে দুঃখ পাও, কি দোষ রাজায়।" পৃঃ ৬৯০

সার্থক নেতৃত্ব, তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব, ও অমোঘ আদেশের মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের রাজোচিত গুণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য কার্যেও একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হইল রাজত্ব বৃদ্ধির আকাঙ্খা। যুধিষ্ঠির ছিলেন রাজা, সেইজন্য তাঁহার মধ্যে রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্খা ছিল। এই আকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি দুর্যোধনের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ তৎকালে যেমন বাহুবলে রাজত্ব বৃদ্ধি করা হইত, তেমনই দ্যূতক্রীড়ার সাহায্যেও করা হইত। ইহা ছিল একটি স্বীকৃত ব্যসন। এই ব্যসনাসক্ত যুধিষ্ঠিরের কথা দুই মহাভারতেই বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত তারতম্য প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের যুধিষ্ঠির ব্যসনাক্ত হইলেও রাজ্যলিপ্সু নরপতি, কিন্তু কাশীরামদাসের কাব্যে বর্ণিত যুধিষ্ঠির ব্যসনাক্ত, শক্তিহীন, ধর্মভীরু বাঙ্গালী। তাঁহাদের প্রকৃতি ভিন্ন, লক্ষ্যও ভিন্ন। একের লক্ষ্য ব্যসনানন্দ উপভোগ করা, অপরের উদ্দেশ্য এই আনন্দের মধ্যে প্রতিপক্ষের রাজ্য হরণ করা। যুধিষ্ঠিরের এই মনোগত বাসনা প্রকাশিত হইয়াছে বনপর্বে। বনবাসকালে ভীম যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়াসক্ত হইয়া সর্বস্ব বিনষ্ট করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—"আমি দুর্যোধনের নিকট হইতে তাঁহার রাজ্যের সহিত রাজত্বপদ হরণ করিবার ইচ্ছা করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে ধূর্ত দ্যূতকার শকুনি আসিয়া দুর্যোধনের জন্য আমার প্রতিপক্ষ হইয়াছিল।" (বন ৩০।৩)। যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি তাঁহার রাজ্যলিপ্সা প্রকাশ করে। কাশীরামদাসের কাব্যে যুধিষ্ঠিরের এই জাতীয় কোন বাসনার সন্ধান পাওয়া যায় না। অপরের রাজ্য হরণ করার পরিবর্তে তিনি নিজের প্রাপ্য অংশটুকু মাত্র পাইলেই কৃতার্থ হন, কিন্তু জ্ঞাতিশত্রুগণ তাঁহাকে ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। এই বঞ্চনার বেদনা, অসহায়ের আক্ষেপ এবং দুর্বলের ক্রন্দন কাশীরামদাসের কাব্যের যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীসুলভ কোমলতা ও ভাবপ্রবণতা এই চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়াছে।

কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠির কোমলচিত্ত ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী বলিয়া বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করিতে অক্ষম। বনপর্বে অর্জুন যখন অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছেন তখন তাঁহার বিচ্ছেদে যুধিষ্ঠির সহ চারি-ভ্রাতা ও দ্রৌপদী ক্রন্দনে আকুল হইয়াছেন। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল হৈল স্মরিয়া অর্জ্জুনে ॥
চারি ভাই, কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
শ্রাবণের ধারা যেন বহিল নয়নে ॥" পৃঃ ৪৯২

যুধিষ্ঠিরের এই ক্রন্দন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে বনপর্বের পরবর্তী অংশে। বকরূপী ধর্মের ছলনায় যখন তিনি চারি ভ্রাতা ও পত্নীকে মৃত দর্শন করিয়াছেন তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির যখন চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর শরীর সরোবর সলিলে ভাসমান দেখিলেন তখন তাঁহার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—

"দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী।
অচেতন ছটপট করে নৃপমণি॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির॥
পুনর্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতনা পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর॥
কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ : হা কৃষ্ণ : বলি করেন ক্রন্দন॥
এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়॥
পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ।
এই হেতু জন্মাবধি পাই মনস্তাপ॥
অত্যন্ত বালক কালে পড়ি মহাশোকে।
অজ্ঞানে পিতার হৈল গতি পরলোকে॥" পৃঃ ৬৫৭

ইহার পর যুধিষ্ঠির তাঁহার উপর যত অন্যায় ও অবিচার হইয়াছে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। শোকের আঘাত মানুষ মাত্রের চিত্তকে ব্যথিত করে। কিন্তু প্রকৃতি ভেদে এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। পর্বতকঠিন চিত্তেও আঘাতের বেদনা নিশ্চয়ই বাজে, কিন্তু সেই বেদনাতে দৃঢ়চিত্ত মানব স্ত্রীসুলভ রোদনে আকুল হয় না। আঘাতের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও বাহ্য ধৈর্য ও অবিচলিত মৌন মহিমায় স্থির হইয়া থাকে। সেই প্রকৃতি সংস্কৃত মহাভারতের ক্ষত্রিয় চরিত্রের। কবি কাশীরামদাসের বাঙ্গালী নেহাৎ কোমল-প্রাণ, পিতৃহীন ভাগ্যহত বাঙ্গালী। সেইজন্য তিনি আকুল ক্রন্দনে সমস্ত বনভূমি মুখরিত করিয়াছেন। দীর্ঘ বাক্য বিন্যাসে তাঁহার উপর যত অত্যাচার হইয়াছে তাহার বিবরণ দান করিয়া অপরের অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী তাহার বিপদ আপদে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। তাহার বিশ্বাস ইহজন্মের দুঃখ দুর্দশার জন্য তাহার কৃতকর্মই দায়ী। দেবতার চরণে কোন অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে কষ্ট পাইতেছে। সুতরাং ভগবানের অহেতুকী কৃপায় সে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। বাঙ্গালীর এই মানসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে যুধিষ্ঠির চরিত্রে।

কাশীরামদাসের যুধিষ্ঠির একান্তভাবে বাঙ্গালী বলিয়া ক্ষাত্র তেজ ও শক্তির পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে ভক্তি ও বিনয়। সেইজন্য যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা সবিনয়ে আত্মসমর্পণ তাঁহার পক্ষে অধিকতর সহজ। ক্ষত্রিয় যেখানে অপরের স্পর্ধার

উত্তরে প্রতিস্পর্ধা ঘোষণা করে, সেখানে যুধিষ্ঠির ক্ষমা ভিক্ষা করেন। বনপর্বে পাণ্ডবগণ যখন বদারিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদন পর্বতে যাত্রা করিয়াছেন সেই সময় ভীম কুবেরের কুসুম কানন বিনষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রোষ কষায়িত লোচনে বলিয়াছেন—

"নহি আমি হীন শক্তি, না হই দুর্বল।
মুহূর্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল॥" পৃঃ ৫৫১

প্রকৃত ক্ষত্রিয় অপরের নিকট হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হন এবং প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে সমুচিত ফল পাইবার জন্য আগ্রহী হন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ক্ষীণ-প্রাণ, নির্বিবাদী, ভালো মানুষ সাধারণ বাঙ্গালী, বিবাদ বিসংবাদ পরিহার করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে বিগলিত হইয়া তিনি কুবেরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন—

"এতেক শুনিয়া তবে ধর্মের তনয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
কৃপার সাগর তুমি, দয়ার নিধান।
বিশেষ বালক ভীম, কিবা তার জ্ঞান॥
জনক না লয় যথা বালকের দোষ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ॥
ইত্যাদি বিবিধ মতে করিয়া স্তবন।
অক্ষরাজে তুষিলেন ধর্মের নন্দন॥" পৃঃ ৫৫১

অদৃষ্ট বিড়ম্বিত, কোমলপ্রাণ, শক্তিহীন, বিনয়াবনত বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার ভক্তিতে। তাহার অন্য কোন গুণ না থাকিতে পারে কিন্তু হৃদয়ের ভক্তিতে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। সেইজন্য রাজসূয় যজ্ঞে বৈষ্ণবের দিব্যোন্মাদ দশা প্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরের বর্ণনা করিয়াছেন কবি কাশীরামদাস—

"কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হৈয়া কম্পিত শরীর॥
নয়ন যুগলে পড়ে চারিধারা নীর।
মুহুর্মুহুঃ অচেতন হয় কুরুবীর॥" পৃঃ ৩৭৩

এই অবস্থায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপদে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন—

"তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম॥
তড়িৎ জড়িত পীত কৌষেয় বসন।
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বপু কৌস্তুভ ভূষণ॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্বলোক নাথ॥
সংসারে আছেন যত পুণ্যবান জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ॥

সে সব ভক্তের পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্খায় মাগিবারে না করি ভরসা॥
যদি বর দিবা, এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ॥" পৃঃ ৩৭৩।৩৭৪

এই প্রার্থনা সংস্কৃত মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরের নহে, কৃষ্ণ-ভক্ত সাধারণ বাঙ্গালীর প্রার্থনা।

ভীম

সংস্কৃত মহাভারতে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে উ৫১।৭* সংখ্যক শ্লোকে। ধৃতরাষ্ট্র এই পরিচয় দান করিয়া বলিয়াছেন—ভীমের ক্ষমা নাই। শত্রুতাও চিরকাল থাকে, সে কৌতুকের সময়ও হাসে না, উদ্ধত স্বভাব, বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে, গম্ভীরস্বর, মহাবেগশালী, মহাবাহু ও মহাবল। এই ক্ষমাহীন, মহাবলশালী, মহাবাহু, প্রতিহিংসাপরায়ণ ভীমের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে একটি সজীব মানুষের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাঁহার প্রাণবেগ এত প্রবল যে তাঁহার পক্ষে হৃদয়ের প্রচণ্ড আলোড়নকে প্রশমিত করা সম্ভব নহে। এই জাতের মানুষকে উদ্ধত, হঠকারী এবং কর্কশ মনে হইতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনাবৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় সর্বাধিক প্রকাশিত। সংস্কৃত মহাভারতের ভীমের স্বভাব এইরূপ, কিন্তু কবি কাশীরামদাসের ভীম পৃথক চরিত্রের মানুষ। তিনিও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় প্রকৃত বাঙ্গালী সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের কঠোরতা তাঁহার মধ্যে নাই। প্রাণের প্রচণ্ড বেগও প্রশমিত হইয়াছে এবং ঔদ্ধত্য অনেক সময় শান্ত আত্ম নিবেদনে পর্যবসিত হইয়াছে এবং তিনিও কৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া অসীম ভক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন।

সংস্কৃত মহাভারতের ভীমের কঠোরতা, উগ্রতা এবং প্রাণের প্রচণ্ড আলোড়ন প্রকাশিত হইয়াছে সভাপর্বে। প্রকাশ্য রাজসভায় যখন দুরাত্মা কৌরবেরা পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়া অপমান করিতেছিলেন তখন ক্রোধে জর্জরিত হইয়া একজনই জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির অপরাধীর অনুশোচনায় নত-শিরে সকল সহ্য করিতেছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অগ্রজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন। প্রাণাধিকা প্রিয়তমার লাঞ্ছনা দর্শনে তিনি ধৈর্যচ্যুত হন নাই। নকুল ও সহদেব অগ্রজদের অন্তরালে অবলুপ্ত। তাহাদের প্রতিক্রিয়া জানা যায় নাই। সকলেই যখন নীরব ও নিশ্চেষ্ট তখন একজন ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি মধ্যম পাণ্ডব ভীম। তাঁহার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গিয়াছে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তিনি ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।

---

*উ ৫১।৭ = উদ্যোগপর্বের ৫১ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক।
উ = উদ্যোগপর্ব।

দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য যেমন তিনি দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে ক্ষমা করেন নাই, সেইরূপ তিনি তাঁহার অগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠিরকেও ক্ষমা করেন নাই। যুধিষ্ঠিরের জন্যই দ্রৌপদীকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তাই অগ্রজকে সুস্পষ্ট ভাষায় অভিযুক্ত করিয়া ভীম বলিয়াছেন—"পাণ্ডবগণকে লাভ করায় দ্রৌপদীর এইরূপ কষ্ট পাওয়ার কথা নহে, তথাপি ক্ষুদ্র স্বভাব, নৃশংস প্রকৃতি, ও অশিক্ষিত কৌরবেরা আপনার জন্যই ইহাকে কষ্ট দিতেছে, অতএব রাজা! দ্রৌপদীর জন্যই আপনার উপরে ক্রোধের এই ফল আরোপ করিব। আপনার হস্তযুগল দগ্ধ করিব। সহদেব! অগ্নি আনয়ন কর।" (সভা ৬৫।৫-৬) এই উক্তিতে ভীমের হৃদয়ের প্রচণ্ড আলোড়ন অত্যন্ত সুন্দর ও অনাবৃত-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্নীর নির্যাতন স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও ধর্মভয়ে অথবা অগ্রজের প্রতি ভক্তিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা সজীব মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংস্কৃত মহাভারতের ভীম এইরূপ সজীব প্রাণবন্ত পুরুষ। সেইজন্য অগ্রজের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কৃতকর্মের জন্য যখন পত্নী লাঞ্ছিত হইয়াছে, তখন ভক্তিতে অথবা ন্যায় নীতির অনুশাসনে তিনি ক্রুদ্ধ হৃদয়কে শান্ত করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তাই যে হাতে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় নিরত হইয়া দ্রৌপদীর অশেষ লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলেন সেই হাত তিনি দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ভীমের বিচারে দ্রৌপদীকে নিগৃহীত করিবার জন্য দুর্যোধন দুঃশাসন যেমন অপরাধী সেইরূপ যুধিষ্ঠিরেরও অন্যায় অল্প নহে। সেইজন্য কৌরবদের যেমন তিনি ক্ষমা করেন নাই। সেইরূপ অগ্রজকেও ক্ষমা করেন নাই। ক্ষমা করিবার মত কোমল প্রকৃতি তাঁহার নহে। তিনি কঠোর কর্কশ বাক্যে অগ্রজকে অভিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারও উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু কবি কাশীরামদাসের ভীমের উগ্রতা ও কঠোরতা অনেকাংশে প্রশমিত। তাঁহার বাক্য অনেক কোমল। শ্রদ্ধেয় অগ্রজের প্রতি তিনি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। অত্যন্ত সহজ অভিযোগ যাহা করিয়াছেন তাহা অনেকটা স্বগতোক্তির অনুরূপ যদিও কথাগুলি যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

"রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
তাহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক ॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর নাহি অন্যথা তাহার ॥
এই সে হৃদয়ে তাপ সংবরিতে নারি।
পাশায় হারিলা কৃষ্ণা হেন নারী ॥
তব কৃতকর্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে ॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোক কহে কথা নাহি কিছু বোধ ॥" পৃঃ ৪০৩

কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়া কবি কাশীরামদাসের ভীমের কোমল-প্রাণ অনু-তাপে দগ্ধ হইয়াছে। অর্জুন যখন ভীমকে ঈষৎ সচেতন করিয়া দিয়াছেন তখন ক্ষণিক

আত্মবিস্মৃতির জন্য তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া অগ্রজের হস্তের পরিবর্তে আপন হস্তই অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কবি বর্ণনা দিয়াছেন—

"ভীম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
শত্রুবাক্য সহিতে না পারি অনিবার ॥
হীনজন বাক্য মম নাহি সহে আর।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥" পৃঃ ৪০৩

এখানেই বাঙ্গালীর পরিচয়। জীবনে দুঃখ দুর্দশা যত প্রবল হইয়াছে, সেগুলি দূরীকরণের জন্য সে তত সচেষ্ট নহে। তৎপরিবর্তে আত্মনিগ্রহের মধ্যে সান্ত্বনালাভের ব্যর্থ অনুসন্ধানে সে তৎপর।

অগ্রজের প্রতি এই রূঢ় সত্যভাষণ সংস্কৃত মহাভারতে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কবি কাশীরামদাস এই রূঢ়তা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের রূঢ়তাব্যঞ্জক অনেক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা তাহার আংশিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বনপর্বে এইরূপ একটি দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায়।

বনপর্বে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী বনবাসের অশেষ কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিলেন। অর্জুন অস্ত্রলাভার্থে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ বিরহে সকলের চিত্ত ব্যাকুল। সেই সময় একদিন যখন সকলে কথোপকথনে নিরত ছিলেন সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীম তাঁহার নিরুদ্ধ ক্রোধ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ন্যায় ও ধর্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য ভীম সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাহুতে আছে শক্তি। সেই শক্তি দ্বারা সহজেই তাঁহারা কৌরব পক্ষকে জয় করিয়া রাজত্ব অধিকার করিতে পারিতেন এবং যুধিষ্ঠিরও দ্যূতক্রীড়ায় আবদ্ধ পণ অস্বীকার করিতে পারিতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সুখের এই সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সহজপথে দুঃখের প্রতিকার না করিয়া ন্যায় ও ধর্মের কথা চিন্তা করিয়া দুঃখকে বরণ করিয়াছেন। আপাতঃবোধে মনে হইবে যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির ক্লীবের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। ভীমের কাছে এই ক্লৈব্য অসহনীয়। যুধিষ্ঠিরের এই ক্লৈব্যকে ধিক্কার দিয়া তিনি বলিয়াছেন—"হস্ত বিকল লোকের নিকট হইতে তাহার বিল্বফল যেমন হরণ করে, এবং পঙ্গুর নিকট হইতে তাহার ধেনু যেমন হরণ করে তেমন আমরা বাঁচিয়া থাকিতে আমাদেরই রাজ্য ঐশ্বর্য আপনার দোষেই দুর্যোধন হরণ করিয়াছে……রাজা ! আপনি ধর্ম ধর্ম করিয়া সর্বদা এতে ক্লিষ্ট থাকিয়া নির্বেদবশতঃ একেবারে নপুংসকের জীবন প্রাপ্ত হন নাই কি ?" (বন ২১।৭, ১৩) জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্টের জন্য ভীম তীক্ষ্ণ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"রাজা ! আমরা পুরুষকার বিহীন না হইয়া এবং বলবানদের সহায়তায় অধিক বলশালী হইয়াও আপনার দ্যূতক্রীড়ার দোষেই সকলে মিলিয়া কষ্ট পাইতেছি।" (বন ৪৪।১৩) ভীম শক্তিমান ক্ষত্রিয়। প্রাণ থাকিতে তাহার সম্পদ অপরে হরণ করিবে ইহা তাঁহার পক্ষে সহ্য করা শক্ত। তাঁহার সর্বাধিক ক্ষোভ যে তাঁহারা জীবিত

থাকিতেও তাঁহাদের রাজ্য দুর্যোধন অপহরণ করিয়াছে। রাজ্য হারানোর বেদনা অপেক্ষা এই বেদনা তাঁহাকে অধিকতর পীড়িত করিতেছে। ভীম এই দুর্গতি সহ্য করিতে অনিচ্ছুক। তিনি অবিলম্বে কৌরবদের শিক্ষা দান করিয়া রাজত্ব পুনরধিকার করিতে চাহেন। তিনি সে কথা যুধিষ্ঠিরকে বলেন এবং তিনি আরও বলেন যে যুধিষ্ঠির যদি একান্তই ধর্মপথ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে তাঁহারা চারিভ্রাতা বর্তমানে রাজ্য অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে পারেন। যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসরান্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপ প্রচুর দান ধ্যান করিয়া রাজাসনে আসীন হইতে পারিবেন। (বন ৪৪।১৮-২১) কিন্তু ভীম ভাল করিয়া জানেন যে ধর্মপথগামী রাজা যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকিতে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোনও সময়েই সম্ভব হইবে না। সেইজন্য অসহ্য ক্রোধে তীব্র ভৎর্সনা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেন —"রাজা এটা এইরূপই হইতে পারিত বটে, যদি মূর্খ, দীর্ঘসূত্র ও ধর্মপরায়ণ আপনি আমাদের রাজা না হইতেন।" (বন ৪৪।২১) কবি কাশীরামদাসের ভীমের কণ্ঠে অগ্রজের প্রতি এই তীব্র উক্তি অকল্পনীয়। কাশীরামদাসের রচনায় এই অংশে ভীম যুধিষ্ঠিরকে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কোথাও ভৎর্সনার এই তীক্ষ্ণতা এবং অগ্রজের প্রতি এই ক্ষমাহীন ক্রোধের পরিচয় নাই। সর্বাধিক রূঢ় যে বাক্য ভীম প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মৃদু অভিযোগমাত্র, অনেকটা খেদোক্তির অনুরূপ—

"অধর্ম করিলে রাজা, ধর্ম না বুঝিলে।
ক্ষাত্রধর্ম রাজ্যরক্ষা তাহা তেয়াগিলে ॥" পৃঃ ৪৯২

সংস্কৃত মহাভারতের ভীমের ক্রোধ যেমন প্রচণ্ড, তেমনই তাঁহার প্রতিহিংসাও ভয়াবহ, এই প্রতিহিংসার মধ্যে তাঁহার প্রচণ্ড ক্ষাত্রশক্তি, অমানুষিক ভয়ংকর প্রকৃতি ও মহাকাব্যিক শূর মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ্য সভায় পাপিষ্ঠ দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন তখন ক্রোধোন্মত্ত ভীম দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহার রক্ত পান করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। এই প্রতিজ্ঞা দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরে সম্ভবতঃ একবারমাত্র ক্ষণিকের জন্য ভীম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অন্যথায় সেদিন রাজসভায় তাঁহার হৃদয়ে যে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা একমাত্র কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রেই প্রশমিত হইয়াছিল। কয়েকদিনের সংগ্রামের পর যেদিন ভীম ও দুঃশাসন রণক্ষেত্রে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছেন সেদিন তাঁহাদের দুইজনের বিশেষ করিয়া ভীমের যে ভয়াবহ মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমস্ত চেতনাকে যেন সভয় বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া তোলে। ভীমের এই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে বিরাটপর্বের পরবর্তী অংশে কর্ণপর্বে। এই অংশ কবি কাশীরামদাস অনুবাদ করেন নাই, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের ভীমের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্য এই অংশের সামান্য বিবরণ প্রদত্ত হইল।

রণক্ষেত্রে দুঃশাসনকে দর্শন করিয়া ভীম সভাপর্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করেন—"আমি যুদ্ধে বলপূর্বক এই পাপাত্মা দুর্বুদ্ধি, ও ভরতকুল কলংক দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যদি রক্ত পান না করি এবং রাজগণ! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা যদি সম্পন্ন না করি, তবে যেন আমি পিতৃপুরুষগণের গতিলাভ না করি।" (সভা ৬৫।৪৭-৪৮) ভীম নিজের প্রতিজ্ঞার সহিত স্মরণ করেন যে দ্রৌপদীও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে

দুঃশাসনের বক্ষ রক্তে রঞ্জিত হস্তে ভীম যেদিন তাঁহার বেণী বন্ধন করিয়া দিবেন সেইদিনই তিনি তাঁহার যজ্ঞধূম সুবাসিত কুন্তল বন্ধন করিবেন। সেই শুভদিনের জন্য এই ত্রয়োদশ বৎসর প্রিয়তমা মহিষী আলুলায়িত কুন্তলের দীর্ঘ কেশভার বহন করিয়া আসিতেছেন। প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার সুবর্ণ লগ্ন সমাগত বুঝিয়া ভীম সিংহনাদে দুঃশাসনকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যিনি আক্রান্ত হইয়াছেন তিনিও ভীরু, কাপুরুষ বা দুর্বল নহেন। তিনিও দুর্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। পরস্পরের সম্মুখীন হওয়াতে একজনের নিকট প্রতিহিংসা পূরণ করিবার সুযোগ উপনীত হইয়াছে অপরজনও চিরশত্রুকে নিধন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। সেইজন্য তিনি সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বর্ণ, হীরক ও উত্তম রত্নে ভূষিত, ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুৎপাতের তুল্য দুঃসহ এবং ভীমের অঙ্গ বিদারণ করিতে সমর্থ একটা বাণ দ্বারা প্রতিপক্ষকে আঘাত করেন। এই আঘাত এবং প্রতি আঘাতে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সংস্কৃত মহাভারতে—"সেই বাণে দেহ বিদীর্ণ হইলে ভীমসেন শিথিলগাত্র হইয়া প্রাণশূন্যের ন্যায় নিপাতিত হইলেন এবং বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া উত্তম রথেই শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে আবার চৈতন্য লাভ করিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। তখন রাজপুত্র দুঃশাসন তুমুল যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুষ্কর কার্যই করিলেন। তিনি এক বাণে ভীমের ধনু ছেদন করিলেন এবং ছয় বাণে তাহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন। বলবান ও মহাত্মা দুঃশাসন সেই কার্য করিয়া নয় বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরে আবার সত্বরই বহুতর উত্তম বাণ দ্বারা ভীমসেনের দেহ বিদারণ করিলেন। তারপর বলবান ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া একটা ভীষণ শক্তি দুঃশাসনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় সেই মহাভীষণ শক্তিটা বেগে আসিতে লাগিলে মহাত্মা দুঃশাসন ধনুখানাকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ বেগশালী দশটা বাণ দ্বারা সেই শক্তিটাকে ছেদন করিলেন। তখন তাঁহার সেই অতি দুষ্কর কার্য দেখিয়া সমস্ত যোদ্ধাই প্রজ্জলিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (ক ৬১।৩৬-৪০)* এইরূপ ভয়ংকর যুদ্ধে একসময় দুঃশাসন নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে গুরুতর বিদ্ধ হইয়া ভীম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"পশ্যামি তে শোণিতমাজিমধ্যে।" (ক ৬১।৪৩) কিন্তু ভীমের বাক্য সমাপ্তির পূর্বেই দুঃশাসন মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ একটি গদা ভীমাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। ক্রোধে উগ্রমূর্তি ভীমসেনও অতিভীষণ আর একটি গদা নিক্ষেপ করিলে তাহা দুঃশাসন নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে প্রতিহত করিয়াও অতিবেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দুঃশাসন চল্লিশ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। (ক ৬১।৪৫) এই গদাঘাতে দুঃশাসন কম্পিত কলেবরে ভূতল আশ্রয় করিলেন। তাঁহার রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার বর্ম ও অলংকার, বস্ত্র ও মাল্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। ভীম তখন পুনর্বার স্মরণ করিলেন যে এই নরাধমই দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। ইহারই শোণিত রঞ্জিত হস্তে তিনি দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া তিনি সিংহ গর্জনে কৌরব পক্ষের সমস্ত রথীদের আহ্বান জানাইলেন—"হে সমস্ত যোদ্ধাগণ! আজ আমি

* ক ৬১।৩৬-৪০ = কর্ণ পর্বের ৬১ অধ্যায়ের ৩৬-৪০ সংখ্যক শ্লোক।
ক = কর্ণপর্ব।

পাপাত্মা দুঃশাসনকে বধ করিতেছি। আপনারা পারেন ত' রক্ষা করুন।" কিন্তু ভীমের এই বজ্রকঠোর আহ্বানবাণীতে প্রতিপক্ষের কোন যোদ্ধাকেই অগ্রসর হইতে দেখা গেল না। তাঁহার সেই ভীষণ মূর্তির সম্মুখে অগ্রসর হইবার সাহস ও সাধ্য কাহারও ছিল না। দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি মহারথীদের সমক্ষেই ভীম দৃঢ় পদক্ষেপে দুঃশাসনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিগৃহীত করিলেন এবং তাঁহার শাণিত তরবারী দুঃশাসন বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করিলেন। দুঃশাসন উঠিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। তখন ভীম তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া নির্গত রক্তধারা পান করিয়া চতুর্দিকে দৃকপাত করিলেন। ওষ্ঠলগ্ন রক্ত লেহন করিতে করিতে ভীম বলিতে লাগিলেন—"মাতার স্তন্যদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তমরূপে নির্মিত পুষ্পরসমদ্য, স্বর্গীয় জলের রস, দুগ্ধ ও দধির সহিত মথিত উত্তম পেয় দ্রব্য এবং মদ্য ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু অন্যান্য যে সকল পানীয় দ্রব্য এ জগতে আছে, আজ এই শত্রু রক্তের আস্বাদ সে সমস্ত হইতেই সর্বপ্রকারে অধিক বলিয়া আমার মনে হইতেছে।" (ক ৬১।৫৬-৫৭) রক্তাক্ত গাত্র, ভয়ংকর মূর্তি, দুঃশাসন রক্ত লেহনরত ভীমসেনের সেই ভয়াবহ মূর্তি দর্শন করিয়া সকলে তাঁহাকে মানুষ নহে রাক্ষস বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তখন তাঁহার সমস্ত গাত্র রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ওষ্ঠ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছিল। নয়নযুগল হইয়াছিল অগ্নি ও রুধিরের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং আকৃতি হইয়াছিল যমের ন্যায় ভীষণ। ভীমের এই মূর্তি দর্শন করিয়া অনেক যোদ্ধা ভীত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন এমন কি মহারথী কর্ণ পর্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন।" (ক ৬২।৭)।

সংস্কৃত মহাভারতের ভীম এই শূর মহিমায় বিরাজমান। সমগ্র কাব্যের কোথাও এমন কিছু বলা হয় নাই, যাহা চরিত্রের মূল প্রকৃতির পরিপন্থী। কর্ণপর্বের ভীমের রূপ অঙ্কন করিবার অবকাশ কবি কাশীরামদাসের হয় নাই। এবং মহাভারতে বিরাট-পর্ব পর্যন্তই আমাদের আলোচ্য তথাপি সংস্কৃত মহাভারতের দৃষ্টিভঙ্গীটি পরিস্ফুট করিবার জন্য এবং ইহার সহিত কবি কাশীরামদাসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিরূপণ করিবার জন্য এই অংশের উল্লেখ করা হইল। চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার সময় ভবিষ্যতেও এইরূপ দুই একটি ক্ষেত্রে সংস্কৃত মহাভারতের বিরাটপর্বের পরবর্তী অংশ আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনাসমূহে সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্রসমূহের মূল বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হইবে এবং ইহারই সহিত আলোচনায় কবি কাশীরামদাসের রচিত চরিত্রের পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে। সংস্কৃত মহাভারতে আমরা ভীমের যে পরিচয় পাইলাম, তাহা কবির চেতনাতে যে একেবারেই বিদ্যমান ছিল না তাহা বনপর্বের অংশসমূহ আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে। এখানে দেখা যায় কবি কাশীরামদাস ভীমকে অজ্ঞানচেতা বালক মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কুসুমকানন ধ্বংস করিবার জন্য কুবের ভীমের উপর রুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত ফল দিতে উদ্যত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির তখন যক্ষরাজ কুবেরের নিকট হইতে বালক ভীমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

"কৃপার সাগর তুমি দয়ার নিধান।
বিশেষ বালক ভীম নাহি তার জ্ঞান॥
জনক না লয় যথা বালকের দোষ।
কৃপা করি দূর কর মনের আক্রোশ॥" পৃঃ ৫৫১

বনপর্বেতে কবি কাশীরামদাস ভীমের শক্তিমত্তা ও বলবীর্য প্রকাশক একটি চিত্রও অংকন করিয়াছেন। কৌরবগণ যখন ঘোষযাত্রা করেন তখন তাঁহাদের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া পাণ্ডবপক্ষ তৎপর হইয়াছেন। ভীম তাহাদের উচিত শিক্ষা দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"সুসজ্জ করিল সবে যে যার বাহন।
তূণ হৈতে লন তুলি দিব্য অস্ত্রগণ॥
আড়াভাঙ্গি তূণমধ্যে রাখে পুনর্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টংকার॥
কবচে আবৃত তনু নানা অস্ত্র পোঁচি।
দেবদত্ত শংখনাদ কৈল সব্যসাচী॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবন নন্দন।
তখন কহেন ধর্ম মধুর বচন॥" পৃঃ ৫৬৯

যে ভীম পুনঃ পুনঃ গদা লুফিয়া স্বীয় বীরত্ব প্রকাশ করেন তিনি কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্র অপেক্ষা যাত্রাদলের আসরে অধিকতর শোভমান বলিয়া মনে হয়।

এই ভীমকেই কবি কাশীরামদাস তাঁহার পরিচিত জগতে দর্শন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার ভীম বিশালদেহী ঔদরিক মাত্র। সংস্কৃত মহাভারতের ভীম তাঁহার দেহের অনুপাতে অধিক ভোজন করেন সত্য কিন্তু তিনি ঔদরিক নহেন। যাঁহারা অধিক ভোজন পারঙ্গম কবি তাঁহার পরিচিত জগতে সেই সকল ঔদরিকদের দর্শন করিয়াছেন এবং কাব্যে তাঁহাদের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য নাগরাজ্যে গমন করিয়া লোভী ভীম পরিশ্রম ক্ষুধায় কুণ্ড কুণ্ড সুধা পান করিয়াছেন। স্বয়ম্বর সভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে অত্যধিক ক্ষুধার্ত হইয়া মণ্ড প্রত্যাশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন এবং মণ্ড না পাইয়া প্রথম দিনেই দ্রৌপদীর প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন—

"না পাইয়া মণ্ড বীর কটাক্ষেতে চায়।
মনে মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায়॥
মণ্ড না পাইয়া মনে জন্মে মহা ক্রোধ।
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে না মানে প্রবোধ॥" পৃঃ ২৪১

পরবর্তী অংশ বিরাটপর্বেতেও ভীমের একই পরিচয়। অর্জুনের ধনঞ্জয় নামকরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে নব সংযোজিত কাহিনীতেও বিবৃত হইয়াছে যে কুন্তী একদিন মনোবেদনায় ব্যাকুল হইয়া রন্ধন করেন নাই। এমন সময় অস্ত্রশিক্ষা সমাপনান্তে গৃহ প্রত্যাগত ভীম আহার্য প্রস্তুত নাই দেখিয়া ক্ষুধায় অধীর হইয়া আমান্ন ভক্ষণ করিয়াছেন—

"অস্ত্র শিক্ষা পরিশ্রমে দহে ক্ষুধানল।
সে কারণে আনিলাম আমান্ন সকল॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পিছু।
আজ্ঞা হৈলে আম-অন্ন খাই কিছু কিছু॥" পৃঃ ৭১৯

কবি কাশীরামদাসের ভীম এইরূপ ভোজনপ্রিয় বিশালদেহ ঔদরিক মাত্র।

দুর্যোধন

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের পরিচয় দান করিয়া বন ৪।১।৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—"তিনি স্ত্রী সংসর্গে অত্যন্ত মত্ত, মূঢ়মতি, পাপমতি, এবং অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি।" কিন্তু এই সকল দোষের সহিত সংস্কৃত মহাভারতে দুর্যোধনেব রাজসিক গুণাবলীরও সন্ধান পাওয়া যায়। দুর্যোধন রাজা, রাজার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার কাম্য। তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধির জন্য ন্যায় ও নীতি লংঘন করিতে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বীর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, তেজ, দর্প ছিল তাঁহার মধ্যে। অধিকন্তু ছিল রাজোচিত কূটবুদ্ধি. বাস্তবতাবোধ, ও দূরদর্শিতা। কিন্তু এই সকল গুণাবলী সংস্কৃত মহাভারতের বিরাটপর্বেব পরবর্তী অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্যোধন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্য এবং ইহার সহিত বাংলা মহাভারতের দুর্যোধনের পার্থক্য পরিস্ফুট করিবার জন্য বিরাটপর্বের পরবর্তী অংশ হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল।

উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন কৌরব সভায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দৌত্যে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণের সহিত দুর্যোধনের আচরণ বিশ্লেষণ করিলে দুর্যোধন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কৌরব সভায় কৃষ্ণ আগমন করিলে দুর্যোধন প্রথমে কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া খাদ্য, পেয়, বস্ত্র ও শয্যা দান করিয়াছিলেন। দুর্যোধনের এই সম্মান প্রদর্শন ছিল উদ্দেশ্যমূলক। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল কারণ কৃষ্ণ দুর্যোধন প্রদত্ত এই সকল বস্তু গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি দুর্যোধনকে শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুর অন্ন গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তিনি স্থির করিয়াছিলেন হস্তিনাতে একমাত্র বিদুরেব অন্নই তাঁহার ভক্ষ্য। (উ ৮৪।২৬-২৭, ৩০, ৩৪) কিন্তু এ কথা তিনি প্রথমে স্বীকার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কারণ আত্মীয়তার বিচারে কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডব ও কৌরবদের সমান সম্বন্ধ। কৌরবরা তাঁহার শত্রুস্থানীয় নহে। তিনি প্রথমে আপাতঃ নিরপেক্ষতার ভাণ করিতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনের তীক্ষ্ণ প্রশ্নে এই সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে তিনি কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি নহেন, তিনি পাণ্ডব-পক্ষেরই লোক। কৃষ্ণের এই স্বীকৃতিতে, দুর্যোধনের কূটবুদ্ধির জয় সূচিত হইয়াছে।

এই অংশে কৃষ্ণেব প্রতি আচরণে দুর্যোধনের মানবচরিত্রাভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ হস্তিনায় আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে প্রচুর ধন রত্ন প্রভৃতি দান করিতে মনস্থ করেন (উ ৮০।৬-২১) ইহার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের স্বার্থবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই সকল মূল্যবান বস্তু দান করিয়া তিনি কৃষ্ণকে স্বপক্ষভুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্যোধন কৃষ্ণকে ভাল কবিয়া জানেন। কৃষ্ণ কিছুতেই পাণ্ডবপক্ষ পরিত্যাগ করিবেন না। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণকে মূল্যবানবস্তু সমূহ দান করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না অথচ মর্যাদা হানি হইবে। (উ ৮১।১-২, ৪)

দুর্যোধনের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার শক্তি ও তীক্ষ্ণযুক্তিশীলতা প্রকাশিত হইয়াছে পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দান প্রসঙ্গে। তিনি রাজা। রাজাকে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধি স্থাপন উভয়বিধ কর্মই সম্পাদন করিতে হয়। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া যখন যেরূপ কর্ম যুক্তিসিদ্ধ রাজার উচিত সেইরূপ কর্ম করা। উদ্যোগপর্বে কৌরব-সভাসদগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু দুর্যোধন কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এমন কি যুধিষ্ঠিরের পঞ্চ-গ্রামের প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আপাতঃ বিচারে মনে হইবে ইহা কোন দাম্ভিক ব্যক্তির অতি আস্ফালন, কিন্তু সমগ্র অবস্থাটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচাব করিলে বুঝা যাইবে দুর্যোধনের কথা সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক। সামরিক দিক দিয়া বিষয়টি পর্যালোচনা করিলে তিনি যে অভ্রান্ত তাহা সহজেই মনে হইবে। কৌরবসভায় আলোচনার প্রাক্কালে দুর্যোধন বলিয়াছিলেন যে ইতিপূর্বে কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাভূত পাণ্ডবগণ যখন বনগমন কবিতেছিলেন, সেই সময় পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রাজারা পররাজ্য মর্দনকারী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বিশাল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই যুধিষ্ঠিরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের উচ্ছেদ করিয়া যুধিষ্ঠিবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী ছিলেন। (উ ৪৫।২-৭) সেই সময প্রজাবা দুর্যোধনের প্রতি রুষ্ট ছিল, মিত্ররা ছিল ক্রুদ্ধ এবং আত্মীযরা সকলে ধিক্কার দিতেছিল। সুতরাং সেই অবস্থায় দুর্যোধন নিজেই ছিলেন সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী। ভীষ্মেব নিকট তিনি এই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (উ ৫৫।১৩-১৪) তখন ভীষ্ম দ্রোণ তাঁহাকে নিরস্ত ও আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। (উ ৫৫।১৮-২৩) কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্যোধন প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজাগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছেন। প্রজাগণ পাণ্ডবদের উপব কৌরবকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজকোষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। সৈন্যগণ যথাসময়ে বেতনলাভে পরিতুষ্ট। পক্ষান্তবে পাণ্ডবেরা হতশক্তি ও হীনবীর্য হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরেব পঞ্চ-গ্রাম প্রার্থনার মধ্যে তাঁহাদের দুর্বলতা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌরবদেব তুলনায় পাণ্ডবদের সংগৃহীত শক্তি অনেক স্বল্প। সামরিক নীতি বিষয়ক বৃহস্পতির নির্দেশ এই যে, বিপক্ষের বল তিন ভাগের এক ভাগ ন্যূন হইলে যুদ্ধ কবিবে। সেইজন্য যুদ্ধই বিধেয়। দুর্যোধন যুদ্ধ না করিয়া পঞ্চ-গ্রাম দান করিয়া শান্তি স্থাপন করিলে শত্রুকে জীবিত রাখা হইবে। তাই দুর্যোধন যুদ্ধ না করিয়া শান্তি স্থাপনে স্বীকৃত হন নাই।

যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে দুর্যোধন বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক হইতে এইরূপে বিচার করিয়াছেন। ক্রোধে আত্মহারা হন নাই। ভয়ে ভীত হন নাই, বিনয়ে বিগলিত হইয়া স্বার্থত্যাগ করেন নাই। যখন প্রয়োজন হইয়াছিল তখন প্রণিপাত-পূর্বক সন্ধি স্থাপনে পরাঙ্মুখ হন নাই, আবার যখন মনে হইয়াছে অবস্থা অনুকূলে তখন তিনি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দান করিতে সম্মত হন নাই। পাণ্ডব-ভয়ে-ভীত স্নেহাতুর পিতাকে সান্ত্বনা দান করিয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বাক্যে বলিয়াছেন—"রাজশ্রেষ্ঠ! দেবতারা সহায় হইবেন বলিয়া পাণ্ডবেরা অজেয় হইবে

আপনি এইরূপ মনে করিয়া যে ভীত হইতেছেন, সে ভয় আপনার দূর হউক। কারণ ভরতনন্দন ! কাম, দ্বেষ, লোভ, দ্রোহ ও মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়াই দেবতারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন, ব্যাস, মহাতপা নারদ, এবং জামদগ্নি-নন্দন রাম আমাদের নিকট পূর্বে এই কথা বলিয়াছেন। অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ ; দেবতারা মানুষের ন্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ ও দ্বেষবশতঃ কখনও পুত্র প্রভৃতির হিতকার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।"

কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের তেজোদ্দীপ্ত উক্তিতে তাঁহার ক্ষাত্র বীর পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ যখন দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিয়াছেন তখন দুর্যোধন কৃষ্ণকে উত্তর দান করিয়াছেন—"তবে কৃষ্ণ ! ভয়ংকর কার্য বা বাক্য দ্বারা আমরা ভয়বশতঃ ক্ষত্রিয় ধর্ম বিচ্যুত হইয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রের নিকটও নত হইব না। কারণ শত্রুদমন কৃষ্ণ ! যিনি আমাদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হন, সেরূপ ক্ষত্রিয়কে ত' আমি দেখি না, কারণ দেবতারাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাতে পাণ্ডবগণের কথা আর কি বলিব। মাধব ! আমরা যদি আপন ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুদ্ধে অস্ত্রদ্বারা নিহতও হই তাহা হইলে সেটা আমাদের স্বর্গসুখই হইবে। জনার্দন ! আমাদের ক্ষত্রিয়দের ইহাই প্রধান ধর্ম যে আমরা যুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন করি। অতএব মাধব ! আমরা শত্রুগণের নিকট অবনত না হইয়াই যদি যুদ্ধে বীরশয্যা লাভ করি তবে আমাদের বন্ধুরা সন্তপ্ত হইবেন না।" (উ ১৮।১২-১৭) শান্ত গম্ভীর তেজোব্যঞ্জক এই উক্তি দুর্যোধনকে ক্ষাত্র মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে।

সংস্কৃত মহাভারতের দুর্যোধনের চরিত্রে সকল দোষের সহিত এইরূপ রাজসিক গুণাবলীরও পরিচয় রহিয়াছে। দোষ গুণ সম্বলিত তিনি একজন ক্ষাত্র নরপতি। কিন্তু বাংলা মহাভারতের দুর্যোধনকে কবি কাশীরামদাস পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে অংকন করিয়াছেন। কবির দৃষ্টিতে দুর্যোধন দেবদ্বেষী দুষ্কৃতকারী সাধারণ বাঙ্গালী মাত্র। বাঙ্গালী বলিয়া ক্ষাত্রতেজ ও দর্পের পরিবর্তে বাঙ্গালী জনোচিত কোমলতার সন্ধানও পাওয়া যায় দুর্যোধন চরিত্রে। তৎকালীন বাঙ্গালী চরিত্রের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম যে বিনয় নম্র মাধুর্যের সঞ্চার করিয়াছিল তাহার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। তখনকার কালের প্রেম ভক্তি ভালবাসার স্বর্গীয় চেতনাও প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে যেখানে বিরোধের সুর প্রবল হইয়া দুর্যোধনের সমস্ত সত্তাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে কবি কাশীরামদাসের দুর্যোধনের চেতনার মধ্যে সেই সর্বগ্রাসী বিরোধের মধ্যে জাগিয়াছে মিলনের ও ভালোবাসার সুর। যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি শত্রু হইলেও আত্মীয়। তিনি দুর্যোধনের অগ্রজ। সুতরাং অগ্রজের প্রতি ভক্তি, বিনয় ও ভালোবাসা সকলই দুর্যোধনের মধ্যে বিদ্যমান। বাংলা দেশের মাটিতে, বাঙ্গালীর মনেতে বিবাদ বিসংবাদ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই বিবাদ বিসংবাদ বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে চিরস্থায়ী হইয়া বিরাজ করে না। তাই দেখা যায় ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে অথবা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে বিবদমান গোষ্ঠী পরস্পর সন্নিকটে আসিয়াছে, মিলনসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। বনপর্বে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের ক্ষেত্রে এই সত্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বনপর্বে ঘোষযাত্রায় দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে আপন ঐশ্বর্য সমারোহ প্রদর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র বনবাসী পাণ্ডবগণের চিত্তদাহ সৃষ্টি করা এবং পরোক্ষে তাঁহাদের অপমান করা। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। গন্ধর্বগণ হস্তে দুর্যোধন নিগৃহীত হইলেন। অবশেষে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের এই নিগ্রহ হইতে মুক্ত করেন। কাশীরামদাসের দুর্যোধন অগ্রজের এই উপকার বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি বিনয় নম্র চিত্তে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াছেন—

"গন্ধর্ব বিদায় হয়ে গেল নিজস্থান।
দূর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে করিল প্রণাম ॥
বসিল মলিন মুখে হয়ে নম্র শির।
মধুর বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥" পৃঃ ৫৭৯

সংস্কৃত মহাভাবতের কোথাও যুধিষ্ঠিরকে প্রণামরত দুর্যোধনের চিত্র দেখা যায় না। দুর্যোধন মনোকষ্টে ব্যথিত হইয়াছেন, অনুতাপে জর্জবিত হইয়াছেন, কিন্তু কোনও সময়েই বিগলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করেন নাই। কবি কাশীরামদাস যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দুই ক্ষাত্র নরপতিব সন্ধান পাওয়া যায় না তৎপরিবর্তে বিরোধলিপ্ত দুই জ্ঞাতি ভ্রাতাকে দেখা যায়। তাঁহারা তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনায পারস্পরিক কলহে লিপ্ত ছিলেন। অগ্রজের ঔদার্যে কনিষ্ঠ আপন ভ্রম উপলব্ধি করিতে পাবিয়াছেন এবং অগ্রজের অপরিমিত ভালোবাসার সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন্য দুর্যোধন অনুশোচনায় জর্জরিত চিত্তে বলিযাছেন—

"পূর্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ ঘটিবে ॥
ভীমার্জুন হৈতে মোরে তাঁর স্নেহ অতি।
যতনে পালিত মোরে ধর্ম নরপতি ॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাই করিনু বিশ্বাস ॥" পৃঃ ৫৯৮

বাঙ্গালী জনোচিত ভক্তি ও ভালোবাসায় দুর্যোধন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে "ভীমার্জুন হৈতে" দুর্যোধনের প্রতি তাঁহার অধিক স্নেহ। তাই স্নেহশীল অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের অধীনে যতনে পালিত হইবার আকাঙ্খা প্রকাশিত হইয়াছে দুর্যোধনের উক্তিতে। ইহা সংস্কৃত দুর্যোধন চরিত্রের মূল প্রকৃতির বিবোধী।

দুর্যোধন চরিত্রের মধ্যে বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তিনিও সর্বকর্মে ভগবানে বিশ্বাসী। তাঁহার ভগবদনির্ভরতা প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নের উক্তিতে। জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণে যাত্রা করিয়া প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব করিতেছেন। দুর্যোধন জয়দ্রথের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। অনেক চিন্তার পর প্রকৃত বাঙ্গালীর মত স্বগতোক্তি করিয়াছেন দুর্যোধন—

"……আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নিয়োগ হয় যখন যেমন ॥" পৃঃ ৬০৭

অর্জুন

সংস্কৃত মহাভারতের ভীমের ন্যায় অর্জুনও অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বীর ক্ষত্রিয়। সেইজন্য ক্ষত্রিয়ের তেজ ও দীপ্তি, বীরত্ব ও মহিমা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা অর্জুনের মধ্যে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে কাশীরামদাসের অর্জুন মনে প্রাণে বাঙ্গালী। তাঁহার মধ্যে ক্ষত্রিয়োপম তেজ ও দর্প, দার্ঢ্য ও কঠোরতা, তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র শক্তির পরিবর্তে আমরা অপেক্ষাকৃত কোমলস্বভাব, মৃদুভাবাপন্ন, কৃষ্ণ-ভক্ত বাঙ্গালীকে প্রত্যক্ষ করি। তিনি অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের চোখে ভীমের ন্যায়ই নাবালক মাত্র।

কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের অর্জুনের চারিত্র বৈশিষ্ট্য ভীম চরিত্রের ন্যায় বিরাটপর্বের পরবর্তী অংশেই প্রকাশিত। সেইজন্য উভয় মহাভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা বিরাটপর্বের পরবর্তী অংশও আলোচনা করিতেছি।

সংস্কৃত মহাভারতে ভীমের ন্যায় অর্জুনের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বহ্নিতে অর্জুনের ক্ষাত্রধর্ম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দ্রোণপর্বে অভিমন্যু নিধনের পূর্বে কয়েকটি অধ্যায়ে অর্জুনের বীরত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা এত সুন্দর ও মহিমাময় যে অর্জুনের বীরত্বের একটি চিত্র পাঠক চিত্তে মুদ্রিত হইয়া যায়। একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অর্জুনের যে বীরত্বব্যঞ্জক রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যায়। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধন নিক্ষিপ্ত একটি প্রচণ্ড বেগশালী বিশাল ভল্ল অর্জুনের ললাটের মধ্যদেশে বিদ্ধ হয়। সেইরূপ প্রচণ্ড আঘাত সত্ত্বেও অর্জুন রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন নাই। তিনিও আঘাতে যেন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া প্রতিযোদ্ধাকে পুনরাক্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ের অর্জুনের রূপ বর্ণিত হইযাছে—"স্বর্ণখচিত বিশেষ সন্ধান-পূর্বক নিক্ষিপ্ত ও ললাট প্রবিষ্ট সেই বাণ দ্বারা এক শৃঙ্গযুক্ত একটি সুন্দর পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমে বাণ বিদারিত অর্জুনের ললাটদেশ হইতে অনবরত উষ্ণ রক্ত নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহা স্বর্ণ-পুষ্প শোভিত বিচিত্র মালার ন্যায় তাঁহার গাত্রে অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও বলবান অর্জুন দুর্যোধনের সেই বাণের আঘাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তূণ হইতে বিষ ও অগ্নির তুল্য বাণসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন।" (দ্রো ৬০।৩-৫) সংস্কৃত মহাভারতের অর্জুন এইরূপ বীর মূর্তিতে পাঠকের নিকট আবির্ভূত হন।

এই অর্জুন প্রাণাধিক পুত্রের নিধন-সংবাদ শ্রবণে শোকে অচৈতন্য হইয়াছেন। বজ্রাঘাতে ভূধর যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তখন আঘাতের প্রচণ্ডতায় চিত্ত স্তব্ধ হয়। অর্জুনের চৈতন্য অবলুপ্তির মধ্যে পুত্রশোকাতুর পিতার মর্মভেদী বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই পিতা সাধারণ কোন বাঙ্গালী পিতা নহেন যে অচৈতন্য অবস্থা হইতে চেতনা লাভ করিয়া শোকাশ্রুতে বেদনা বিস্মৃত হইবেন। পুত্রের নিধনের জন্য যে বা যাহারা দায়ী তাহাদের উষ্ণ শোণিতে তিনি পুত্র বিয়োগ বেদনার জ্বালা প্রশমিত করিবেন। সেই জ্বালা যে কি ভয়ানক তাহা অর্জুনের তৎকালীন মূর্তি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"তদনন্তর অর্জুন চৈতন্যলাভ করিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া জ্বররোগেই যেন কাঁপিতে থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ পূর্বক উন্মত্তের ন্যায় বিকৃত দৃষ্টিপাত সহকারে ও সাশ্রুনেত্রে এই সকল কথা বলিলেন—"বীরগণ! আমি আপনাদিগের নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জয়দ্রথ যদি বধের ভয়ে ভীত হইয়া ধার্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া না যায় তবে আমি আগামী কল্যই তাহাকে বধ করিব।" (দ্রো ৬৫। ১৮-২০) কিন্তু তখনকার অর্জুনের চিত্ত শোকের আঘাতে এরূপই বিচলিত ছিল যে কেবল এই একটি মাত্র বাক্যেই তাঁহার অন্তরের সুতীব্র আবেগ শান্ত হয় নাই। বজ্র-গর্জনের ন্যায় অর্জুনের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গিয়াছে। তিনি বারংবার অতি কঠোর একই শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়া পুত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি স্বশক্তিতে শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। তাঁহার ক্রোধ ও দর্প, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস সঞ্জাত। তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা তেজস্বী হৃদয়ের শোকাভিব্যক্তি মাত্র, ইহা কোন দুর্বলের আস্ফালন নহে, অক্ষমের অতিভাষণ অথবা পাগলের প্রলাপ নহে। ইহা পুত্রশোকাতুর পিতৃহৃদয়ের প্রতিজ্ঞা। প্রবল আঘাতে অন্তর মথিত করিয়া যে শপথ বাক্য নির্গত হইয়াছে তাহা শান্তচিত্তের বিচার বিবেচনার অপেক্ষা করে নাই। প্রতিজ্ঞা পালনের দুরূহতার কথা চিন্তা করিবার অবকাশ তখন ছিল না। কিন্তু সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসে অর্জুন স্থির নিশ্চিত যে প্রতিজ্ঞা যত কঠোরই হোক না কেন, তাহাকে পালন করা যতই দুঃসাধ্য হোক, তিনি নিশ্চয়ই তাহা করিতে সক্ষম হইবেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞার দুরূহতা কৃষ্ণের উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে—"অর্জুন তুমি ভ্রাতাদের মত না জানিয়া 'আগামীকল্য জয়দ্রথকে বধ করিব' বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত সাহসের কার্য করিয়াছ। তুমি আমার সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই গুরুতর ভার বহন করিতে উদ্যত হইয়াছ ইহাতে আমরা জগতের লোকের নিকট উপহাস্য হইব না কেন?" (দ্রো ৬৭।২-৩)। কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনের দুরূহতার কথা জানান। তিনি বলেন ছয়জন রথী জয়দ্রথকে রক্ষা করিবে, তাঁহাদের সকলকে জয় না করিলে জয়দ্রথকে পাওয়া যাইবে না। আর এই ছয় জনের একজনের শক্তিও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তাহাতে সম্মিলিত ছয়জনের শক্তির ত' কথাই নাই! কৃষ্ণের উক্তির প্রত্যুত্তরে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসে বীর্যোদৃপ্ত কণ্ঠে অর্জুন ঘোষণা করিয়াছেন যে স্বশক্তিতে তিনি সকল রথীকে পরাভূত করিয়া জয়দ্রথকে বধ করিবেন। সবশেষে ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড দ্যুতিতে দ্যুতিমান হইয়া তিনি কৃষ্ণকে নির্দেশ দিয়াছেন—"কৃষ্ণ! রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র আমার রথ যাহাতে সজ্জিত হয় তুমি তাহা করিবে। কারণ গুরুতর কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।" (দ্রো ৬৭।৫৮) ইহা সখার প্রতি সখার অনুরোধ নহে। ভগবানের প্রতি ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা অথবা নিঃশেষ আত্ম-নিবেদন নহে, ইহা সারথির প্রতি রথীর আদেশ।

এই তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব, অসীম বীরত্ব, অনমনীয় কঠোরতা এবং ক্ষাত্রতেজ, দর্প ও প্রতিহিংসা প্রবণতার পরিবর্তে কবি কাশীরামদাসের মহাভারতে যে অর্জুনকে প্রত্যক্ষ করি তিনি কৃষ্ণভক্ত সাধারণ বাঙ্গালী অথবা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক মাত্র। সংস্কৃত মহা-ভারতের অনুসরণ করিয়া কবি বিরাটপর্বে অথবা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় সংগ্রাম নিরত অর্জুনের বর্ণনা দান করিয়াছেন কিন্তু তাহা সংস্কৃত মহাভারতের মত উজ্জ্বল নহে এবং অত্যন্ত গতানুগতিক। কবি কাশীরামদাসের সৃজিত অর্জুন চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

দুটি একটি চিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। মানব চরিত্র যেমন বৃহৎ কর্মের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় তেমনই তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কার্য অথবা সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যেও প্রকাশিত হয়। অর্জুন মনে প্রাণে কৃষ্ণ-ভক্ত বাঙ্গালী বলিয়া কার্যারম্ভের অথবা যাত্রারম্ভের পূর্বে কৃষ্ণনাম স্মরণ করেন। কবি কাশীরামদাস বর্ণনা করিয়াছেন নিবাত কবচ বধ করিবার জন্য অর্জুন যখন পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিতেছিলেন সেই সময় তিনি শিবদাতা শিবকে নমস্কার করিয়াছেন এবং গোবিন্দ নারায়ণকে স্মরণ করিয়াছেন—

"মাতলির এতেক বচন পার্থ শুনি।
হরিষ হৈল তবে বীর চূড়ামণি ॥
শিবদাতা শিবে বীর কৈল নমস্কার।
'গোবিন্দ' বলিয়া বীর ডাকে তিনবার ॥" পৃঃ ৫৫৫

যখন যুধিষ্ঠির আদেশে গন্ধর্ব হস্তে নিগৃহীত কৌরবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য অর্জুন রণযাত্রা করিয়াছেন তখন যাত্রারম্ভে তিনি শুভ কৃষ্ণনাম স্মরণ করিয়াছেন—

"এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্মতূণ ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করি কৃতাঞ্জলি।
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি ॥" পৃঃ ৫৭৭

এই বর্ণনাতে কোনও বীর ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম যাত্রায় রথারোহণের পরিবর্তে ভক্ত বাঙ্গালীর দূরস্থান গমনের প্রাক্‌কালে গো-শকটারোহণের চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশেষে গন্ধর্ব-গণকে পরাস্ত করিয়া অর্জুন চিত্রসেনকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। যুধিষ্ঠির এই সংবাদ শ্রবণে চিত্রসেনকে বন্ধন মুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার ন্যায় একজন সন্মানার্হ ব্যক্তিকে নিগৃহীত করিবার জন্য পার্থকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে, জীবনের মূল্য-বোধে, বয়োজ্যেষ্ঠ ও সন্মানার্হ ব্যক্তির অসম্মান করা উচিত নহে। কাশীরামদাসের মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—

"যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥
এই চিত্রসেন হয় গন্ধর্বের পতি।
ইহার উচিত নহে এতেক দুর্গতি ॥
চিত্রসেনে কহিলেন তুমি মতিমান।
চালন করহ কেন ক্ষত্র বলবান ॥
বালক অর্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবে ইন্দ্রকে এসব অপমান।
যাহ শীঘ্র নিজালয়ে করহ পয়ান ॥" পৃঃ ৫৭৮

কবি কাশীরামের দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্জুন বালক মাত্র। সুতরাং সে তাহার হঠকারিতায় যে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা যেন ইন্দ্রের গোচরীভূত না হয় চিত্রসেনের নিকট ইহাই যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ।

এই অর্জুন চিত্ত বাঙ্গালী সুলভ প্রেম ভক্তি ভালোবাসায় পূর্ণ। সেইজন্য দুর্যোধনের সহিত চরম শত্রুতা সত্ত্বেও অর্জুন গন্ধর্বপতিকে বলিয়াছেন যে দুর্যোধনও তাঁহার নিকট যুধিষ্ঠির তুল্য অগ্রজ—

"আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান।
আমা সবে ভিন্ন ভাব করেছিস জ্ঞান॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্যোধন।
তাহারে লইয়া যাস করিয়া বন্ধন॥
এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলংক রটিবে॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন॥" পৃঃ ৫৭৭

কর্ণ

দূরদৃষ্টের জন্য পার্থিব সুযোগ সুবিধা হইতে কর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অদম্য পুরুষকার বলে তিনি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বীরত্বই ছিল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই বীরত্ব দৈহিক শক্তি এবং অস্ত্রশিক্ষার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু তৎকালীন ব্যবস্থায় সুতপুত্রের পক্ষে অস্ত্রশিক্ষা লাভ সম্ভব ছিল না। কর্ণ সুতপুত্র বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিলেন। সেইজন্য অস্ত্রশিক্ষা লাভ করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। তথাপি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হইয়াছিলেন। যাঁহারা অস্ত্রশিক্ষায় সহজ ও সর্বপ্রকার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন সেই কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারগণের মধ্যে একমাত্র অর্জুন ছিলেন তাঁহার সমকক্ষ। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার উপযুক্ত স্বীকৃতি তিনি লাভ করেন নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি সম্মানার্হ ব্যক্তিগণ কর্ণকে মিথ্যা আস্ফালনকারী বলিয়াছেন। তাঁহারা কর্ণের চিরশত্রু অর্জুনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু কর্ণের কৃতিত্বের উল্লেখ করেন নাই। সেইজন্য কর্ণকে নিজের কথা নিজেকেই বলিতে হইয়াছে! ফলে তাঁহাকে আত্ম-শ্লাঘাকারী ব্যক্তি বলিয়া মনে হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে কর্ণের এই সকল আত্ম-শ্লাঘার অন্তরালে তাঁহার অভিমান, তেজ ও দর্প এবং আত্মশ্লাঘার উপযোগী বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাস এবং প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কাশীরামদাসের কর্ণের মধ্যে চারিত্রিক অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী প্রকাশিত না হওয়ায় এবং আত্মশ্লাঘার অন্তরালবর্তী সূক্ষ্ম কারণসমূহ বিবৃত না হওয়ায় তাঁহাকে দুষ্কৃতকারী দুর্যোধনের সহায়ক মিথ্যা দাম্ভিক ব্যক্তিমাত্র মনে হয়। সংস্কৃত মহাভারতের দুর্যোধনের

রাজকীয় পরিচয় পরিত্যক্ত হওয়ায় কাশীরামদাসের মহাভারতে তিনি যেমন একজন দেবদ্বেষী দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন কর্ণও তেমনই তাঁহার সহায়কে পরিণত হইয়াছেন।

দুর্যোধন যখনই চিন্তিত হইয়াছেন, পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়াছেন, এবং অর্জুনের তেজ ও শক্তিতে বিহ্বল হইয়াছেন তখন কর্ণ তাঁহাকে স্বশক্তির উল্লেখ করিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন এবং পাণ্ডবদের সহিত বিরোধে উত্তেজিত করিয়াছেন। সেইজন্য কবির রচনায় কর্ণকে মিথ্যা আস্ফালনকারী বলিয়া মনে হয়। ঘোষযাত্রার সময় গন্ধর্বহস্তে নিগৃহীত হইয়া এবং পঞ্চপাণ্ডবের অনুগ্রহে উদ্ধার লাভ করিয়া দুর্যোধন ম্রিয়মাণ হইলে কর্ণ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। দুর্যোধনকে কর্ণ বলিয়াছেন—

"শুন ওহে মহারাজ আমার বচন।
আজি আমি কহি কথা করিব যেমন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক মোর ভাগে॥
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর তিনে সংহারিব পতঙ্গ সমান॥" পৃঃ ৫৮০

বিভিন্ন সময়ে কর্ণ যে কেবল রাজা দুর্যোধনের নিকট এইরূপ আস্ফালন প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, এমন কি ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব যুদ্ধের সময় গন্ধর্ব রক্ষকের নিকটও আস্ফালন করিয়া কর্ণ বলিয়াছেন—

"ওরে দুষ্ট এত কর কার অহংকার।
কি ছার গন্ধর্ব তোর কিবা গর্ব তার॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীয়ে রহে হেন কেবা আছে॥
সহজে অত্যল্প বুদ্ধি দ্বিতীয়ে নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর॥
বলাবল বুঝি লৈব সংগ্রামের কালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে॥
এতবলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহা দুঃখ মনে রথী কাঁদিয়া চলিল॥" পৃঃ ৫৭১

কাশীরামদাসের কর্ণ সাধারণ রক্ষকের নিকটও এইরূপ শক্তির দম্ভ প্রকাশ করিয়াছেন তুচ্ছার্থক সর্বনাম 'তুই' প্রয়োগ করিয়াছেন এবং রক্ষীকে 'ঢেকা' মারিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল আচরণে মহাকাব্যের মহিমা বিলুপ্ত হইয়াছে, তিনি অত্যন্ত সাধারণশ্রেণীর বলশালী দাম্ভিক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

কর্ণের এইরূপ আত্মশ্লাঘা ও অশালীন উক্তি বিরাটপর্বেও পাওয়া যায়। বিরাট-পর্বে, বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করার সময়ে, অর্জুনের গাণ্ডীব টংকারে সচকিত হইয়া দ্রোণাচার্য যখন অর্জুনের গুণকীর্তন করিতেছিলেন তখন কৌরবপক্ষের যুদ্ধ বিধেয়

কি না এ বিষয়ে বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এই বিতণ্ডায় কর্ণ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"জানিয়াছি আমি তোমা সবাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি ॥
অন্ন জল খাইবার পাইলে সময়।
যুদ্ধকালে দেখি প্রাণে উপজিল ভয় ॥
যাহ বা থাকহ তুমি যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি, জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
ভিক্ষাজীবি সনে দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবি যেই জন।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন ॥
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা, কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে ॥" পৃঃ ৭২৯

দাম্ভিকতা প্রসূত কর্ণের অশালীন উক্তি এই অংশে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ সংস্কৃত মহাভারতে কোথাও কর্ণের অশালীন উক্তি নাই। বরং কর্ণপর্বে শল্যের প্রতি কর্ণের দ্রোণাচার্য্য সম্বন্ধে মন্তব্য তাঁহার চরিত্র মহিমা প্রকাশ করে। ইহাতে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ণ বলিয়াছেন—"দ্রোণাচার্য্য সূর্য ও অগ্নির সমান তেজস্বী, পরাক্রমে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের তুল্য এবং নীতিবিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ ছিলেন।" (ক ৩০।২১)

কাশীরামদাসের মহাভারতে কর্ণের দম্ভোক্তি এবং শক্তির আস্ফালন রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বীর ক্ষাত্র পরিচয় নাই। এমন কি অনেক সময় বাক্যের ঐক্য থাকিলেও প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়াছে। বনপর্বে কর্ণ অর্জুনকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন—

"প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক মোর ভাগে ॥" পৃঃ ৫৮০

প্রায় এই জাতীয় কথা সংস্কৃত মহাভারতের কর্ণও বলিয়াছেন। দুর্যোধন বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপন করিলে কর্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছেন যে, পঞ্চপাণ্ডবকে নিধন করিয়া দুর্যোধন যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, তখন তিনি দুর্যোধনকে এইরূপ আলিঙ্গন করিবেন। সেই সময় কর্ণ দুর্যোধনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—"রাজশ্রেষ্ঠ ! আমার কথা শ্রবণ কর—যে পর্যন্ত অর্জুন নিহত না হইবে, সে পর্যন্ত আমি অন্য লোক দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করাইব না এবং মাংস খাইব না। সর্ববিধ মদ্যপান বর্জন করিব, আর যে কোন ব্যক্তিই কোন প্রার্থনা করুন না, আমি নাই একথা বলিব না।" (বন ২১২।১৫-১৬) যেমন কঠোর প্রতিজ্ঞা তেমনই আত্মশাসন। আত্মশাসনের এই কঠোরতা হইতে কর্ণ চরিত্রের দৃঢ়তা এবং তাঁহার বীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ণের সম্পর্কে কৃষ্ণের মন্তব্যেও কর্ণের বীরত্ব ও পৌরুষ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ কর্ণের প্রসঙ্গে অর্জুনকে

বলিয়াছেন—"আমি মনে করি মহারথ কর্ণ তোমার তুল্য কিংবা তোমা অপেক্ষা প্রধান। অতএব তুমি বিশেষ যত্ন অবলম্বন করিয়া মহাযুদ্ধে কর্ণকে বধ করিবে। অর্জুন! কর্ণ তেজে অগ্নির তুল্য, বেগে বায়ুর সমান, ক্রোধে যমের সদৃশ, সিংহের ন্যায় দৃঢ়শরীর মহাবলবান, অষ্টারত্নি পরিমিত দেহ, মহাবাহু, বিশালবক্ষা, অতি দুর্জয়, অভিমানী, শৌর্যশালী, প্রধান বীর, প্রিয়দর্শন, সমস্ত যোদ্ধৃগণযুত মিত্রপক্ষের অভয়দাতা, সর্বদা পাণ্ডবদ্বেষী, এবং দুর্যোধনের হিতসাধনে নিরত। অতএব আমার ধারণা এই যে তুমি ব্যতীত দেবগণেরও অবধ্য কর্ণ। অতএব তুমি আজ সেই কর্ণকে বধ কর।" (ক ৫৩।২৯-৩২)

সংস্কৃত মহাভারতে বিরাটপর্বের পরবর্তী অংশে কর্ণ চরিত্রের অসাধারণ দ্যুতি প্রকাশিত হইয়াছে। কবি কাশীরামদাসের সেই অবকাশও ছিল না এবং তাহা প্রকাশ করা সম্ভবও ছিল না।

কৃষ্ণ

কৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। যিনি মায়ামুক্ত, ভক্তির দ্বারা যিনি চিত্তশুদ্ধি করিয়াছেন এবং শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণের স্বরূপ অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কৃষ্ণের বিভিন্ন নামের যোগার্থ পরিস্ফুট হয়। (উ ৬৬।৪৯-৬০) তবে এই নামের শেষ নাই বলিয়া ইহার যোগার্থেরও শেষ নাই। সেইজন্য বুৎপত্তির দিক দিয়া তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য। (উ ৬৬।৪৮) তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সঞ্জয় কৃষ্ণের পরিচয় দান করিয়া বলিয়াছেন—"আর্য! আমি সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে কৃষ্ণকে প্রকৃতি, সৃষ্টিকর্তা, অকৃত, ক্রীড়াশীল এবং জগতের উৎপত্তি ও লয়স্থান বলিয়া জানি।" (উ ৬৬।২৮) সংস্কৃত মহাভারতে তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়া যায় না। অথবা তাঁহার স্বরূপ উদঘাটনেরও প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কৃষ্ণের ভগবৎ সত্তা সংস্কৃত মহাভারতের অংশ বিশেষে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ভগবৎ সত্তা অপেক্ষা মানবিক পরিচয় মুখ্য হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের কৃষ্ণকে সেই সময়ের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে চিত্রণ করা হইয়াছে, সেইজন্য রাজসূয় যজ্ঞান্তে যজ্ঞসভায় যজ্ঞার্ঘ কৃষ্ণকে অর্পণ করা হইয়াছিল। ভক্তের ভগবান রূপে এই অর্ঘ তাঁহাকে প্রদান করা হয় নাই, অন্যতম রাজপুরুষ বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপেই ইহা তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্পিত হইয়াছিল, দৈহিক শক্তিতে এবং রাজপুরুষোচিত তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধিতে, বীর যোদ্ধা ও দক্ষ শাসনকর্তা রূপে কৃষ্ণ ছিলেন অদ্বিতীয়। পক্ষান্তরে কাশীরামদাসের শ্রীকৃষ্ণ সংস্কৃত মহাভারতের রাজপুরুষের মানবিক পরিচয়ের পরিবর্তে ভগবদপরিচয়েই বিরাজমান। এই ভগবান তত্ত্বজ্ঞানীর ভগবান নহেন। তিনি হইলেন ভক্তের ভগবান। বাঙ্গালী যে ভগবানের ধ্যান করিয়াছে ও যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছে, কাশীরামদাসের মহাকাব্যে তাঁহাকেই পাওয়া যায়। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ দীনতারণ ভগবান ভক্তপ্রেমডোরে বাঁধা ভগবান, বাঙ্গালীর প্রাণের দেবতা। তিনি সমস্ত জগতের নিয়ন্তা,

তিনি সকলের প্রভু এবং সকলের একমাত্র আশ্রয়। তিনি পূর্ব হইতে সকলই স্থির নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল তাঁহার লীলা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই কৃষ্ণলীলা প্রকাশিত হইয়াছে কবি কাশীরামদাসের কাব্যে।

প্রথমে সংস্কৃত মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের মানবিক পরিচয় সর্বাধিক অভিব্যক্ত হইয়াছে সেই সকল অংশসমূহ আলোচনা করা হইল। এই সকল অংশ বিরাটপর্বের পরবর্তী পর্বসমূহে প্রকাশিত হইলেও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটি সহজেই পরিস্ফুট হইবে।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যাহাতে সংঘটিত না হয়, এবং কৌরব ও পাণ্ডবের মধ্যে যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ কৌরব সভায় দৌত্যে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার মানবিক পরিচয় ও তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ভালো ভাবেই জানিতেন যে দুর্যোধনকে প্ররোচিত করিয়া শান্তিস্থাপন করা সম্ভব নহে। তথাপি তিনি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহার কারণ জানাইয়া কৃষ্ণ বিদুরকে বলিয়াছেন—"আমি শান্তির জন্য চেষ্টা করিলে আমার অধার্মিক ও মূর্খ শত্রুরা আমাকে বলিতে পারিবে না যে কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও পরস্পর ক্রুদ্ধ কৌরব ও পাণ্ডবগণকে বারণ করিল না। এই কারণেই আমি উভয়পক্ষের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি এবং সে বিষয়ে চেষ্টা করিয়া মনুষ্য সমাজে অনিন্দনীয় হইব।" (উ ৮৬।১৭-১৮) কৃষ্ণের এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার দৌত্যের মূল কারণের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে কৌরব ও পাণ্ডবদের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী তাঁহার শান্তি স্থাপনে প্রচেষ্টা করা উচিত। শান্তি স্থাপিত হইল কিনা, তাহা বিচার্য নহে, বিচার্য কৃষ্ণ এইরূপ কোন উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিনা। তিনি নিঃসন্দেহ যে এই কার্য তাঁহাকে মনুষ্য সমাজে অনিন্দনীয় করিবে। কৃষ্ণের তৎকালীন সমাজে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা। সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা, পদমর্যাদা, খ্যাতি, সম্মান, ও পাণ্ডবদের সহিত সম্বন্ধের বিচারে ইহা তাঁহার বিশেষ কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি মনুষ্য সমাজে অনিন্দনীয় হইবার আকাঙ্খা পোষণ করেন। এই আকাঙ্খা একান্তভাবেই মানবিক।

কৌরব রাজসভায় উপনীত হইয়া শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার কূটবুদ্ধির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের সহিত তাঁহার সমান সম্বন্ধ থাকায় তিনি বাহ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনের প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু তাঁহার সমস্ত সহানুভূতি ছিল পাণ্ডবদের প্রতি। সেইজন্য তিনি কৌরব সভায় গমন করিয়া প্রথমে যাহাতে সভাসদজনের মনোভাব পাণ্ডবানুকূল হয় এবং পাণ্ডবদের নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠিত হয় এ বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব কৌরবপক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি প্রথমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার বংশ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার উপর আরোপ করিয়া বলিয়াছেন—"এইরূপ সেই প্রশস্তকুল বিদ্যমান থাকিতে, বিশেষতঃ আপনার জন্য কোনও অসঙ্গত কার্য হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। মাননীয় কৌরব শ্রেষ্ঠ ! কৌরবেরা ভিতরে বা বাহিরে কোন অন্যায্য আচরণ করিতে থাকিলে আপনিই তাহাদিগকে বারণ করিবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন ! অশিষ্ট, মর্যাদাশূন্য ও লোভী দুর্যোধন প্রভৃতি আপন

পুত্রেরা ধর্ম ও অধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বকীয় প্রধান বন্ধুবর্গের উপরেই নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহা কি আপনি জানেন। অতএব কুরুনন্দন ! মহাভয়ংকর এই সেই বিপদ কৌরবগণের মধ্যেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাতে আপনি যদি উপেক্ষা করেন, তবে ঐ বিপদ সমগ্র পৃথিবীটাকেই ধ্বংস করিবে। ভরতনন্দন ! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে অবশ্যই আপনি এ বিপদের নিবৃত্তি করিতে পারেন। কারণ এ বিষয়ে শান্তি স্থাপন করা দুষ্কর বলিয়া আমার মনে হয় না।" (উ ৮৮।৭-১২) কৃষ্ণ এইরূপে দুর্যোধনাদির দুষ্কৃতি ধৃতরাষ্ট্রের গোচরীভূত করিয়া তাঁহাকে শান্তি স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। এবং তিনি যে ইচ্ছা করিলেই ইহা সম্ভব করিতে পারেন সে কথা জানাইয়াছেন। এই শান্তি স্থাপিত হইলে যে কিরূপ সুফল লাভের সম্ভাবনা সে কথা (উ ৮৮।১৭-২৭) কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পিতৃব্যের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য এবং জাগতিক কাজের জন্যও ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদের সহিত শান্তি স্থাপন করা উচিত। সর্বোপরি মানবিক প্রয়োজনেও শান্তি প্রতিষ্ঠা একান্ত কর্তব্য। এই জন্য সর্বশেষে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শান্তি স্থাপন করিবার এক মানবিক আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন—"রাজশ্রেষ্ঠ ! পৃথিবীর রাজারা সমবেত হইয়াছেন। সুতরাং ইঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া এই সৈন্যগণকে ধ্বংস করিবেন। রাজা ! আপনি এই লোকগুলিকে রক্ষা করুন। ইহারা যেন নষ্ট না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলে ইহারা বাঁচিবে। ইহারা নির্দোষ, বদান্য, লজ্জাশীল, সভ্য, সৎকুলোৎপন্ন এবং পরস্পর পরস্পরের সহায়। সুতরাং রাজা ! আপনি ইহাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। পরন্তপ ! ভরৎশ্রেষ্ঠ ! এই রাজারা আদর পাইয়া, ক্রোধ ও শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর মিলিত হইয়া এক সঙ্গে পান ও ভোজন করিয়া মঙ্গলে মঙ্গলে আপন গৃহে প্রতিগমন করুন।" (উ ৮৮। ৩২-৩৬)। এইরূপে কৃষ্ণ শান্তি স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে প্ররোচিত করিয়াছেন এবং যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব, তাঁহার উপর আরোপ করিয়াছেন। কৃষ্ণের বাক্য সমাপ্ত হইলে দেখা গেল তাঁহার বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারও কিছুই বলিবার নাই। সকলেই তাঁহাকে অনুমোদন করিয়াছেন। এইরূপে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সুনাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

দুরূহ রাজকার্যে যেমন কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন, ভগবৎ মহিমা প্রচার করেন নাই, সেইরূপ যেখানে শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেও অলৌকিক দৈব শক্তির মাঝে মাঝে উল্লেখ থাকিলেও প্রধানত মানবিক শক্তির উপর তিনি নির্ভর করিয়াছেন। কৌরব রাজসভায় শান্তি সংস্থাপনের জন্য দৌত্যে গমন করিবার সময় দূরদর্শিতা বশতঃ অনুমান করিয়াছিলেন যে দুর্যোধন এই সুযোগ সহজে পরিত্যাগ করিবে না। তিনি দুর্যোধনের দুষ্ট প্রকৃতি হইতে সাবধান করিয়া সারথি সাত্যকিকে যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন এবং তাহাকে গদা তূণ ও অন্যান্য অস্ত্র, শঙ্খ ও চক্র সঙ্গে লইতে নির্দেশ দিয়াছেন। দুর্যোধনের দুষ্প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তাহার জন্য এই প্রস্তুতি উভয়ই কৃষ্ণের মানবিক পরিচয় অভিব্যক্ত করে।

সাত্যকিকে অনুরূপ নির্দেশ দান করিয়াছিলেন কৃষ্ণ জয়দ্রথ বধ করিবার সময়। অভিমন্যু শোকে কাতর অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিবার, অন্যথায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিবার দূরূহ প্রতিজ্ঞা করিলে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।

মহারথী পরিবেষ্টিত জয়দ্রথকে বধ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। যদি কোন কারণে অর্জুন ইহা সম্ভব করিতে না পারেন তাহা হইলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা কৃষ্ণের নিকটও অচিন্ত্যনীয়। কৃষ্ণের পক্ষে অর্জুনের মৃত্যু সহ্য করা সম্ভব নহে। সেই উদ্বেগ এবং অর্জুনের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভার্যা, মিত্র, জ্ঞাতি কিংবা বন্ধু, কুন্তীনন্দন অর্জুন ব্যতীত কোন ব্যক্তিই আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহে। দারুক! এমন কি আমি মুহূর্তকালও অর্জুনশূন্য এই জগৎ দেখিতে সমর্থ নহি। তবে সে জগৎ সেইরূপ হইবেও না।" (দ্রো ৭০।২৫-২৬) অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের গভীর ভালোবাসা তাঁহার মানবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে। ইহা অধিকতর ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার দৃঢ় সংকল্পে। এই সংকল্প ঘোষণা করিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"দারুক! আগামীকল্য আমি অর্জুনের জন্য মহাযুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকিলে, ত্রিভুবনের লোক আমার শক্তি দর্শন করিবে। দারুক! আগামীকল্য হস্তী, রথ, অশ্ব ও রথের সহিত সহস্র সহস্র রাজা ও শত শত রাজপুত্র যুদ্ধে পলায়ন করিবেন। দারুক, কাল তুমি দেখিবে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণের জন্য যুদ্ধে চক্র দ্বারা মথিত করিয়া দুর্যোধনের সৈন্য নিপাতিত করিব।" (দ্রো ৭০।২৮-৩০) কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না। কিন্তু অর্জুনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সুতীব্র উৎকণ্ঠায় তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অন্যায় করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালোবাসাতে, তাহাকে বিপদমুক্ত করিবার অধীর আগ্রহে মানুষই ন্যায়-অন্যায় সমস্ত বিস্মৃত হয়। অর্জুনের জন্য কৃষ্ণের এই ভালোবাসা এবং গভীর উৎকণ্ঠা তাঁহার মানবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে।

কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম সখা অর্জুনকে বিপদমুক্ত করিতে যেমন মানবিক অধীরতা প্রকাশ করিয়া ন্যায়-অন্যায় সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন, তেমনই তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য মানবিক পথই অনুসরণ করিয়াছেন। দৈবী শক্তিতে, ভগবৎ মহিমাতে সহজ পথে অর্জুনের বাধাবিঘ্ন দূর করেন নাই। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি বীর ক্ষত্রিয়ের ন্যায় স্থির করিয়াছিলেন যে নিজেই অস্ত্র ধারণ করিবেন এবং এতদুদ্দেশে সারথিকে তিনি তদ্রূপ আদেশ দান করিয়াছেন—"দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তুমি আমার উত্তম রথখানাকে যুদ্ধ শাস্ত্রানুসারে সাজাইয়া লইয়া সাবধানে যাইবে। সারথি দারুক! তুমি আমার কৌমোদকী গদা দিব্যশক্তি, চক্র, ধনু, বাণ, ছত্র এবং অন্য সমস্ত উপকরণ রথে তুলিয়া লইয়া ধ্বজের উপরে রথশোভাকারী বীর গরুড়ের স্থান কল্পনা করিয়া বিশ্বকর্মা নির্মিত সূর্য ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং দিব্য স্বর্ণজালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব নামক চারিটি উত্তম অশ্বকে রথে সংযুক্ত করিয়া, কবচ ধারণ পূর্বক যত্নবান হইয়া থাকিও। তারপর কৃষ্ণস্বর পূরণজনিত পাঞ্চজন্য শংখের ধ্বনি এবং ভয়ংকর কোলাহল শুনিয়া বেগে আমার নিকট আসিও। দারুক! আমি একদিনেই, পিতৃস্বসা পুত্র ভ্রাতা অর্জুনের ক্রোধ এবং সমস্ত দুঃখ দূর করিব। আমি সমস্ত উপায়ে এমন চেষ্টা করিব, যাহাতে অর্জুন যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষেই জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন।" (দ্রো ৭০।৩৩-৪০)

কবি কাশীরামদাসের কৃষ্ণের মধ্যে এইরূপ মানবিকশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। সূচনা হইতে তিনি ভগবৎ মহিমায় বিরাজমান। স্বয়ম্বর সভায় বলরাম কৃষ্ণকে

বলিয়াছেন যে অর্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেও কন্যা লইয়া যাইতে পারিবে না কারণ এক-দিকে পার্থ একা এবং অন্যদিকে অগণিত ক্ষত্রিয় রাজা। ইহাদের সহিত একা পার্থের সংগ্রাম করিয়া কন্যা লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলরামকে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে—

"কৃষ্ণ কন অন্যায় করিলে দুষ্টগণ।
তুমি আমি আছি হেথা কিসের কারণ॥
মম বিদ্যমানে হেন করে অত্যাচার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্বলের বল আমি সর্বফল দাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব॥
সুদর্শনে ছেদিব যে সকল দুষ্টমতি।
পূর্বে যথা নিঃক্ষত্রিয়া কৈলে ভৃগুপতি।
বিশেষ করিতে নাশ অবনীর ভার।
তেঁই জন্ম অবনীতে হৈয়াছে আমার॥" পৃঃ ২২১

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় এই কৃষ্ণই সকলের অগোচরে সুদর্শন চক্র দ্বারা যন্ত্রের ছিদ্রপথ আবৃত করিয়া স্বয়ম্বরের গতি নির্ধারণ করিয়াছেন। এইজন্যই দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারে নাই, সুদর্শন চক্রে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। কৃষ্ণের মহিমাতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বর্গের সকল দেবতা সমবেত হইয়াছেন। অসহায় পঞ্চপাণ্ডবকে সর্ব বিপদ হইতে তিনিই ত্রাণ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণকে দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবে বন্দনা করিয়াছেন—

"অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভিকমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অংঘ্রি গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়॥
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়॥" পৃঃ ৪৩১

কৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ সভাপর্বে রাজসূয় যজ্ঞের সময় সকলে দর্শন করিয়াছেন। ভক্ত-জনের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট তাঁহার কাছে নিবেদন করিয়াছেন। তাই দ্রৌপদী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

"অনাথের নাথ তুমি নির্ধনের ধন।
সে কারণে তব পাশে করি নিবেদন॥
সুখ দুঃখ কহিবারে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু, কর অবধান॥" পৃঃ ৪৪০

এই কৃষ্ণ সকলেরই একমাত্র আশ্রয়। তাই দুঃখে বিপদে তাঁহার কাছেই সকলের প্রার্থনা। কৃষ্ণও তাই ভক্তবৎসলতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

"ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
কেবল আমার ভক্ত সুখ ও দুঃখ দাতা॥
ভক্তজন যথা মম থাকে দৈবি সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয়॥
সে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল॥" পৃঃ ৫৮৭

কৃষ্ণ যে একান্ত ভাবেই ভক্তের ভগবান, ভক্তের জন্য ভগবানের চিত্তও যে সমান চঞ্চল সে কথা প্রকাশ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের সময় রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিয়াছেন—

"তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে॥" পৃঃ ৩২৪

দ্রৌপদী

সংস্কৃত মহাভারতের প্রধান প্রত্যেক চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রতিটি চরিত্রই অদ্বিতীয় ও অসাধারণ। কিন্তু দ্রৌপদী চরিত্রের দীপ্তির কাছে অন্যান্য সকল চরিত্র ম্লান বলিয়া মনে হয়। দ্রৌপদী যজ্ঞাগ্নিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিসম্ভবা, তিনি পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়তমা মহিষী। তাঁহার পঞ্চস্বামীর প্রবল প্রতাপে দেব, যক্ষ, নর, রাক্ষস সকলে কম্পমান। কিন্তু এই রূপ স্বামী থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদীকে বারংবার লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। দুঃশাসন তাঁহাকে রজস্বলা অবস্থায় সবলে রাজসভায় আনিয়া চরম অপমান করিয়াছে। বিরাট রাজসভায় কীচক তাঁহাকে স্বামীগণের সমক্ষে পদাঘাত করিয়াছে, অরণ্যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জয়দ্রথ তাঁহাকে নিগৃহীত করিয়াছে। দ্রৌপদীর এই বেদনার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে অসহনীয় ক্রোধ। এ ক্রোধ কেবল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে নহে। তাহারা যদি তাহাদের অন্যায়ের যথোপযুক্ত শাস্তি পাইত, তাহা হইলে দ্রৌপদীর অপমানের বেদনা কিঞ্চিৎ লাঘব হইত। কিন্তু কৌরবকৃত অপমান ও কীচকের অপমানের সময় দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর নিষ্ক্রিয়তা তাঁহার সহনাতীত। সেইজন্য অত্যাচারীদের প্রতি ক্রোধের সহিত, দ্রৌপদী চিত্তে স্বামীদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিমান সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অভিমানে তিনি তাঁহার বংশমর্যাদা স্মরণ করিয়াছেন এবং আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে এই ক্রুদ্ধ, তেজোদৃপ্ত, অভিমানক্ষুব্ধ বেদনাবিধুর, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীর রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। বিরাট রাজসভায় কীচক যখন দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিয়াছে তখন তিনি এই রূপে উদ্ভাসিত হইয়াছেন।

কীচক যখন বিরাট রাজসভায় দ্রৌপদীকে পদাঘাত করে, তখন সেই সভায় কংকবেশী যুধিষ্ঠির এবং বল্লভবেশী ভীম উপস্থিত ছিলেন। অথচ তাঁহারা এমনই অসহায় যে প্রিয়তমা মহিষী এইরূপে অপমানিত হইলেও তাঁহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দ্রৌপদীর পক্ষেও কোন যুক্তি দ্বারাই এই অপমান সহ্য করাও শক্ত ছিল। বিশেষতঃ পতিগণের এই নিষ্ক্রিয়তা তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল। তাই পতিপরায়ণা হইয়াও পতির উদ্দেশ্যে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন দ্রৌপদী। সংস্কৃত মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে এই সময়, দ্রৌপদী আহত ফণিনীর ন্যায় গর্জন করিয়া চলিয়াছেন—"যাঁহাদের শত্রু দেশ হইতে ষষ্ঠ দেশে বাস করিয়াও ভয়ে নিদ্রা যায় না, তাঁহাদেরই মানিনী ভার্যা আমি, আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করিল। ব্রাহ্মণ হিতৈষী ও সত্যবাদী, যে বীরেরা কেবল দানই করেন, প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদেরই মানিনী ভার্যা আমি, আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করিল। যে বীরগণের ধনুর্গুণ আস্ফালনের শব্দ দুন্দুভিশব্দের ন্যায় শোনা যায়, তাঁহাদেরই মানিনী ভার্যা আমি, আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করিল। যাঁহারা তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান ও অভিমানী তাঁহাদেরই মানিনী ভার্যা আমি, আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করিল। এবং যাঁহারা এই সমগ্র জগৎ সংহার করিতে পারেন কিন্তু এখন ধর্মপাশে আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহাদেরই মানিনী ভার্যা আমি, আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করিল। শরণার্থীরা উপস্থিত হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা গুপ্তভাবে লোক সমাজে বিচরণ করিতেছেন, আজ সেই মহারথিগণ কোথায় রহিলেন। সতী ও প্রিয়তমা পত্নীকে পদাঘাত করিল ইহা দেখিয়াও সেই বলবান ও অমিততেজা বীরগণ নপুংসকের ন্যায় কি করিয়া সহ্য করিতেছেন। সতী ও প্রিয়তমা পত্নীকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল ইহা দেখিয়াও তাঁহারা তাহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছেন না, তাঁহাদের ক্রোধ, বীর্য ও তেজ কোথায় রহিয়াছে?" (বি ১৫।১৭-২৪) ক্রোধে দুঃখে ও অপমানে দ্রৌপদী যখন এইরূপ গর্জন করিতেছিলেন তখন কংকবেশী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে রাণী সুদেষ্ণার নিকট গমন করিতে আদেশ দিয়াছেন। সেই রাজাদেশ অমান্য করা দ্রৌপদীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই আদেশ পালন করিবার পূর্বে পতির বিরুদ্ধে তিনি রুদ্ধ রোষ প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্রুদ্ধ দ্রৌপদী বলিয়াছেন—"যাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্যূতক্রীড়াসক্ত সেই মহাদয়ালুদের জন্যই আমি ভোগের সময়েও ধর্মচারিণী হইয়াছি। না হইলে সেই দুর্জনেরা তখন তখনই তাঁহাদের বধ্য হইত।" (বি ১৫।৪০)

কাশীরামদাসের মহাভারতে দ্রৌপদী কণ্ঠে এইরূপ ক্রুদ্ধ উক্তি শোনা যায় না। বাঙ্গালী নারীর কোমল প্রকৃতিতে এই জাতীয় উক্তি অত্যন্ত কঠোর ও অশোভন মনে হইয়াছে। জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে নীরবে সহ্য করাই বাঙ্গালী নারীর বৈশিষ্ট্য। কাহারও প্রতি কঠোর কর্কশ উক্তি মৃদুস্বভাবা বাঙ্গালী নারীর কণ্ঠে প্রত্যাশিত নহে। কবি কাশীরামদাসের কাব্যে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের প্রতি এইরূপ রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। কবির দ্রৌপদীর উক্তিতে সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীর বাক্যের ঐক্য রহিয়াছে কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীর উক্তিতে যে প্রচণ্ড তেজস্বিতা ও ক্রোধ প্রকাশিত হইয়াছে কবির দ্রৌপদীর মধ্যে তাহা অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া আক্ষেপোক্তিতে পরিণত

হইয়াছে এবং কোমলতা ও কারুণ্যে মণ্ডিত হইয়াছে। এই অংশে দ্রোপদী বলিয়াছেন—

"পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে।
দেবদ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সে সব জনের আমি মানসী মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥
যাঁর ধনুর্ঘোষে তিন লোকে কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিনলোক জয়॥
তাঁর ভার্যা আমি আজি দেখিয়া অনাথ।
দুষ্ট সূতপুত্র মোরে করে পদাঘাত॥
বল বুদ্ধি সে সবার কোথাকার গেল।
মোর এত অপমান নয়নে দেখিল॥" পৃঃ ৬৮৯

সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীর ক্রোধ ও দর্প, তেজ ও প্রতিহিংসা সভাপর্বে কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে এবং দুই দ্রৌপদীর মধ্যে ব্যবধান কতখানি তাহা প্রথম অধ্যায়ে সভাপর্বের অন্তর্গত আলোচনায় প্রকাশ করা হইয়াছে। সেখানে দেখান হইয়াছে একজনের চোখের জল যখন ক্রোধের ও প্রতিহিংসার অনলে বাষ্পে পরিণত হইয়াছে, অপরজন তখন দুর্বৃত্তের অত্যাচারে আকুল ক্রন্দনে, ভগবৎচরণে স্বীয় বেদনা নিবেদন করিয়াছেন এবং দুঃখ ও দুর্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদী সভাপর্বের এই অপমানের জ্বালা কোনদিন বিস্মৃত হন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের উদ্ধত করস্পর্শে তাঁহার যে বেণী আকুলিত হইয়াছিল, তাহা সেই দুর্বৃত্তের বক্ষরক্ত রঞ্জিত হস্তে ভীম যতদিন না বন্ধন করিয়া দিবেন, ততদিন তিনি মস্তকের দীর্ঘ কেশভার বহন করিবেন, বেণী বন্ধন করিবেন না। কিন্তু দুঃশাসনকৃত অপমান হইতেও তীব্রতর বেদনা এই যে তাঁহার পঞ্চস্বামী বিদ্যমান থাকিতেও তাঁহাকে এই নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তাই অভিমানে দ্রৌপদীর অধর স্ফুরিত হইয়াছে, চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া অশ্রুধারা বক্ষ প্লাবিত করিয়াছে। এই ক্রোধ, অভিমান, আত্মমর্যাদা, প্রতিহিংসা স্পৃহা এবং সুতীব্র বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে সংস্কৃত মহাভারতের বনপর্বে যখন বনবাসী পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী সমীপে কৃষ্ণ উপনীত হইয়াছেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দ্রৌপদীর হৃদয় মথিত হইয়াছে। কৌরব সভায় নিগ্রহের স্মৃতি নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়াছে, অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"মধুসূদন! প্রাণীগণের মধ্যে যাহারা স্বর্গীয় এবং যাহারা মর্তীয়, তাহাদের সকলের ঈশ্বব তুমি। সুতরাং প্রণয়বশতঃ তোমার নিকট দুঃখের কথা বলিব। কৃষ্ণ! প্রভু! পাণ্ডবগণের ভার্যা তোমার সখী এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী আমার মত নারীকে কি করিয়া সভায় আকর্ষণ করিয়া নিতে পারে? আমি লজ্জিতা, কম্পিতা, রজস্বলা এবং একবস্ত্রা, এই অবস্থায় কৌরবসভায় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি রক্তাক্ত অবস্থায় রাজাদের মধ্যে গিয়াছিলাম, তখন পাপাত্মা ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল। মধুসূদন! পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালগণ এবং বৃষ্ণি বংশীয়গণ জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা আমাকে দাসীভাবে ভোগ করিয়াছিল। কৃষ্ণ! আমি ভীষ্ম ও

ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই ধর্মানুসারে কুলবধূ হই। সেই আমাকেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বলপূর্বক দাসী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল।" (বন ১১।৬১-৬৬) অপমানের এই জ্বালার সহিত যুক্ত হইয়াছে স্বামীগণের প্রতি অভিমান। যদি তাঁহার স্বামীগণ উপস্থিত না থাকিতেন, যদি তাঁহারা অক্ষম, পঙ্গু ও ক্লীব হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিমান করিবার মত কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু তাঁহাদের সমক্ষেই দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনা সাধিত হইয়াছিল। ইহাই দ্রৌপদীচিত্তে গভীরতম ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার কণ্ঠে স্বামীগণের প্রতি প্রচণ্ডতম ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে—"এ ক্ষেত্রে মহাযোদ্ধা ও মহাবল পাণ্ডবগণকেই আমি নিন্দা করি। যেহেতু উঁহাদেরই যশস্বিনী ধর্মপত্নীকে কেহ উৎপীড়ন করিতেছিল, উঁহারা ইহা অবাধে দেখিতেছিলেন। অতএব জনার্দন! যাঁহারা ক্ষুদ্র কর্তৃক আমার উৎপীড়ন অবাধে সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ভীমের বাহুবলকে ধিক্ এবং অর্জুনের গাণ্ডীবকেও ধিক্।… মধুসূদন! তুমি, ভীম ও অর্জুন ভিন্ন অন্য কোন লোকই যে ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে পারে না, সেই গাণ্ডীবধনু ও ভীমের বলকে ধিক্ এবং অর্জুনের পুরুষকারকেও ধিক্। কারণ সেগুলি থাকিতে দুর্যোধন মুহূর্তকালও জীবিত রহিয়াছে।" (বন ১১।৬৭-৬৮, ৭৮-৭৯)

কৌরবকৃত অপমানের কথা স্মরণ করিয়া দ্রৌপদী পতিগণকে ধিক্কার দিয়াছেন। এই সময়েই আত্মসচেতন নারী বংশমর্যাদা স্মরণ করিয়াছেন—"আমি অলৌকিক বিধানে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পাণ্ডবগণের প্রিয়তম ভার্যা, এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ। কৃষ্ণ! মধুসূদন! তথাপি আমি সেই শ্রেষ্ঠা এবং পতিব্রতা হইয়া পঞ্চপাণ্ডবগণের দৃষ্টিগোচর থাকিয়াও কেশাকর্ষণের লাঞ্ছনা পাইলাম।" (বন ১১।১২১-১২২) এই দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া অভিমানে ও বেদনায় দ্রৌপদীর বক্ষবসন সিক্ত হইয়াছে। এই দ্রৌপদীর রূপ সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"এই কথা বলিয়া মৃদুভাষিণী দ্রৌপদী পদ্মকোষতুল্য সুন্দর ও কোমল পাণিদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এবং তিনি উন্নত, পীবর, সুগোল ও সুলক্ষণ স্তন দুইটিকে দুঃখজাত অশ্রুবিন্দু দ্বারা সিক্ত করিতে লাগিলেন।" (বন ১১।১২৩-১২৪) এই অবস্থায় তীব্র অভিমানে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"মধুসূদন! আমার পতিরা নাই, পুত্রেরা নাই, বান্ধবেরা নাই। ভ্রাতারা নাই, পিতা নাই এবং তুমিও নাই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করিল, অথচ তোমরা আমাকে সুস্থের ন্যায়ই উপেক্ষা করিতেছ। তারপর কর্ণ তখন আমাকে যে উপহাস করিয়াছিল, তোমরা আমার সে দুঃখেরও শান্তি করিতেছ না। কৃষ্ণ! কেশব! সম্পর্ক, গুরুত্ব। সখিত্ব ও প্রভুত্ব এই চারিটি কারণেই সর্বদা আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।" (বন ১১।১২৬-১২৮)

একান্ত নিকট আত্মীয়ের নিকট মানুষ যেমন মর্মবেদনা প্রকাশ করে দ্রৌপদীও সেইরূপ কৃষ্ণের নিকট হৃদয়ের গভীর বেদনা নিবেদন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া তাঁহার নিকট শরণ গ্রহণ করেন নাই অথবা তাঁহার নিকট দুঃখ দূর করিবার প্রার্থনাও জ্ঞাপন করেন নাই। কৃষ্ণ তাঁহার স্বামী অর্জুনের সখা, সেইজন্য কৃষ্ণের উপরও তাঁহার বিশেষ দাবী। স্বামীগণের প্রতি সুগভীর ভালোবাসাই যেমন অভিমানে পরিণত হইয়া ধিক্কার বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেইরূপ কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রীতি ও সখ্যের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধেও অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই সুতীব্র

অভিমানে তাঁহার মনে হইয়াছে যে সকলে থাকিয়াও পৃথিবীতে তিনি নিঃসঙ্গ একক।
তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা যে তাঁহার লাঞ্ছনার সময় কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।
সেইজন্য তাঁহার নিকট হইতে এখনও প্রত্যাশা আছে। তাই কৃষ্ণের নিকট তাঁহার
দাবী যে সমস্ত বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণের তাঁহাকে রক্ষা করা উচিত। কাশীরামদাসের
দ্রৌপদীর কণ্ঠে এই বলিষ্ঠ দাবী শোনা যায় না। পতিগণের বিরুদ্ধে মৃদু ধিক্কার
উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত মহাভারতের ন্যায় এত তীব্র এবং এমন সুস্পষ্ট নহে।
সংস্কৃত মহাভারতে প্রকাশিত অভিমানের অভিব্যক্তি নাই বলিলেই হয়, কেবল অসহায়
নারীর করুণ ক্রন্দন, এবং শরণাগতের আকুল প্রার্থনা প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত
মহাভারতের দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছেন সখারূপে কিন্তু কবি কাশীরামদাসের
কৃষ্ণ দ্রৌপদীর নিকট ভগবান। সেই ভগবানের প্রতি স্তুতি-বন্দনা করিয়া দ্রৌপদী
বলিয়াছেন—

"অনাথের নাথ তুমি নির্ধনের ধন।
সে কারণে তব পাশে করি নিবেদন॥
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু, কর অবধান॥
পাণ্ডবের ভার্যা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তব প্রিয় সখী আমি অর্জুন ভামিনী॥
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্বাক্য কহিল যত কহনে না যায়॥
স্ত্রী-ধর্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্রপরি।
অনাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি॥
বীর বংশ পাঞ্চাল ও পান্ডবেরা জীতে।
বিধিমতে দাস্যকর্ম বলিল করিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিলেন মোর অপমান॥
সবে বলে পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত।
এতদিনে সে সবার পাইলাম অন্ত॥
ধর্মপত্নী আমি, হেন কহে সর্বলোকে।
এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে॥
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর, ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয়॥
পূর্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান।
স্ত্রী কষ্ট না দেখে পতি থাকি বিদ্যমান॥
হীনবলা হইলে ভার্যায় রাখে স্বামী।
সে কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি॥
পুত্ররূপে জন্মে লোকে ভার্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্যারে॥

ভার্যা ভীতা হয়ে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয়, তারে করয়ে রক্ষণ ॥
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে।
কেন এ'রা রক্ষা নাহি করিল আমারে ॥
বন্ধ্যা নহি দেব আমি, হই পুত্রবতী।
পুত্র মুখ চাহি না করিল অব্যাহতি ॥
হীন বীর্য নহে মোর যত পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন ॥
তবে কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম।
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম ॥
দাসরূপে সভাস্থলে বাস সবে দেখে।
মোর অপমান করে যত দুষ্ট লোকে ॥
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে ॥
ধনঞ্জয় কিংবা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহি না জানিনু আমি ॥
ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এতকরি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্যোধন ॥" পৃঃ ৪৩৯।৪৪০

সাধারণ রমণী যেমন সাংসারিক দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হইয়া ভগবানের নিকট আপন বেদনা প্রকাশ করে, দ্রৌপদীও সেইরূপেই আপন বেদনা নিবেদন করিয়াছেন—

"এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অবিরাম ঝরে ॥
পুনঃ গদগদ বাক্যে কহেন পার্ষতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা, নাহি মোর পতি ॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্বজনে।
চারি কর্মে আছি দেব তোমার রক্ষণে ॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভূ পণে।
দাসীজ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে ॥" পৃঃ ৪৪০

সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলিয়াছেন যে সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমাকে তোমার রক্ষা করা উচিত। কাশীরামদাসের দ্রৌপদীর পক্ষে এই রূপে রক্ষা করা উচিত বলিয়া দাবী জানান সম্ভব হয় নাই। তিনি এইমাত্র প্রার্থনা করিয়াছেন কৃষ্ণ যেন তাঁহাকে চরণে স্থান দান করেন। অথচ সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কাশীরামদাসের মহাভারতের এই অংশের তুলনা করিলে দেখা যাইবে কত ঘনিষ্ঠ ভাবে কবি সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়াছিলেন, উভয়ের মধ্যে বাক্যের বহুলাংশেই মিল লক্ষ্য করা যায়—তথাপি উভয় দ্রৌপদীর মধ্যে কি বিপুল পার্থক্য। একজন প্রবলের অত্যাচারে পীড়িতা অসহায়া রমণী অন্য জন তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা ও বংশমর্যাদা সম্পন্ন তেজস্বিনী ক্ষাত্র নারী।

সংস্কৃত মহাভারতে দ্রৌপদীর অভিমান, তেজস্বিতা ও অনিন্দ্য সৌন্দর্যের সহিত আরও একটি শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্যে নহে, তাঁহার তেজস্বিতায় নহে, তাঁহার আত্মমর্যাদা বা বংশমর্যাদা সম্বন্ধে অতি-সচেতনাতেও নহে, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত আছে তাহার হ্লাদিনী শক্তিতে। এই শক্তি সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীর মধ্যে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, কাশীরামদাসের দ্রৌপদীর মধ্যে সেরূপ পাওয়া যায় না। দ্রৌপদী অনিন্দ্যসুন্দরী, কিন্তু বাহিরের রূপ যদি অন্তরের ভাবের দীপ্তিতে উজ্জ্বল না হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে সত্যকার সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয় না। দ্রৌপদীর রূপ বাহ্য সৌন্দর্যের নহে, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নহে, তাহা নারীর চিরন্তন সৌন্দর্য যাহা চিরকাল পুরুষচিত্তকে বৃহত্তর কর্মে প্রবর্তিত করিয়াছে। মহাভারতের কাহিনীধারায়, দেখা গিয়াছে যে পঞ্চপাণ্ডব যখন অতি ধার্মিকতায় ক্লৈব্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন দ্রৌপদীর তীব্র বাণী তাঁহাদের জড়ত্বকে ধিক্কার দিয়া কর্মে উদ্দীপিত করিয়াছে। যদি সাধারণ রমণীর ন্যায় দ্রৌপদী কালক্রমে তাঁহার অপমান বিস্মৃত হইতেন তাহা হইলে মহাভারত কাহিনী অন্যরূপে লিখিত হইত। যদি দ্রৌপদী সেই হ্লাদিনী শক্তির এবং সেই শক্তির সহিত অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অধিকারী না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য ও তাঁহার অশ্রু, পঞ্চপাণ্ডব, এমন কি কৃষ্ণের চিত্তে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিত না! দ্রৌপদী নিজ অপমানের তীব্র জ্বালা কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সেই অপমানের প্রতিকারের জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অন্যথায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পরিহার করিবার জন্য উদ্যোগপর্বে বহুল প্রচেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু "নীল নয়ন প্রান্তা বরারোহা, অশ্রুসজল পদ্ম নয়না, কুটিলাগ্রমনোহর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ সৌরভশালী, সর্বসুলক্ষণযুক্ত, মহাসর্পের ন্যায় কান্তি সম্পন্ন কোমল বেণীধৃতা কৃষ্ণার" ক্রোধাগ্নিতে সমস্ত ভস্মীভূত হইয়াছিল। কুরু ও পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দৌত্যে গমন করিবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—"কালপক্ক ধার্তরাষ্ট্রগণ যদি আমার কথা না শোনে, তবে তাহারা নিহত এবং শৃগাল ও কুক্কুরের খাদ্য হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। হিমালয় পর্বত যদি স্থানভ্রষ্ট হয়, পৃথিবী যদি শতধা বিদীর্ণ হয়, এবং নক্ষত্রসমূহের সহিত আকাশমণ্ডল যদি পতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হইবে না। দ্রৌপদী! তুমি অশ্রু সংবরণ কর; আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুমি অচির কাল মধ্যে আপন পতিদিগকে হতশত্রু ও রাজলক্ষ্মীযুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইবে।" (উ ৭৬।৪৭-৪৮) বনপর্বে কবি কাশীরামদাসের কৃষ্ণের কণ্ঠে এই জাতীয় কথা শোনা যায় কিন্তু তাহা একান্তই যান্ত্রিক। তাহাতে ভগবৎ মহিমা এবং ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণা প্রকাশ পাইলেও, নারীর দুঃখ দূর করিবার জন্য পুরুষ চিত্তের অপরিসীম আকুলতা ও বীর্য প্রকাশ পায় নাই। বনপর্বে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলিয়াছেন—

"যেই মত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
এইমত কান্দিবেক সে সবার স্ত্রীগণ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বাসুদেব বৃথা নাম ধরি॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিলা জলে ভাসে।

অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে ॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত কল্যাণী গো থাক সাবধান ॥" পৃঃ ৪৪০

দ্রৌপদীর বেদনা, তাঁহার কণ্ঠস্বর ও তাঁহার অশ্রু যেমন কৃষ্ণকে বিচলিত করিয়াছে, বিরাটপর্বে সেইরূপ ভীমও বিচলিত হইয়াছিল। বিরাট রাজসভায় কীচক কর্তৃক অপমানিতা হইয়া, সেই অপমানের প্রতিকারের জন্য দ্রৌপদী ভীম সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"তদনন্তর নির্মলহাসিনী দ্রৌপদী পাকস্থানে ভীমসেনকে পাইয়া ধেনু যেমন মহাবৃষের নিকট গমন করে, সেইরূপ ভীমসেনের নিকট গমন করিলেন। তৎপরে দুর্গম বনে সিংহী যেমন নিদ্রিত সিংহকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ দ্রৌপদী নিদ্রিত পাণ্ডুনন্দন ভীমকে আলিঙ্গন করিলেন।" (বি ১৫।৫২-৫৩) নিদ্রিত ভীমকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া আপন মর্মবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন দ্রৌপদী (বি ১৫।১০-২৯ ; ১৭।১-৪৪ ; ১৮।১-২৮ এবং ১৯।১৭-৩৬) এই দীর্ঘ শ্লোকাবলীতে, কিন্তু এই দীর্ঘ শ্লোকসমূহের বক্তব্যের মধ্যে দুইটি শ্লোকের ব্যঞ্জনা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে। কীচক বধ করিবার আবেদন শেষে দ্রৌপদী বলিয়াছেন "ভরত নন্দন ! যে কীচক আমার বহুতর দুঃখের কারণ, সেই কীচক জীবিত থাকিতে, সূর্য যদি প্রাতঃ কালে উদিত হয়, তবে আমি আলোড়ন করিয়া বিষপান করিব, কিন্তু কীচকের বশীভূত হইব না। কারণ ভীমসেন ! আপনার সম্মুখে আমার মৃত্যু ভাল। এই কথা বলিয়া দ্রৌপদী ভীমের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।" (বি ১৯।৩৭-৩৮) প্রিয়তমা পত্নী যখন অপমানে জর্জরিত হইয়া সেই অপমানের প্রতিকার করিবার আবেদন জানাইয়া স্বামীর বলিষ্ঠ বক্ষের উপর দুঃস্থ আবেগে পতিত হয় তখন সেই আবেদনকে উপেক্ষা করিতে পারে জগতে এমন পুরুষ দুর্লভ। শাস্ত্রে পুরুষকে জড় বলা হইয়াছে। সেই জড়ও যাঁহার প্রবর্তনায় জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কর্মে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন তিনিই প্রকৃতি। কাশীরামদাসের মহাভারতে সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীর এই শাশ্বত নারীমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না—

"বিরাট রন্ধন গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যায় বৃকোদর হয়ে অচেতন ॥
সংকেতে বলেন দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ কত নিদ্রা যাহ মৃতপ্রায় ॥" পৃঃ ৬৯০

"দুই পায়ে চাপিয়া" সংকেতে বলা আর দুঃসহ আবেগে স্বামীর বক্ষের উপর পতিত হওয়ার মধ্যে বিশাল ব্যবধান বিদ্যমান। এই ব্যবধান উভয় মহাভারতের দ্রৌপদীর অন্তর প্রকৃতিতে, অথচদ্রৌপদীর কথায় দুই মহাভারতের ঐক্য রহিয়াছে। কাশীরামদাসের দ্রৌপদীও বলিয়াছেন—

"আজি যদি কীচকে তুমি না মারিবে।
নিশ্চিত আমার মৃত্যু তোমারে লাগিবে ॥
হয় বিষ খাব কিংবা প্রবেশিব জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে ॥

নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মোর ভার্যা হও বলি অনুক্ষণ কয় ॥
সৈরিন্ধ্রি বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক্ মোর ছার প্রাণে জীবনে কি আশ ॥" পৃঃ ৬৯১

কবি সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়া কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কাশীরামদাসের ভীমও কীচক নিধন করিয়াছেন কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা ও কার্য পুরুষের বক্ষের তপ্ত রক্তধারার মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কবি কাশীরামদাসের দ্রৌপদীর কথায় হয় নাই। কবি কাশীরামদাসের দ্রৌপদী তাঁহার উপর নির্যাতনের বর্ণনা করিয়া করুণার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কর্ম প্রেরণা সৃজন করিতে পারেন নাই। তাঁহার আকুল ক্রন্দনে চিত্ত বেদনার্ত হইতে পারে, সেই বেদনা দূর করিবার জন্য ইচ্ছা জাগিতেও পারে, কিন্তু সেই ইচ্ছার সহিত আনন্দের উন্মাদনা সৃজিত হয় না, কবির দ্রৌপদী বেদনার্ত হইয়া রোদন করিয়াছেন—

"এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
নেত্র নীরে তিতিল ভীম কলেবর ॥" পৃঃ ৬৯২

"মুখে কর দিয়া আকুল ক্রন্দন" যে কোনও অসহায়া নারীর বৈশিষ্ট্য কিন্তু ক্রন্দনের অধীর আবেগে বক্ষে পতিত হওয়া একমাত্র প্রিয়তমা মহিষীর পক্ষেই সম্ভব এবং দুইয়ের মধ্যে ব্যঞ্জনার যে বিপুল ব্যবধান তাহা সহজেই বোঝা যায়।

কবির দ্রৌপদী বাঙ্গালী রমনীর কোমলতা লইয়া বিরাজমান। তিনি স্নেহে সুকোমল বাঙ্গালী নারী বলিয়া পিতামাতা ভ্রাতা ও অন্যান্য সকলের জন্য ব্যাকুল। এইজন্য স্বয়ম্বর সভায় অর্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে যখন সমবেত অন্যান্য রাজাদের সহিত যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সময় সেই অবস্থাতেও কৃষ্ণা তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের জন্য উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন—

"কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল, বৃদ্ধ মম বাপ ॥
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
বহু বিলাপিয়া দেবী করেন ক্রন্দন ॥" পৃঃ ২৩৫

এই বিলাপ আত্মীয় স্বজনের জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, তাঁহার বাঙ্গালী পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে, আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভগবান কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

"অর্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ-বিপদ হন্তা সবাকার তাত ॥
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ।
পিতা মাতা রাখ মোর, রাখ ভ্রাতৃগণ ॥
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ।
তুমি সত্য বটে যদি, আমি যদি সতী।
দুষ্টগণে মারিবে আমার দ্বিজ পতি ॥" পৃঃ ২৩৫

এই কোমলান্তঃকরণা দ্রৌপদী কাশীরামদাসের অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় কৃষ্ণ-ভক্তিতে বিভোর। সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদীরও কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তির অভাব নাই, কিন্তু সেখানে ভক্তিভাবের সহিত সখ্য ভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তুলনায় সখ্যভাব অপেক্ষাকৃত প্রবল বলিয়া মনে হয়। সখ্যভাব জনিত সম্প্রীতির জন্য সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদী কৃষ্ণের উপর নিজস্ব দাবী অনুভব করিয়াছেন। এই দাবী বা বিশেষ অধিকার বোধ হইতে কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদী চিত্তে অভিমান সৃষ্টি হইয়াছে এবং অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"মধুসূদন! আমার পতিরা নাই, পুত্রেরা নাই, পিতা নাই এবং তুমিও নাই।" (বন ১১।১২৬) কবির দ্রৌপদীর মধ্যে এই তীব্র অভিমান নাই, আছে চরম আত্মসমর্পণ এবং কৃষ্ণনির্ভরতা। তাই কবির দৌপদীর প্রার্থনা—"দাসীজ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে।"

কৃষ্ণ ভক্তিতে রোদন পরায়ণতায়, বাঙ্গালী সুলভ স্নেহ প্রীতি, ভালোবাসায় দ্রৌপদী একান্ত ভাবেই বাঙ্গালী ঘরের নারী,—মহাকাব্যের মহিমময় ভাব সমুন্নত জগতের নারী, দ্রুপদরাজ দুহিতা, অগ্নি সম্ভবা যাজ্ঞসেনী নহেন। সেইজন্য তাঁহার আচার আচরণে অনেক সময়ই এমন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যাহা নিতান্তই সাধারণ স্তরের রমণীর উপযুক্ত। এই লৌকিক পরিচয় মহাকাব্যের চরিত্র হইতে এতই পৃথক যে দুইজনকে দুই নারী বলিয়া মনে হয়। রাজসূয় যজ্ঞে দ্রৌপদীর সহিত হিড়িম্বার যে কলহ কবি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দ্রৌপদী চরিত্র বহুলাংশে খর্ব হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত সাধারণ সপত্নী সুলভ মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই আচরণের জন্য তিনি মহাভারত মহাকাব্যের জগৎ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আপনজনে পরিণত হইয়াছেন।

কুন্তী

কবি কাশীরামদাসের দ্রৌপদী যেমন ক্ষত্রিয় রমণী বীর ক্ষত্রিয় পত্নী নহেন তেমনই কুন্তীও ক্ষত্রিয় জননী নহেন, তিনিও সহায় সম্বলহীনা ভর্তৃহীনা অসহায়া বাঙ্গালী মাতা। সংস্কৃত মহাভারতের অন্যান্য প্রত্যেকটি চরিত্রের ন্যায় কুন্তী চরিত্রেও ক্ষাত্রতেজের ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বীর মাতার পক্ষেই বীর পুত্র লাভ করা সম্ভব। সংস্কৃত মহাভারতে বীর চরিত্রসমূহের উপযুক্ত জননীর পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে কুন্তীর মধ্যে। পক্ষান্তরে কবি কাশীরামদাসের রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের তেজস্বিতা ও দার্ঢ্যের পরিবর্তে স্নেহশীলতা, কোমলতা, রোদন প্রবণতা ও কৃষ্ণভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

সভাপর্বে হৃতসর্বস্ব হইয়া যখন বল্কলাবৃত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বনগমন করিতে-ছিলেন তখন প্রিয় পুত্রগণের অবস্থা দেখিয়া দুই মহাভারতের কুন্তীই বেদনায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় কোন জননীর পক্ষে শান্ত থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু দুইজনের যে-চিত্র দুই গ্রন্থে অংকিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়াছে। একজন যেন সুউচ্চ বনস্পতি, আঘাতে আলোড়িত হইয়াও আপন

মহিমাতে অটল। বেদনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছে কিন্তু বাত্যাতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত হন নাই। পুত্রগণের বিদায়কালীন কুন্তীর রূপ সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"কুন্তী দ্রৌপদীকে গমন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকাকুল কণ্ঠে অতি কষ্টে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। বৎসে। তুমি এই গুরুতর বিপদে পড়িয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীলোকের সমস্ত ধর্মই জান এবং সৎ-স্বভাব শালিনী ও সদাচার সম্পন্না। মৃদুহাসিনী। তোমার ভর্ত্তাদের বিষয়ে, তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা আমার বলিয়া দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ তুমি সমস্ত গুণ দ্বারাই পিতৃ মাতৃ উভয় কুল অলংকৃত করিয়াছ। হে নিষ্পাপে! যাহাদের তুমি দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ কর নাই সেই কৌরবেরা ভাগ্যবান। সে যাহা হউক, আমার মঙ্গল চিন্তায় রক্ষিত হইয়া তুমি নির্বিঘ্নে পথে গমন কর। অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে সতী স্ত্রীদের বিহ্বলতা সঙ্গত নহে। তুমি অসাধারণ ধর্ম কর্তৃক রক্ষিত হইতে থাকিয়া শীঘ্রই মঙ্গল লাভ করিবে। বনবাসের সময় আমার পুত্র সহদেবকে তুমি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিও, যাহাতে মহামতী সহদেব বিপদে অবসন্ন হইয়া না পড়ে।" (সভা ৭৬।৩-৮) কুন্তী পুত্রগণের দুর্দশায় এবং তাহাদের বিচ্ছেদের বেদনায যতই ব্যাকুল হন না, তিনি জানেন সেই বিশেষ মুহূর্তে বধূর প্রতি তাঁহার কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই বজ্রসম শেল হৃদয়ে বিদ্ধ রাখিয়াও কুন্তী দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের সহ্য করিবারও সীমা আছে। দৃঢ়তম হৃদয়ও আঘাতের কঠোরতাতে বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাই কুন্তী হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়াছে। তাহারও অশ্রু শতধারায় নামিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"অত্যন্ত বাৎসল্যশালিনী কুন্তী সেই অবস্থায় পুত্রগণের নিকট যাইয়া প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিতে থাকিয়া শোকবশতঃ বারংবার বিলাপ করিতে থাকিলেন।" (সভা ৭৬।১২) ইহার পর কুন্তীর বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু আঘাতে আত্মহারা হইবার পূর্বে কুন্তী যে পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নিদর্শন কবি কাশীরামদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সেখানে কেবল বিলাপোক্তি আছে। কবি কাশীরামদাসের কুন্তী প্রথম হইতে আঘাতে আত্মহারা ও ব্যাকুল। তাঁহার চক্ষে অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে। কেবলমাত্র কুন্তীর চক্ষেই যে প্লাবন নামিয়াছে তাহা নহে, হস্তিনার প্রজা সাধারণেব, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের একই অবস্থা। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্বজন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে, কান্দে নারীগণ ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন ॥
নগর পূরিল যে কান্না কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দম হৈল নয়নের জলে ॥
পঞ্চপুত্র বনে যায় বধূ গুণবতী।
বার্তা শুনি কুন্তী দেবী আসে শীঘ্রগতি ॥ ক
দূর হইতে দেখে কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিতা হৈয়া দেবী পড়িল ভূতলে ॥

মুকুলিত কেশভার গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করেন রোদন ॥
বধূর দেখিয়া বেশ হৈল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া রহে যেন চিত্রের পুত্তলি ॥" পৃঃ ৪১৯

ইহার পর কুন্তীর দীর্ঘ বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তরে কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"হেন মনে কুন্তী দেবী করেন রোদন।
প্রবোধিয়া প্রণমিয়া যায় পঞ্চজন ॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তাঁরে বহু বুঝাইয়া ॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥" পৃঃ ৪২২

এখানে অবুঝ মাতৃহৃদয়ের অসহায় কান্না প্রকাশিত হইয়াছে।

কুন্তী চরিত্রের ক্ষাত্র তেজ ও দীপ্তি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উদ্যোগপর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের মূল প্রকৃতি এই অংশে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল।

উদ্যোগপর্বে বর্ণিত হইয়াছে কৌরব রাজসভায় শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া পাণ্ডব শিবিরে প্রত্যাগমনের পূর্বে কৃষ্ণ পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কুন্তী হৃদয়ে পুত্রগণের বিচ্ছেদ বেদনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃহৃদয়ের তীব্রতম বেদনাকে একটি মাত্র শ্লোকে মহাকবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন— "গোবিন্দ! আজ হইতে চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত যেহেতু যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখি নাই, সেই জন্যই শোক করিতেছি। জনার্দন! মানুষ মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করে। বাস্তবিক পক্ষে তাহারাও আমার কাছে মৃত এবং আমিও তাহাদেব কাছে মৃত।" (উ ৮৩।৭২) কোন জননী যে কি দুঃসহ বেদনাতে জীবিত পুত্রগণকে মৃত বলিতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই গভীর দুঃখ ও বেদনা হইতেও যাহা আরও অধিক বেদনাদায়ক তাহা হইল পরাশ্রয়ী হইয়া জীবন ধারণ করার অবমাননা। ক্ষাত্রিয় নারীর নিকট এই অবমাননা পুত্র বিচ্ছেদ বেদনার অনুরূপ। সেই বেদনা প্রকাশ করিয়া কুন্তীদেবী বলিয়াছেন—"বাসুদেব! যে নারী পবের আশ্রযে থাকিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাকে আমি ধিক্কার দিই। কারণ অনুনয় লব্ধ জীবিকা না থাকাই ভাল।" (উ ৮৩।৭৫) সেইজন্য কুন্তী মনে করেন তিনি যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় জননী হন এবং তাঁহার পুত্ররা যদি ক্ষত্রিয় বীর হন তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহাদের নিজেদের এবং তাহাদের জননীর দুঃখ, বেদনা ও অপমান দূর করিবেন। আর যদি তাহারা জীবিত থাকিয়াও চরম প্রয়োজনের সময় কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্মানুযায়ী আচরণে পরাঙ্মুখ হন তাহা হইলে সেই কুলাঙ্গার পুত্রগণকে তিনি পুত্র বলিয়া স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের প্রতি সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদের নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিবেন। সেইজন্য তিনি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"অতএব তুমি অর্জুনকে এবং সর্বদা উদ্যোগী ভীমসেনকে

বলিও, ক্ষত্রিয় রমণী যে জন্য পুত্র প্রসব করেন, এই তাহার সময় আসিয়াছে। এই উপস্থিত সময়ে তোমাদের থাকাটা যদি নিস্ফলে অতীত হয় তাহা হইলে তোমরা লোক সম্মানিত সাধু হইয়া অতি নিষ্ঠুব কার্য করিবে। বৎসগণ! তোমরা ঘৃণিত কার্য (রাজ্য লাভের জন্য অনুনয় বিনয়) করিলে আমি তোমাদিগকে চিবকালের জন্য ত্যাগ কবিব। কারণ সময় উপস্থিত হইলে জীবনও ত্যাগ করা উচিত।" (উ ৮৩।৭৬-৭৮) কুন্তী এখানে অত্যন্ত তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে পুত্রগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিযাছেন। যুদ্ধে প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল নহেন, মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগে তিনি কাতব নহেন, তিনি অপমান ও দুর্দশা দূর করিতে কৃতসংকল্প, সেইজন্য পুত্রগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে তাহারা অক্ষত্রোচিত কার্য কবিলে তিনি তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবেন।

ইহার বিপরীত প্রকৃতি কবি কাশীরামদাসেব কুন্তীর। তাঁহার পক্ষে পুত্রগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করা ত' সম্ভব নহে। এমন কি পুত্রগণের সামান্য অদর্শনও তিনি সহ্য করিতে পারেন না; তাহারা যথা সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন না করিলে উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী জননীব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে আদিপর্বে। স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য পঞ্চপাণ্ডবের গৃহ প্রত্যাগমনে অস্বাভাবিক বিলম্ব হইতেছিল। এই বিলম্বের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জননী কুন্তী উদ্বেগে অস্থির হইযা উঠেন। যখন সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাইযা পুত্রগণ প্রত্যাবৃত হইয়াছেন তখন জননী সস্নেহে আহ্বান করিয়াছিলেন—

"আয় বে সোনার চাঁদ অরে বাছা ধন।
নিকটে এসরে দেখি সবার বদন॥" পৃঃ ১৯৩ আদিপর্ব

কবি কাশীরামদাসের কুন্তী এই সোনারচাঁদ বাছাধনদের দীন দরিদ্রা জননী মাত্র।

কুন্তীব দৈন্যের, তাঁহার হৃতসর্বস্বতার ও অসহাযতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে কৃষ্ণ বলরামের প্রতি তাঁহার উক্তিতে। স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিয়া যখন কৃষ্ণ বলরাম কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন তখন স্নেহাস্পদ নিকট আত্মীয়দের দর্শন করিয়া কুন্তী হৃদয়ে দুঃখ সাগর মথিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দুববস্থার জন্য প্রায় অকারণে দীর্ঘ বিলাপ করিয়া কুন্তী কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছেন—

'কোথা ছিলি বাপু অন্ধা অনাথার নড়ি।
হাপুতির পুত যেন দরিদ্রের কড়ি॥
দ্বাদশ বছর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কাঁদিয়া দুর্বল হইল আঁখি॥
আজিকার রাত্রি মোর হইল সুপ্রভাত।
দ্বাদশ বর্ষের কষ্ট আজি গেল তাত॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমাদের জননীর ভ্রাতার আমার॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি॥

নাহি জানি তোমাদের এত নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দয় তোর পিতা ॥
গহন কাননে ভ্রমি আর কত দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ ॥" পৃঃ ২৩৯

এই ক্রন্দন ও অসহায় দরিদ্র বিধবার আক্ষেপ কবি কাশীরামদাসের কুন্তীর কণ্ঠে প্রায়শঃই ধ্বনিত হইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্র

এইরূপে দেখা যায় সংস্কৃত মহাভারতের পাত্রপাত্রী সকল আমাদের পরিচিত জগতের সাধারণ বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছে। রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের আচার আচরণে, কার্যে বাক্যে যে শান্ত মর্যাদা প্রকাশিত হয়, ক্ষাত্র চরিত্রের যে তেজ ও দর্প, শৌর্য ও বীর্যের মহিমা লক্ষ্য করা যায়, সে সকল পরিবর্তিত হইয়া অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সাধারণ চারিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের ভীষ্মের মধ্যে স্নেহশীল বৃদ্ধ পিতামহের সন্ধান পাওয়া যায়। বহুকাল পরে নিরুদ্দিষ্ট এবং মৃত বলিয়া পরিগণিত পৌত্রগণের সন্ধান পাইয়া তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। স্বয়ম্বর সভায় দ্বিজবেশী অর্জুনের কার্যকলাপ দেখিয়া যখন দ্রোণ ভীষ্মকে বলেন যে ইহা অর্জুন ভিন্ন আর কেহ নহে, তখন বিপুল আনন্দের মধ্যেও ভীষ্ম ক্রন্দনাকুল হইয়াছেন। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"শুনিয়া পার্থের নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল ॥
কি বলিলা আচার্য করিলা কোন কর্ম।
জ্বালিয়া নির্বাণ অগ্নি, দগ্ধ কৈলা মর্ম ॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কানে।
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে ॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিসেন ভীষ্ম ত্যজ শোকমন ॥" পৃঃ ২২০

এই বর্ণনায় কৌরবশ্রেষ্ঠ বীর ক্ষত্রিয় ভীষ্মের পরিবর্তে স্নেহাতুর অথর্ব বৃদ্ধ পিতামহের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যও অস্ত্রগুরু নহেন। তিনি ভিখারী ব্রাহ্মণ মাত্র। এই জন্য বিরাটপর্বে কর্ণ দ্রোণের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন—

"জানিয়াছি আমি তোমা সবাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি ॥
অন্নজল খাইবার পাইলে সময়।
যুদ্ধকাল দেখি প্রাণে উপজিল ভয় ॥

যাহ বা থাকহ তুমি যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
ভিক্ষাজীবি সনে দ্বন্দ্ব কোন প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবি যেই জন।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন ॥
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে ॥"   পৃঃ ৭২৯

সংস্কৃত মহাভারতের পাত্রপাত্রী যে আমাদের পরিচিত বাঙ্গালী চরিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা নহে, দেবদেবীরাও বাঙ্গালী পরিচয় পরিগ্রহ করিয়াছেন। কাহিনীগত পার্থক্যের আলোচনার সময়ে প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে পার্বতী ও মহাদেব বাঙ্গালী দম্পতিতে পরিণত হইয়াছেন। নারদ কলহসৃজননিপুণ সাধারণ বাঙ্গালী। সত্যভামা, রুক্মিণী, হিড়িম্বা, দ্রৌপদী প্রভৃতির মধ্যে যে ঈর্ষা ও কলহপরায়ণ রমণীর রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিবরণ ইতিপূর্বেই কাহিনীর আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে এই মন্তব্য করা যায় কবি কাশীরামদাস চতুস্পার্শ্বে যাঁহাদের দর্শন করিয়াছেন স্বীয় কাব্যে তাঁহাদের প্রকাশ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়বস্তু

কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে সৌতিমুনি মহাভারত গ্রন্থারম্ভের সময় ইহার পরিচয় দান করিয়া বলিয়াছেন—"এই মহাভারত ত্রিভুবনেই জ্ঞানের প্রধান আকর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।" (আদি ১।২৭) মহাভারত সম্বন্ধে সেইজন্য প্রবাদ সৃষ্টি হইয়াছে, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" সংস্কৃত মহাভারতে আলোচিত বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও গভীরতা উভয়ই এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা প্রকাশ করে। বিভিন্ন তত্ত্বে ও তথ্যে ইহা সমৃদ্ধ। ইহা মানব জীবনের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলের সন্ধান দান করিয়াছে, সামাজিক বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিয়াছে, লোকচরিত্র গঠন করিয়াছে, এবং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল আলোচনার অধিকাংশই বিরাটপর্বের পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহাদের অধিকাংশকে গ্রহণ করিবার অবকাশ কবি কাশীরামদাসের ছিল না। তিনি মাত্র বিরাটপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অংশের মধ্যে আলোচিত বিষয়বস্তুর কতখানি অংশ তিনি স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এই অধ্যায়ে তাহা আমাদের বিচার্য।

কবি কাশীরামদাস যে সময় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেই সময় শিক্ষিত সমাজ দেবভাষাতে শাস্ত্রাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষা দীন জন সাধারণ মাতৃভাষাতে কাব্য পুরাণাদি পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। সেইজন্য কবির রচনা যে শিক্ষিত বিদ্বান সমাজ অপেক্ষা প্রধানতঃ সাধারণ বাঙ্গালী আস্বাদ করিবে সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। স্বীয় গ্রন্থে, সংস্কৃত মহাভারতে আলোচিত বিষয়বস্তুর অবতারণাতে কবির এই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। জনমানস সকল সময়েই তত্ত্ব ও তথ্যগত আলোচনায় পরাঙ্মুখ। তাহারা রসাস্বাদে এবং বিশেষ ভাবে বলা যায় গল্প রস আহরণে উৎসুক। তাহাদের আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, কবি কাহিনীর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতে চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহেরও বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। কবি যদি আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া এই সকল আলোচিত বিষয় সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে ইহা তাঁহার পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতিপ্রদ হইত না। কারণ এই সকল গুরুগম্ভীর বিষয়সমূহ তাহাদের গ্রহণ ক্ষমতার অতীত। সুতরাং তাহাদের গ্রহণ ক্ষমতা ও আগ্রহের কথা বিচার করিয়া, সংস্কৃত মহাভারতের যে সকল বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পাঠক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরক্তি ও ক্লান্তি উৎপাদন করিবে, সেই সকল তথ্যমূলক আলোচনা তিনি বর্জন করিয়াছেন। এই রূপ তথ্যমূলক আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায় বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ

উপলক্ষে। উক্ত যজ্ঞে যে সকল নৃপতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ হইতে এবং এই ভূখণ্ডের সহিত সন্নিহিত অন্যান্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিবরণ এবং তাঁহারা যে সকল উপহার দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারও দীর্ঘ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের এবং ভারতবর্ষের সংলগ্ন অন্যান্য দেশের ভৌগোলিক পরিচয় এবং সেই সকল দেশের উৎপাদিত বস্তুর বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ পাঠকের এই বিষয়ে আগ্রহ থাকার কথা নয়। অধিকন্তু এই বর্ণনা গল্পের গতিকে ব্যাহত করিবে সেইজন্য কবি এই সকল আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন।

কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের, যে সকল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সংস্কৃত মহাভারতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি আমাদের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। সেইগুলিকে গ্রহণ করিলে কবির পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইবে এবং একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, সুতরাং এইগুলি সর্বথা বর্জনীয় নহে, কবি এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন। কিন্তু এই সকল আলোচনা এরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাহা জনমানসে আগ্রহ সৃষ্টি করিবে এবং গল্পের গতিকে ব্যাহত করিবে না। গল্প প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কৃত মহাভারতে আলোচিত বিষয় সমূহকে অত্যন্ত সরল, সংক্ষিপ্ত ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশ করা প্রয়োজন। ইহা একটি অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। কিন্তু কবির রচনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, যে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এই কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

সংস্কৃত মহাভারতে যে সকল তথ্যমূলক বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহাদের অন্যতম হইল বিশ্বসৃষ্টি রহস্যের ও মানবজীবন রহস্যের কথা। আদি ১।২৭-৪৭ এই দীর্ঘ কুড়িটি শ্লোকে সৃষ্টি রহস্যের কথা বলা হইয়াছে। দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকার ও কার্যের কথা এবং স্থাবর ও জঙ্গমাদির উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা আলোচিত হইয়াছে আদি ৭৮।৯-২০ শ্লোকে। এই আলোচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলে সংস্কৃত মহাভারতে আলোচনার প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে। জীবের দেহ ধারা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা প্রসঙ্গে রাজা যযাতি বলিয়াছেন—"শরীর নাশের পর জীব আপন আপন কর্ম অনুসারে মাতার উদরে প্রবেশ করে। সেখানে তাহার শরীর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তৎপরে সে তাহার মাতার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে, ইহাই স্পষ্ট দেখা যায় ...পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের শোণিত এই দুইটি বস্তুকে কোষ্ঠসহ বায়ু জরায়ুর ভিতর লইয়া যায়, সেখানে যাইয়া ক্রমশঃ সেই গর্ভটিকে বর্ধিত করে। সে বায়ুর এই দুইটি কার্য করিবার মাত্র অধিকার আছে। জীব সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া গর্ভ পিণ্ডে প্রবেশ করে, তৎপরে চৈতন্যশালী হইয়া মাতার উদর হইতে নির্গত হয়, তাহার পর আমি মনুষ্য ইত্যাদি অভিমান করিতে থাকে। এবং কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ, চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন, নাসিকা দ্বারা শব্দ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদ, ত্বক দ্বারা স্পর্শ আর মন দ্বারা সমস্ত পদার্থের অনুভব করিতে থাকে। অষ্টক, এই স্থূল শরীরের ভিতর এই ভাবে সূক্ষ্ম শরীরের সম্বন্ধ ঘটিত হওয়ায় জীবের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় লাভ ও চৈতন্য লাভ হইয়া থাকে।...সূক্ষ্ম শরীরাবলম্বী জীব চলিয়া যাইবার সময় নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় সেই স্থূল দেহের প্রাণ লইয়া পুণ্য ও পাপকে সাক্ষী করিয়া আতিবাহিক বায়বীয়

দেহঅবলম্বন পূর্বক বায়ু অপেক্ষাও দ্রুতগামী হইয়া অন্য যোনিতে প্রবেশ করিয়া, অন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করে। পুণ্যবান জীব পবিত্র যোনি লাভ করে, আর পাপী জীব পাপ যোনিতে প্রবেশ করে এবং পাপী জীবই কীট পতঙ্গ প্রভৃতি হইয়া থাকে। অষ্টক এ বিষয়ে ইহার অধিক আর আমার বলিবার ইচ্ছা নাই। তবে সূক্ষ্ম শরীরাবলম্বী জীব মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া চতুষ্পদ, দ্বিপদ ও ষট্পদ প্রাণী হইয়া থাকে।" (আদি ৭৮।৬, ৭, ১০-১১, ১৪, ১৬, ১৮-২০) এই আলোচনা কত তথ্যপূর্ণ ও বিশদ তাহা সহজেই বোঝা যায়। জ্ঞানলিপ্সু চিত্তের কাছে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ইহা বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে না বিবেচনা করিয়া কবি কাশীরামদাস ইহাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য হয় যেই জন।
ভৌম নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ ॥
রজোবীর্যযুত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় কর্ম অনুসারে ॥
পশুকীট পতঙ্গ বিবিধ জন্ম পায়।
গৃধ্র শিবাগণ তারে পুনঃ পুনঃ খায় ॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় পুনঃ পুনঃ মরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনি অনুসারে ॥" পৃঃ ৯৪

উদ্ধৃত অংশ দুইটি পারস্পরিক তুলনা করিলে দেখা যাইবে শেষ দুইটি ছত্রে কবি সংস্কৃত মহাভারতের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতের বক্তব্য এই ভাবে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশিত হইয়া জনমানসে জ্ঞানের প্রসার সাধন করিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের জীবনাদর্শকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। সাধারণ ভারতবাসী জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এই জন্মেই সমস্ত জন্মপ্রবাহের পরিসমাপ্তি নহে। পরবর্তী জন্মে উন্নততর জীবন লাভের আকাঙ্খায় ইহজন্মে সৎকর্মে প্রণোদিত হইয়াছে। এইরূপে সাধারণ জনজীবনের আদর্শ নিরূপণে এবং তাহাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে কবির উপস্থাপিত বিষয়বস্তু একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

কবি কাশীরামদাস তাঁহার পাঠক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর গ্রহণ ক্ষমতা সম্বন্ধে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনই তাহাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতে প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য সূচক দীর্ঘ আলোচনা বিধৃত হইয়াছে। এই সকল আলোচনায় জীবনযাত্রার যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সহিত যাহারা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নহেন তাহাদের পক্ষে এ বিষয়ে আগ্রহী হওয়া সম্ভব নহে। কবি কাশীরামদাসের সময়ে সাধারণ বাঙ্গালী জীবনযাত্রা পূর্বেকার ভারতীয় জীবনযাত্রা হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সেইজন্য খুব স্বাভাবিক কারণে সেই জীবনযাত্রার আলোচনাসমূহ সাধারণ মনে কোনও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিবে না বিবেচনা করিয়া ইহার অধিকাংশ কবি বর্জন করিয়াছেন। এইজন্য আদি ৭১।১-১৮ শ্লোকে প্রাচীন ভারতবর্ষের চতুরাশ্রম জীবনযাত্রার যে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে কবি সেগুলিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন যেমন চতুরাশ্রমে বিভক্ত ছিল তেমনই ছিল চতুর্বর্ণে বিভক্ত। চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রধানতঃ সংস্কৃত মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রার প্রকৃতিও কবির সময় বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। পূর্বেকার যাগ-যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা তপোবন জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য সকলই বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেইজন্য যে সকল অংশে এই আলোচনা রহিয়াছে সেইগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবির সময় ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত সেইজন্য ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্যসূচক উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু যে চারিত্র বৈশিষ্ট্যে সেই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার আলোচনা নাই।

সংস্কৃত মহাভারতে ক্ষাত্র জীবন ব্যাপকভাবে আলোচিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় জীবনাদর্শের বিশেষ করিয়া রাজধর্মের বিশদ পর্যালোচনা করা হইয়াছে। রাজা ছিলেন সমগ্র জাতীয় জীবনের মূল আশ্রয়। সেইজন্য রাজার কর্তব্য, রাজকার্যে রাজার অবদান (আদি ৩৬।২৬।৩১), রাজ্যের অবস্থা (আদি ১০৩।১-২৬) রাজ-কার্যের মন্ত্রণা (আদি ১৩৫।৬-২৩, ৫০-৯৩) প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে। কবি কাশীরামদাসের সময় বাঙ্গালী জীবনে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষ কোনও শ্রেণী ছিল না এবং রাজার সহিত বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ কোনও যোগ ছিল না। সিংহাসনে রাজার পরিবর্তনে জনজীবনে কোনও পরিবর্তন সাধিত হইত না। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের এই সকল আলোচনার প্রায় সকলই বর্জিত হইয়াছে। কিন্তু রাজনীতি ও রাজধর্মের মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে যাহা রাজা ও প্রজা সকলের ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় সাধারণ মানবজীবনে প্রয়োজনীয় এমন দুই একটি উক্তি দীর্ঘ আলোচনার মধ্য হইতে কবি গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেগুলিকে এরূপ সহজ ও সরল করিয়া বলিয়াছেন যাহাতে জনজীবনে ইহা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কণিকের মন্ত্রণা অংশ আলোচনা করিলে ইহা সহজে বোঝা যাইবে।

পঞ্চপাণ্ডবের জনপ্রিয়তা ও শক্তিবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রিয় পাত্র, নীতি শাস্ত্রজ্ঞ এবং মন্ত্রণাভিজ্ঞ, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ কণিককে আহ্বান করিয়া ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কণিক এই সময় ধৃতরাষ্ট্রকে দীর্ঘ মন্ত্রণা দান করেন। আদি ১৩৫।৫-৯৭ শ্লোকাবলীতে এই দীর্ঘ মন্ত্রণার কথা বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রণার ফলে পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিয়া জতুগৃহে দাহ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইহা অনুধাবন করিলে সহজেই বোঝা যাইবে যে এই মন্ত্রণা বিশেষভাবে নৃপতিগণের প্রতি প্রযোজ্য। এই আলোচনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্য ইহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল। কণিক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—"রাজা সর্বদাই সৈন্যগণকে সজ্জিত রাখিবেন, সর্বদাই পুরুষকার প্রকাশ করিবেন, নিজের ফাঁক প্রকাশ করিবেন না শত্রুর ফাঁক দেখিবেন, এবং ফাঁক পাইলেই তাহাকে আক্রমণ করিবেন। যাঁহার সৈন্য সর্বদাই সজ্জিত থাকে, তাঁহাকে সকলেই ভয় করে। অতএব রাজা বিক্রম দ্বারাই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিবেন। নিজের ফাঁক পরে দেখিতে পাইবে না, পরের ফাঁক পাইয়াই তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে এবং কূর্মের ন্যায় রাজা নিজের অঙ্গ (হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি সৈন্য) সংবৃত

রাখিবেন, আর নিজের ফাঁক গুপ্ত রাখিবেন। রাজা কোন সময়েই কোন কার্য আরম্ভ করিয়া তাহা সমাপ্ত না করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না। কেন না শরীর বিদ্ধ কণ্টকেরও অল্প অংশ কাটিয়া দিলে তাহা চিরস্থায়ী ব্রণ জন্মায়। অপকারী শত্রুকে বধ করাই প্রশস্ত। আর শত্রু পরাক্রমশালী হইলেও তাহার বিপদের সময় তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিবে এবং যুদ্ধ নিপুণ হইলেও তাহাকে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে, এ বিষয়ে কোন বিবেচনা করিবে না। আর মহারাজ শত্রু দুর্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া কোন প্রকারেই উপেক্ষা করিবে না। কারণ ক্ষুদ্র অগ্নিও অগ্নি সংযোগবশতঃ সমস্ত বনটাকেই দগ্ধ করিয়া থাকে। আর, ক্ষেত্রবিশেষে অন্ধ ও বধির হইবে। প্রবল শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিলে, তৃণের ন্যায় অস্ত্র ত্যাগ করিবে এবং হরিণের ন্যায় সতর্ক হইয়া থাকিবে ; তারপর সামদান দ্বারা সেই শত্রু বশীভূত হইলে অবসরক্রমে তাহাকে বিনষ্ট করিবে। আবার দুর্বল শত্রু শরণাগত হইয়াছে বলিয়া দয়া করিবে না, তাহাকে মারিয়া ফেলিবে ; তখনই নিরুদ্বেগ হইতে পারিবে। কেন না নিহত ব্যক্তি হইতে আর ভয় থাকে না।......অগ্নিস্থাপন, যজ্ঞবিধান, গৈরিক বস্ত্রধারণ জটা ও অজিন ধারণাদি দ্বারা আপনার উপরে লোকের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহার পর কেন্দুয়া বাঘের ন্যায় শত্রুকে বিনষ্ট করিবে। যে পর্যন্ত কালের পরিবর্তন না হয়, সে পর্যন্ত ঘাড়ে করিয়া (কলসীর মত) শত্রুকে বহন করিবে। তাহার পর কাল ফিরিয়া আসিলে পাথরের উপরে কলসী যেমন ফেলিয়া দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে তেমন শত্রুকেও বিধ্বস্ত করিবে। শত্রু বহুতর কাতর ক্রন্দন করিলেও তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না বা তাহার উপর দয়া করিবে না কিন্তু তাহাকে মারিয়াই ফেলিবে। সামদানভেদ অথবা দণ্ড দ্বারা শত্রুকে শান্ত করিবে অথবা একদা ঐ সমস্ত উপায় দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবে।" (আদি ১৩৫।৬-১৪, ১৯-২৩) ইহার পর সামদানভেদ ও দণ্ডপ্রয়োগের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্বরূপ শৃগাল, বাঘ, হরিণ, মূষিক ও বেঁজীর কাহিনী বলা হইয়াছে। কাহিনীর শেষে রাজার আচরণের আরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা একদিকে যেমন নিষ্ঠুর তেমনই উন্নতিকামী রাজার নিকট অপরিহার্য। কণিক বলিয়াছে—পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা কিংবা গুরু ইঁহারাও শত্রু হইয়া দাঁড়াইলে, উন্নতিকামী লোক ইহাদিগকেও হত্যা করিবে। (আদি ১৩৫।৫২) "সদ্যই যে শত্রুকে বধ করা উচিত, সে যদি ধার্মিক হয়, তবে তাহাকে বধ না করিয়া তাহার বাড়ী পোড়াইয়া দিবে, আর অধম নাস্তিক এবং চোরকে আপন রাজ্যে বাস করাইবে না। (আদি ১৩৫।৫৯) ইহা ছাড়া কোথায় কোথায় গুপ্তচর নিয়োগ করিবে, তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কখন কোথায় কাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে এই সকল আলোচনাও কণিকের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই আলোচনায় দেখা যাইতেছে ইহা সম্পূর্ণ নৃপতিগণের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু নৃপতিগণের যেমন শত্রু আছে তেমনই গৃহীরও শত্রু আছে। শত্রুর প্রকৃতি হয়ত পৃথক। শত্রুর সহিত সংগ্রামের প্রকৃতিও পৃথক। অস্ত্রও পৃথক। কিন্তু শত্রু বিনাশে উভয়ে সমান প্রযত্ন করেন। সেই জন্য কণিকের উপদেশ হইতে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রযোজ্য এমন অংশটুকু আহরণ করিয়া কবি কাশীরামদাস বলিয়াছেন—

"আত্মছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।
পরছিদ্র পাইলে ধরিবে তখনে॥

সময় বুঝিয়া রাজা করিবেন কর্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যক্ত যথা হয় কূর্ম॥
শত্রুকে দুর্বল দেখি দয়া নাহি করি।
শরণ লৈলে তবু না রাখিবে বৈরী॥
শত্রুকে বালক দেখি না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু ঋণ একই সমান॥
ব্যাধি শেষ, রিপু শেষ, ঋণ শেষ আর।
অগ্নি শেষ রাখে যারা হয় ছারখার॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি ধরিবে বিনয়ে।
অপমান আদি ক্লেশ সহিবে হৃদয়ে॥
শত্রুকে রাখিবে সদা স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মার ভূমে আছড়িয়া॥" পৃঃ ১৬৩

সংস্কৃত মহাভারতে বলা হইয়াছে কচ্ছপের মত নিজের অঙ্গ (হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সৈন্য) সংবৃত রাখিবেন, আর নিজের ফাঁক গুপ্ত রাখিবেন। এই উপমাটি ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বাংলা মহাভারতে বলা হইল সময় বুঝিয়া কর্ম করিবে। প্রয়োজন হইলে নিজেকে প্রকাশ করিবে আবার অসুবিধা বুঝিলে আত্মগোপন করিবে। সংস্কৃত মহাভারতে কথাটা বলা হইয়াছিল এক অর্থে কিন্তু পৃথক অর্থে প্রয়োগ করিয়া বাস্তব জীবনে সর্বসাধারণের উপযোগী একটি নির্দেশ দান করা হইয়াছে কবির কাব্যে। ঈষৎ পরিবর্তিত এই উপদেশে জীবনের বাস্তব অবস্থা যে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হইয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। মানুষের নিকট শত্রুর সমান হইল ব্যাধি, অগ্নি ও ঋণ। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতে কেবল শত্রুর বিনষ্টির কথা বলা হইলেও কবি অতিরিক্ত এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর জনজীবনে তাঁহার এইরূপ উক্তি প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।—

"ব্যাধিশেষ, রিপুশেষ, ঋণশেষ আর।
অগ্নিশেষ রাখে যারা হয় ছারখার॥" পৃঃ ১৬৩

এইরূপে ব্যবহারিক জীবনে যে সকল উপদেশ নির্দেশ অথবা সামাজিক রীতি নীতি ও জীবনাদর্শ বিশেষভাবে প্রযোজ্য ও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য কবি সেইগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সরল করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। জীবনের সার্বজনীন ও সর্বকালীন আদর্শসমূহকে এবং এই সকল উপদেশাত্মক আলোচনা সমূহকে প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তাহাদিগকে যেরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন সেই বিশেষ রীতিটি উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত মহাভারতের দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ইহার ভাব নির্যাসটুকু পরিবেশন করিয়াছেন। ইহার জন্য অনেক সময় সংস্কৃত মহাভারতের কোন কোন শ্লোকের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে বোঝা যায় কবি কত নিষ্ঠার সহিত সংস্কৃত মহাভারত অনুধাবন ও অনুসরণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সংস্কৃত মহাভারতের তুলনায় কবির প্রকাশ ভঙ্গীতে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সংস্কৃত মহাভারতে আলোচ্য বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কবি কাশীরামদাস বক্তব্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তিনি ইহাকে

সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি সাহায্যে উভয় গ্রন্থের উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য নিম্নে পরিস্ফুট করা হইল।

সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্বে শুক্রাচার্য্য ও দেবযানীর মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষমার বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছে। এই কথোপকথনে শুক্রের উক্তিতে আক্রোধের ও ক্ষমার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে আদি ৬৭।১-৯ শ্লোকে। আক্রোধের মহিমা প্রকাশ করিয়া শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন। "যে লোক পরিশ্রান্ত না হইয়া শত বৎসর যাবৎ প্রত্যেক মাসে পিতৃশ্রাদ্ধ করে এবং যে লোক কাহারও উপরে ক্রোধ করে না এই দুইয়ের মধ্যে ক্রোধহীন লোকই প্রধান। (আদি ৬৭।৫০) ইহার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"শতেক বছর তপ করে যেই জন।
অক্রোধের সম সেই নহে কদাচন॥" পৃঃ ৮২

সংস্কৃত মহাভারতকে এইরূপ অনুসরণ করিয়াও নয়টি শ্লোকের বক্তব্যকে কবি বারটি ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে শুক্রাচার্য্যের উক্তিতে কেবল ক্ষমার মহিমার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি পৃথক একটি দৃষ্টিতেও গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইহার ভিন্নতর দিকটি অর্থাৎ কোথায় ক্ষমা অনুচিত সেকথা প্রকাশিত হইয়াছে দেবযানীর উক্তিতে—"পিতঃ আমি বালিকা হইয়াও ধর্মের দোষগুণ জানি এবং ক্ষমা ও ক্রোধের দোষগুণও জানি। যে শিষ্য হইয়াও শিষ্যের মত ব্যবহার না করিয়া ধর্ম বিসর্জন করে সে শিষ্যের প্রতি গুরুজনের ক্ষমা করা উচিত নহে। যে ভৃত্য ও শিষ্য আপন কর্তব্য, প্রভুসেবা ও গুরুসেবা করে না তাহারা নিস্ফল।...অস্ত্রে ছিন্ন কিংবা অগ্নিতে দগ্ধ অঙ্গ পুনরায় উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রাণিগণের প্রাণনাশ পর্যন্ত বাক্ ক্ষত অঙ্গ আর উৎপন্ন হয় না। শরবিদ্ধ অথবা কুঠার ছিন্ন অঙ্গ আবার জন্মে কিন্তু কটুবাক্যে বিকলীকৃত চিত্ত আর সুস্থ হয় না।" (আদি ৬৭।১২, ১৩-২৬) দেবযানীর বক্তব্যে কোথায় ক্ষমা অনুচিত তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কিরূপ স্থানে কাহাদের সহিত বসবাস করা উচিত, কিরূপ সংসর্গ পরিহর্তব্য, তাহা দেবযানী বলিয়াছেন। কিন্তু কবি কাশীরামদাস ওইরূপে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টির আলোচনা করেন নাই। তিনি ইতিপূর্বে ক্ষমার মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। সেইজন্য এ বিষয়ের আর কোন কথা উল্লেখ না করিয়া দেবযানীর উক্তির শেষ শ্লোকটির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া স্বচ্ছন্দ অনুবাদে বলিয়াছেন—

"দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপমান কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্পের দংশনে যথা বিষে অঙ্গ দয়।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যথা অগ্নি হয়॥
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
বলে আর চক্ষে ধারা বহে দরদর॥" পৃঃ ৮৩

বনপর্বেতেও এইরূপ দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে ক্রোধ ও ক্ষমার কথা আলোচিত হইয়াছে। এখানেও যুক্তি এবং প্রতিযুক্তির সাহায্যে বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আদিপর্বে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তিতে একই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। শকুন্তলা তাঁহার উক্তিতে (আদি ৮৭।৩৭-৫৭) ভার্যা ও পুত্রের মহিমার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভার্যার মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য দীর্ঘ যুক্তিজাল বয়ন করা হইয়াছে। পুত্রের

মাহাত্ম্য বলিবার জন্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারণ করিয়া নামের সহিত কার্যের সঙ্গতি দেখান হইয়াছে। এই অংশে সংস্কৃত মহাভারতের আলোচনার উপস্থাপনা ভঙ্গীটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলিয়াছেন—"পতি ভার্যার ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় পুত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্যই ভার্যার নাম হইয়াছে জায়া, ইহাই পৌরাণিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। বৈদিক সংস্কার সম্পন্ন পুরুষের যে তেজ আছে তাহাই সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই সন্তানই আবার সন্তান জন্মাইয়া পূর্বপুরুষগণকে উদ্ধার করে। 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাই তনয়ের নাম দিয়াছেন 'পুত্র'। তিনিই ভার্যা যিনি গৃহকার্যে নিপুণা, তিনিই ভার্যা যাহার পুত্র জন্মিয়াছে. তিনিই ভার্যা যিনি পতিব্রতা হন। ভার্যা পুরুষের শরীরের অর্ধাংশ, ভার্যা সর্ব প্রধান সখা, ভার্যা, ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রধান কারণ এবং ভার্যাই উদ্ধার পাইবার প্রধান হেতু। যাহাদের ভার্যা আছে, তাহারাই যজ্ঞাদির ক্রিয়ার অধিকারী, তাহারাই আমোদ করিতে পারে, এবং তাহারাই সর্বত্র শোভা পাইয়া থাকে। প্রিয়ভাষিণী ভার্যা নির্জনে বন্ধুস্বরূপ এবং রোগ-পীড়ায় মাতৃস্বরূপ। যে লোক সংসাররূপ দুর্গম পথের পথিক তাহার পক্ষে ভার্যা পরম বিশ্রাম স্থান এবং যাহার ভার্যা আছে সেই বিশ্বাসের পাত্র। সুতরাং সংসার ক্ষেত্রে ভার্যাই প্রধান অবলম্বন। পতি মরিয়া যখন একাকী ভয়ংকর দুর্গম পথ দিয়া পরলোকে গমন করিতে থাকেন, তখন পতিব্রতা ভার্যাই তাঁহার অনুসরণ করেন। ভার্যা পূর্বে মরিলে তিনি পরলোকে পতির জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, আর পতি পূর্বে মরিলে সাধ্বী ভার্যা তাঁহার অনুগমন করেন। মহারাজ! ভর্তা ইহলোকেও ভার্যাকে পান, পরলোকেও ভার্যাকে পাইয়া থাকেন। এই কারণেই মানুষ বিবাহ করে। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন ভর্তা ভার্যার গর্ভে আপনাকেই আপনি পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি পুত্রবতী ভার্যাকে মাতার ন্যায় দেখিবেন। দর্পণে যেমন নিজ মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, ভার্যাতেও তেমন পতি নিজেই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন, সুতরাং ধার্মিক লোক যেমন স্বর্গলাভ করিয়া আনন্দিত হন, পিতাও তেমন পুত্র দেখিয়া আনন্দিত হন, ঘর্মাক্ত লোক যেমন জলে অবগাহন করিয়া আনন্দ অনুভব করে,তেমন দুঃখিত ও রোগার্ত লোক পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ অনুভব করে। রতি, প্রীতি ও ধর্ম এ সমস্তই পত্নীর অধীন ইহা বুঝিয়া মানুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও স্ত্রীলোকের অপ্রিয় কার্য করিবে না, স্ত্রীলোকই নিজের পবিত্র ও চিরন্তন উৎপত্তি স্থল। স্ত্রীলোক ব্যতীত ঋষিদেরও সন্তান সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই। যখন ধূলি-ধূসরিত পুত্রটি যাইয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে তখন তাহা হইতে অধিক সুখ জগতে আর কি আছে……সূক্ষ্ম বস্ত্র, সুন্দরী স্ত্রী, এবং শীতল জলেরও স্পর্শ তেমন সুখ জন্মায় না, শিশুপুত্রের আলিঙ্গনের সময় তাহার স্পর্শ যেমন সুখ জন্মায়। দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গরু শ্রেষ্ঠ। গুরুজনদের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, আর সুখস্পর্শ বস্তুর মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ।" (আদি ৮৭।৩৭-৫৭) কবি কাশীরামদাস তাঁহার অনবদ্য ভঙ্গীতে সংস্কৃত মহাভারতের এই কুড়িটি শ্লোকের সারাংশ দান করিয়াছেন বাইশ ছত্রে। কবি কাশীরামদাস বলিয়াছেন—

"পুত্ররূপে জন্মে পিতা ভার্যার উদরে।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে জানে চরাচরে ॥

সে কারণে ভার্যারে জননী সমা দেখি।
করিলা অনেক দোষ ভার্যারে উপেখি ॥
অর্ধেক শরীর ভার্যা সর্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্যা সম বন্ধু রাজা নাহি মর্তলোকে ॥
পরম সহায় হয় পতিব্রতা নারী।
যাহার সাহায্যে সর্বকর্ম করি ॥
ভার্যা বিনে গৃহশূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্যা সঙ্গে যদি গৃহস্থ বলায় ॥
ভার্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সর্বদা দুঃখিত সেই সর্বদা উদাস ॥
ভার্যাবান লোক ইহলোকে বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তারে পরলোকে ॥
স্বামীর জীবনে ভার্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি অপেক্ষায় রহে স্বামী তরে ॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতি শাস্ত্র রাজা কহে সুরবর্গে ॥
ভার্যা হইতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহা হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ ॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্ম মাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে ॥
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি শুনি রাজা বেদেতে ব্রহ্মার ॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদে ব্রাহ্মণে।
অধ্যয়নে গুরুশ্রেষ্ঠ, পুত্র আলিঙ্গনে ॥
ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ের সর্ব দুঃখ হয় নিবারণ ॥" পৃঃ ৭৩

কবির রচনা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে সংস্কৃত মহাভারতের কোনও কোনও শ্লোকের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ রহিয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত মহাভারতকে অনুসরণ করিয়াও সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবি মূল বক্তব্যকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে ভার্যার মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য যে দীর্ঘ শ্লোক রহিয়াছে সেইগুলি সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার চিত্তের গভীরে তেমন প্রবেশ করিবে না কিন্তু কবির রচিত নিম্নের দুইটি ছত্র সহজেই তাহার মর্ম অধিকার করিবে—

"ভার্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্যা সঙ্গে যদি গৃহস্থ বলায় ॥"

এইভাবে জনজীবনে গ্রহণোপযোগী বক্তব্যকে কবি অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার সাধিত হইয়াছে।

বিশেষভাবে সংস্কৃত মহাভারতের যে সকল অংশে জীবনের একটি উচ্চ আদর্শের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে অথবা ব্যবহারিক জীবনে উপদেশ নির্দেশ দান করা হইয়াছে সেগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হওয়ায় জীবনযাত্রার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের কথাকে সাধারণ মানুষ গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত বলিয়া এই সকল আলোচনার দ্বারা তাহারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছে এবং সর্বান্তঃকরণে এইগুলি গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে শিক্ষায় ও সংস্কারে জনমানস উন্নত হইয়াছে এবং কবি কাশীরামদাস তাঁহার বিপুল জনপ্রিয়তার দ্বারা বাঙ্গালী মনের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

রস বিশ্লেষণ

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র সাহিত্য দর্পণে মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণরূপে বিবৃত হইয়াছে যে "ইহাতে শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত এই তিনটি রসের যে কোনও একটির প্রাধান্য থাকে এবং অন্য রসগুলি অপ্রধান ও অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে।"[১] আলংকারিকগণ অবশ্য রামায়ণ মহাভারতকে কোনও মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কারণ সাহিত্যিক মহাকাব্যের সহিত রামায়ণ মহাভারতের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তথাপি এই লক্ষণ সংস্কৃত মহাভারত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এখানেও শৃঙ্গার বীর ও শান্ত রসের প্রাধান্য। সমগ্র মহাভারতের মধ্যে কোনটি প্রধান এবং কোনগুলি অপ্রধান সে বিচার পৃথক। কিন্তু মহাভারতের প্রথম অংশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত যে বীর রসের প্রাধান্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত মহাভারতে একটি রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র একটি রাজপরিবারের ইতিকথা নহে, ইহার মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' শীর্ষক নিবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "প্রথম ভারতীয় আর্যগণ অনার্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত, তখন ভারতবর্ষীয়েরা অন্যার্যকুল প্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তারপর ভারতবর্ষের অনার্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত এবং দূর প্রস্থিত : ভারতবর্ষ আর্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্যগণ বাহ্যশত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্ন প্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পর দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে. এই সময়ের কাব্য মহাভারত।"[২] সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির যাথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এবং ইহার আনুষঙ্গিক কাহিনীর মধ্যে ভারতবর্ষের আর্য পৌরুষের চরম পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১ একবংশভবা ভূপাঃ কলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীর শান্তানামে কোহঙ্গী রস ইষ্যতে॥
অঙ্গানি সর্বেঽপি রসা: সর্বে নাটকসন্ধায়:।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্॥

সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩১৬, ৩১৭ শ্লোক।

২ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯০ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই ভয়াবহ সংগ্রামের, এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিতে এই কারণেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের যে ঐশ্বর্য ও সম্পদ আহৃত হইয়াছে তাহাকে ভোগ করিবার জন্যই এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কামনার ও অপমানের জ্বালা। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া কপট পাশা খেলার আয়োজন করিয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞে বিভিন্ন দেশাগত রাজাদের যে অজস্র বহু মূল্য উপহার দ্রব্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের যে উজ্জ্বল ও সুন্দর রাজ সভার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যে অসীম সম্মান ও প্রতিপত্তির পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং সামগ্রিকভাবে দুর্যোধন যে অপূর্ব রাজশ্রী দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়াছেন। ইতিপূর্বে আদিপর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজ ঐশ্বর্যের ও আড়ম্বরের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সমস্ত ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর ম্লান করিয়া দ্রৌপদীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বতন এই স্মৃতি, দ্রৌপদীকে প্রাপ্তির আকাঙ্খা ও ব্যর্থতা, পরবর্তীকালে রাজসূয় যজ্ঞের বিপুল ঐশ্বর্য সমারোহের সহিত যুক্ত হইয়া দুর্যোধনকে কামনার জ্বালায় অস্থির করিয়াছে। এই কামনা এত তীব্র যে ইহাতে ন্যায়-অন্যায় সমস্ত বোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। ভোগের আকাঙ্খার সহিত যুক্ত হইয়াছে অপমানের জ্বালা। শৈশব হইতে ভীমের নিগ্রহ, অস্ত্র-শিক্ষায় অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব, পৌরজনের পাণ্ডবগণকে প্রশংসা, স্বয়ম্বর রাজসভার ব্যর্থতার বেদনা, রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় ঐশ্বর্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি, যুধিষ্ঠিরের রাজ সভায় দুর্যোধনাদির বিভ্রান্তিকর অপমানিত অবস্থা, সমস্ত প্রকাশিত হইয়া কৌরবদের অধীর করিয়াছে। এই সমস্ত জ্বালা পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে। সুতরাং এই সংগ্রামের অন্তঃস্থিত কারণ রূপে ভোগের আকাঙ্খা এবং অপমানের জ্বালা উভয়ই বিদ্যমান। অপমানের বেদনা প্রকাশ করিবার জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, তাহাতে সৃজিত হইয়াছে বীর রস। আর কাম্যবস্তুর জন্য যে আকাঙ্খা, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে শৃঙ্গার রস। বস্তুতঃ ইহাকে বলা যাইতে পারে মূল রস। কারণ কাম্যবস্তু যদি যথোপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, তাহাও প্রবল হইবে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে অসংখ্য বীর ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে, সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যেমন প্রবল ঠিক তেমনই কাম্য বস্তুও মনোহারী এবং তদুপযুক্ত চিত্তাকর্ষক। তাই বীর রস যত প্রবল সেই রস উদ্রেককারী শৃঙ্গার রসও প্রায় ততখানিই প্রবল।

কিন্তু কোনও রসেরই অবতারণা যান্ত্রিক ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহার জন্য যেমন ক্রম পরিণতির প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন পটভূমির বা প্রস্তুতির। পটভূমি রূপে এবং অনুষঙ্গ রূপে অসংখ্য শাখা কাহিনী রহিয়াছে। এই সকল কাহিনী মূল কাহিনীর রসকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করিয়াছে, প্রথমে আদিপর্বে দেখা যায় দুই রসই প্রবল কিন্তু ক্রমশঃ শৃঙ্গার রসের উপর বীর রসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আদিপর্বে আদি রসাত্মক কাহিনীর যে বহুল উল্লেখ দেখা যায় তাহা ক্রমশঃ স্বল্প হইয়াছে। সভা-পর্বে শাখা কাহিনী প্রায় নাই, মূল কাহিনীতে শৃঙ্গার ও বীর রস উভয়ের সন্ধান পাওয়া

যাইলেও বীর রস ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বনপর্বে আদি রসাত্মক শাখা কাহিনী থাকিলেও বিরাটপর্ব হইতেই বীর রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিপূর্বেই বিবৃত হইয়াছে বীর রস উদ্রেক করিবার জন্য আদিপর্বে আদি রসাত্মক কাহিনীর অজস্র সমাবেশ করা হইয়াছে। সেইজন্য আদিপর্বে উপরিচর রাজার কাহিনী, পরাশর ও সত্যবতীর কাহিনী, দুষ্মন্ত শকুন্তলা এবং বিশ্বামিত্র মেনকার কাহিনী, কচ দেবযানী ও যযাতি শর্মিষ্ঠার কাহিনী, কর্ণের জন্ম রহস্য প্রভৃতি অসংখ্য আদি রসাত্মক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। কবি কাশীরামদাসের রচনাতেও এই সকল কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সেইজন্য এই সকল কাহিনীতে শৃঙ্গার রসের যে সন্ধান পাওয়া যায় সংস্কৃত মহাভারতে, কবির রচনাতেও তাহার আংশিক আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণনার ও উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে সংস্কৃত মহাভারতে ইহা যতখানি প্রবল কবির রচনায় তাহা সেরূপ নহে। সংস্কৃত মহাভারতে কাহিনীর বর্ণনা প্রায়শঃ বিশদ, বাস্তব ও উজ্জ্বল। অনেক সময়ই দেখা যায় যে এই সকল কাহিনীতে ভাব রসে পরিণত হয় নাই। কামোদ্দীপক উজ্জ্বল বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশ্বামিত্র মেনকার কাহিনী হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল। বিশ্বামিত্রের প্রচণ্ড তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করেন। মেনকার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য ইন্দ্র বায়ুকে আদেশ করেন। মেনকা ও বায়ু বিশ্বামিত্রের তপোবনে গিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করেন। সংস্কৃত মহাভারত হইতে এই সময়ের বর্ণনা উৎকলিত হইল। "তখন মেনকা বায়ুর সহিত বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রস্থান করিল। তদনন্তর সুন্দর নিতম্বা মেনকা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভয়চকিতচিত্তে দেখিল—তপস্যার প্রভাবে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকিলেও বিশ্বামিত্র সেই তপস্যাই করিতেছেন। তাহার পর সে বিশ্বামিত্রকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বস্ত্রখানি চন্দ্র কিরণের ন্যায় সূক্ষ্ম ও শুভ্র বর্ণ ছিল। বায়ু তাহা অপহরণ করিলেন; তখন সে লজ্জা বশতঃ বায়ুকে যেন নিন্দা করিতে থাকিল; এদিকে বিশ্বামিত্র তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, তথাপি সে সেই কাপড়খানি লইবার জন্য তাড়াতাড়ি বিশ্বামিত্রের নিকট গেল। তখন বিশ্বামিত্র দেখিলেন মেনকা একেবারে উলঙ্গ হইয়া পড়ায় তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। তাহার যৌবনোচিত রূপের নিরূপণ করা যাইতেছে না, কোন অঙ্গেরই নিন্দা করা চলে না এবং সে যেন সেই কাপড়খানি লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ও সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বামিত্র তাহার রূপের উৎকর্ষ দেখিয়া কামাতুর হইয়া তখনই তাহার সহিত রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন" (আদি ৮৬।১—৭)।

এই জাতীয় কাহিনীতে যে শৃঙ্গার রস সৃজিত হইয়াছে তাহা মূল কাহিনীর দ্রৌপদী ও রাজ ঐশ্বর্যকে কেন্দ্র করিয়া সৃজিত রসকে পরিপুষ্ট ও বহুলাংশে পরিবর্ধিত করিয়াছে। এই রসও যত প্রবল হইয়াছে, ইহা বীর রসকেও ততখানি প্রবল করিয়াছে। বস্তুতঃ আদি রসাত্মক-কাহিনীর মধ্যেও বীর রসের আকস্মিক প্রবল দ্যুতি আসিয়া ইহার পৃথক আস্বাদ দান করিয়াছে এবং কামনার মনোহর রঙীন জগতের মধ্যে ইহাকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বীর্যবত্তার ও পৌরুষের মহিমময় জগতের দিকে আহ্বান করিয়াছে। ইহার জন্য দেখা যায় শান্তনু সত্যবতীর কাহিনীতে যখন সত্যবতীর প্রতি শান্তনুর অসীম ভালোবাসায় পাঠক চিত্ত বিভোর সেই সময় কাহিনী

এমন একটি গতি লাভ করিয়াছে যেখানে সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম নিজ সংকল্পের অবিচলিত দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করিতে পারে, জল আপন রস ত্যাগ করিতে পারে, তেজ নিজের রূপ ত্যাগ করিতে পারে, এবং বায়ু আপন স্পর্শগুণ ত্যাগ করিতে পারে, এবং সূর্য্য আলোক ত্যাগ করিতে পারেন. অগ্নি উষ্ণতা ত্যাগ করিতে পারে, এবং চন্দ্র শীতরশ্মিতা ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু আমি কোন প্রকারেই সত্য ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।" (আদি ৯৭।১৭-১৯) দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কাহিনীতেও এইরূপ দেখা যায়। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে রোম্যান্টিক প্রেমের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বীর রসের দ্যোতনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। রাজসভায় শকুন্তলা দুষ্মন্ত সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্মন্ত যখন সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তখন প্রত্যাখ্যাত রমণী তীব্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করিয়াছেন—"দুষ্মন্ত তোমা ব্যতীতও আমার পুত্র হিমালয় অলংকৃত চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবী শাসন করিবে।" (আদি ৮৮।১০৮)।

কবি কাশীরামদাসের রচনায় এই সকল কাহিনী গতানুগতিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গল্পের আকর্ষণ থাকিলেও এই সকল কাহিনীর অবতারণায় সংস্কৃত মহাভারতের রস নিষ্পত্তি হয় নাই। সংস্কৃত মহাভারতে এই রূপে প্রায় সর্বত্রই বীর রসের অবতারণা করা হইয়াছে। অত্যন্ত সামান্য অবকাশেও বর্ণনার কৌশলে, প্রকাশের মহিমায় কাহিনী কিরূপ বীর রস মণ্ডিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করার মত। মূল কাহিনীতে যেখানে কাম্য বস্তু অতীব চিত্তাকর্ষক সেখানে সেই কাম্য বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হইবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যে অংশে এই অবকাশ বিশেষ নাই সেখানেও কিরূপ বীর রসের অবতারণা করা হইয়াছে গরুড়ের স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়নের কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যাইবে। সংস্কৃত মহাভারত যে কোন সুরে বাঁধা ছিল তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এই কাহিনীতে সংস্কৃত মহাভারতে গরুড় স্তব বর্ণিত হইয়াছে। এই স্তবের মধ্যে তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ প্রকাশিত হইয়াছে—"আপনি ঋষি, আপনি মহাভাগ্যবান, আপনি দেবতা, আপনি পক্ষিরাজ, আপনি সর্বশক্তিমান, আপনি তাপদেবতা সূর্য এবং আপনিই উত্তমস্থান দক্ষ। আপনি ইন্দ্র. আপনি বিষ্ণু, আপনি মহাদেব, আপনি জগদীশ্বর, আপনি পক্ষিগণের অগ্রগণ্য, আপনি ব্রহ্ম, আপনি ব্রাহ্মণ. আপনিই অগ্নি ও বায়ু! হে জগদীশ্বর! আপনি পক্ষীর রাজা আপনার প্রভাব ও শক্তি অসাধারণ এবং তেজ, অগ্নি ও বিদ্যুতের তুল্য আপনাতে তমোগুণ নাই, আপনি মেঘের সন্নিহিত আকাশচারী, এবং আপনি উৎকৃষ্ট বটেন নিকৃষ্টও বটেন, আপনি বরদান করিতে সমর্থ, আর আপনার বিক্রমকে কেহই জয় করিতে পারে না। এই সকল কারণে আমরা আপনার নিকট সমবেত হইয়াছি। তপ্ত সুবর্ণের তুল্য আপনার এই তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত হইয়াছে, অতএব আপনি সমস্ত দেবগণকে রক্ষা করুন।" (আদি ১৯।১৫-১৬, ২২, ২৩) গরুড়ের এই স্তুতিতে তাঁহার মহিমময় বিরাট রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই রূপের বর্ণনা সমাপ্ত হইয়াছে এই কথা বলিয়া যে তিনি সর্বজয়ী, তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত।

ইহার পরবর্তী অংশে গরুড়ের প্রতাপের কথা বর্ণিত হইয়াছে। গরুড় যখন অমৃত আনয়নে স্বর্গে যাত্রা করিয়াছেন তখন তাঁহার আগমন সংবাদে স্বর্গে যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে গরুড়ের প্রতাপ প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"তাহার পর দেবগণের ভয়সূচক নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ হইল, ইন্দ্রের প্রিয়তম বজ্র ভয়ে তেজ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। দিনের বেলায়ই ধূম ও শিখার সহিত বহুতম উল্কা আকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল।... ... . দেবগণের মালা মলিন হইয়া গেল, তাঁহাদের তেজ নষ্ট হইল, ভয়ংকর উৎপাতিক মেঘসকল রক্তবৃষ্টি করিল এবং ধূলি উঠিয়া দেবগণের মুকুট আবৃত করিল।" (আদি ২৫।৩২-৩৭) স্বভাবতঃই অমৃত রক্ষার্থ স্বর্গেতেও প্রস্তুতি সাধিত হইয়াছে। সে প্রস্তুতি বর্ণিত হইয়াছে আদি ২৫।৪৫-৪৬ শ্লোকে—"দেবগণ সেই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অমৃত রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন অবলম্বন করিয়া অমৃত ভাণ্ডকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। প্রতাপশালী ইন্দ্রও বজ্র ধারণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিলেন। বুদ্ধিমান পাপশূন্য প্রধান প্রধান দেবগণ দিব্য অলংকারে অলংকৃত হইয়া, বৈদূর্য্যমণি খচিত মহামূল্য আশ্চর্য স্বর্ণময় কবচ এবং উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় চর্মময় কবচ গাত্রে ধারণ করিয়া এবং ভয়ংকর নানাবিধ সুধার অস্ত্র উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। আবার কোন কোন দেবতা চক্রধারণ করিয়া রহিলেন, সে চক্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। কেহ পরিঘ, কেহ ত্রিশূল, কেহ পরশু, কেহ কেহ নানাবিধ শক্তি, কেহ কেহ নির্মল তরবারি এবং কেহ কেহ ভয়ংকর গদা আপন পরিমাণ অনুসারে ধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সকল অস্ত্রের দীপ্তিতে তাঁহারাও দীপ্তিমান হইলেন।" (আদি ২৫।৪৫-৪৬) এইরূপে বীর্যবত্তা ও শক্তিমত্তা প্রকাশিত হইয়াছে, উৎসাহ ও উদ্দীপনার চরমভাব প্রকাশ করা হইয়াছে, যাহা বীর রসে পরিণতি লাভ করিয়াছে। অজস্র কাহিনী সৃজিত এই রসধারা ইহাকে ক্রম-বর্ধিত করিয়াছে।

আদিপর্বে এই জাতীয় কাহিনী সৃজিত রসধারার পটভূমিতে আসিয়াছে সভাপর্বে দ্রৌপদীর নির্যাতন। দ্রৌপদীর ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীর নির্যাতনের মধ্যে মধুর রসের সহিত করুণ রসের এক অপূর্ব সমন্বয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে তেজস্বিনী নারী কণ্ঠের দৃপ্ত বাণী বীর রসের উজ্জ্বলতা সঞ্চার করিয়াছে, এবং সবশেষে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিকার করিবার জন্য ভীমের বজ্র কণ্ঠের প্রতিজ্ঞাবাণী বীর রসের প্রচণ্ড দ্যুতি প্রকাশ করিয়াছে। সভাপর্বে বীররসের এই অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির পর বনপর্বে পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত শান্ত আবহাওয়া কিন্তু তাহার মধ্যেও দুর্যোধনের সহিত গন্ধর্ব-দিগের যুদ্ধ, অর্জুনের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ, অর্জুনের সপ্তস্বর্গ যাত্রা প্রভৃতি যুদ্ধ বর্ণনা আছে। বনপর্বের পর বিরাটপর্বেও কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কুরুক্ষেত্র সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু বিরাটপর্বে সর্বাধিক জাজ্বল্যমান—কীচক হস্তে নিগৃহীতা দ্রৌপদীর তেজস্বিনী মূর্তি। বি ১৫।১৭-২৪ শ্লোকে দ্রৌপদীর দৃপ্তবাণী এবং অবিস্মরণীয় মূর্তি প্রকাশ করে যে তিনি অগ্নিসম্ভবা। এই চিত্রের সহিত উদ্যোগপর্বে দ্রৌপদীর আরও একটি চিত্র একই সঙ্গে মানসপটে জাগ্রত হয়। কৌরব

সভায় শান্তি স্থাপনে যাত্রার পূর্বে কৃষ্ণ যখন দ্রৌপদীর অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন, তখন দ্রৌপদীর যে রূপ সংস্কৃত মহাভারতে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাও অনন্য। অপমানের পূর্ব স্মৃতিতে, স্বামীদের প্রতি অভিমানে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী আপন দীর্ঘ বেণী করপদ্মে ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণের নিকট বলিয়াছেন কৌরব সভায় গমন করিয়া শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা করিবার সময় তিনি যেন দ্রৌপদীর এই বেণী স্মরণ করেন। দুঃশাসনের করস্পর্শে যে বেণী সেদিন আকুলিত হইয়াছিল, তাহা দ্রৌপদী দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর বন্ধন করেন নাই। যতদিন না তাঁহার এই অপমানের প্রতিকার হয়, দুঃশাসন তাহার কৃতকর্মের জন্য যতদিন শাস্তি না পায় ততদিন এই বেণী তিনি বন্ধন করিবেন না ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাঁহার সেই অপমানের প্রতিকার হয় নাই। অন্তরে সেই বেদনা এখনও প্রথম দিনের মতই প্রবল, অথচ তাঁহার স্বামীগণ সন্ধি স্থাপনে সম্মত হইয়াছেন। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলিয়াছেন, যে তাঁহার সম্মান রক্ষার্থে তাঁহার পঞ্চপুত্র যুদ্ধ করিবে, প্রয়োজন হইলে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা অস্ত্রধারণ করিবেন, সুতরাং কোন মতেই যেন কৃষ্ণ সন্ধি স্থাপন না করেন।

এইরূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব সাধিত হইয়াছে। আদি ও বীর রসের মধ্যে বীর রস ক্রমশঃ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন অংশে করুণ ও রৌদ্ররসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষ ভাবে যে সকল অংশে দ্রৌপদীর বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে সেখানে করুণরসের স্পর্শ লাগিয়াছে। কিন্তু ইহা কোন সময়েই প্রাধান্য লাভ করে নাই। চোখের জল বীর্যের তাপে তপ্ত হইয়াছে এবং শীঘ্রই দেখা গিয়াছে যে নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইয়াছিল সেখানে শুষ্ক অশ্রুরেখার সন্ধান পাওয়া যাইলেও তেজের অনল বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

সংস্কৃত মহাভারতের রসধারার ইহা সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে যখন কবি কাশীরামদাসের মহাভারতের বিচার করা যায় তখন দেখা যায় দুইটি গ্রন্থ দুই ভিন্ন সুরে বাঁধা। সংস্কৃত মহাভারতের মূল ঘটনাবলী এখানেও বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের রসাভিব্যক্তি পৃথক। সংস্কৃত মহাভারতে বিরাটপর্ব পর্যন্ত অংশে যেমন বীর রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে এখানে হইয়াছে ভক্তি রস। যুগ প্রভাবে বাংলা দেশে ভক্তিরসের প্লাবন বহিয়াছিল। বাঙ্গালী চিত্তে অন্যান্য সকল দেবদেবী আসন গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুগভীর। সেইজন্য মহাভারত মহাকাব্যে কৃষ্ণের যে ভূমিকা আছে তাহা আশ্রয় করিয়া কবি কাশীরামদাস কৃষ্ণকথা রচনা করিয়াছিলেন। ফলে যুগপ্রভাবে কবির রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের মূল প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত মহাভারতের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, শক্তি ও বীর্য, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিজয় লাভ ছিল প্রধান কথা। কবির রচনায় তাহা ভক্তি, ভালোবাসা ও আত্মনিবেদনে পরিণত হইল। সেইজন্য কৃষ্ণ হইলেন দয়ার সাগর, ভক্তের ভগবান। তাঁহার অসীম মাহাত্ম্যে তিনি শরণাগত দীনাতিদীন অসহায় ভক্ত পাণ্ডবগণকে পরিত্রাণ করিয়াছেন। কবির রচিত মহাভারতে এই কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে লক্ষ্যাবিদ্ধ করার যন্ত্রে ছিদ্রপথ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দ্রোণ ও কর্ণ যখন লক্ষ্যাবিদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন তখন এই জন্য তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছেন। কৃষ্ণ এইরূপে

কাহিনী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবদের সহায়তা করিয়াছেন। লক্ষ্য বিদ্ধ করার পর যখন সমবেত রাজাগণের সহিত সংগ্রাম আসন্ন হইয়াছে তখন কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছেন যদি তিনি অর্জুনের কোনও অমঙ্গল দর্শন করেন তাহা হইলে স্বয়ং তাহার সাহায্যে অবতীর্ণ হইবেন। সভাপর্বে চরম নির্যাতনের সময় নারায়ণ অলক্ষিতে থাকিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কৃষ্ণের নির্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মহিমায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ বিরল মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ভক্তির আধিক্য বশতঃ অত্যুক্তি ও অস্বাভাবিক ঘটনা সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত দেবতা রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণব জনোচিত বিনয়ে বিনম্র হইয়া মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়াছেন। এমন কি ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভগবৎ মহিমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ভক্তের চরণে প্রণাম জানাইয়াছেন। বনপর্বে দুর্যোধন চক্রান্তে দুর্বাসা মুনির আগমনে যখন পাণ্ডবগণ আসন্ন সর্বনাশের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখন কৃষ্ণ ভক্তবৎসলতার পরিচয় দিয়া পাণ্ডবগণকে পরিত্রাণ করিয়াছেন। এই সকল কাহিনীর গতানুগতিক বর্ণনাই নহে, ইহাদের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং যেরূপে তাহাদের প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে এই সকল কাহিনীর মধ্যে প্রবল ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে অভিব্যক্ত ভক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে যেমন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অসহায় কামনা ও ভগবানের প্রতি মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনই আবার রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি, জগৎ স্রষ্টা, জগৎ নিয়ন্তা পৌরাণিক এই চেতনার ধারায় তাঁহার বন্দনা রচিত হইয়াছে, এবং সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের অহৈতুক কৃপায় সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ভগবৎ বন্দনায় প্রায়শঃই বিবৃত হইয়াছে—

"তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল, তুমি সর্বব্যাপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগদ্ব্যাপী॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি, সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর॥
তোমার বিশাল সৃষ্টি এই ত্রিভুবন।
স্থানে স্থানে সকলি তোমার নিযোজন॥
ইন্দ্রে স্বর্গ দিলা, যমে সংযমমনীপুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর॥
জলমধ্যে আমারে করিয়া দিলা স্থিতি।
তোমার আজ্ঞায় করি যে বসতি॥"

(নারায়ণের প্রতি বরুণের উক্তি পৃঃ ১৪)

এই ভগবানের নিকট দুঃখে বিপদে অসহায় পাণ্ডবগণ বারংবার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। সভাপর্বে চরম নির্যাতনের সময় দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

"ওহে প্রভু কৃপা সিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।

হেথায় সভার মাঝে ইথে নিবারিতে সাজে
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ॥
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি সংহৃত করিতে ঋষ্টি
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণছায়া স্মরিয়া সঁপিনু কায়া
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষদন্তী খরক্রোধে ভুজঙ্গ দন্তীর পদে
সেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণযুগে দ্রৌপদী শরণ মাগে
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥" পৃঃ ৪০৫

এইরূপে কারণে অকারণে কৃষ্ণের ও ভগবানের চরণে শরণ লওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে যখন স্বয়ম্বর সভায় সমবেত রাজাগণের সহিত অর্জুনেব সংগ্রাম হইযাছিল সেই সময় দ্রৌপদী তাঁহার আত্মীয় স্বজনদেব জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া ক্রন্দন কবিযাছিলেন। পার্থ তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—

" .. . কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয় পংকজ হয় গোবিন্দের পাদ ॥
এ মহা বিপদ সিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দকে স্মরণ কবহ যাজ্ঞ সেনী ॥" পৃঃ ২৩৫

ইহার পর কবি বলিয়াছেন—

"অর্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ বিপদ হন্তা সবাকার তাত ॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেনজন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥" পৃঃ ২৩৫

এই সকল অংশে যেমন হৈতুকী ভক্তির প্রকাশ দেখা গিয়াছে তেমনই তদানীন্তন যুগ প্রভাব সঞ্জাত রাগানুগা ভক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। ভক্তির অন্যতম লক্ষণের কথা নারদের ভক্তি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে কাহারও প্রতি পরম প্রেমের ভাবকে ভক্তি বলে। এই প্রেমের ভাবও প্রকাশিত হইয়াছে কবির রচনায়। পঞ্চপাণ্ডব যেমন দুঃখ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্খায় বারংবার কৃষ্ণের নিকট স্তুতি জানাইয়াছেন তেমনই আবার জীবনের সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

"সংসারে আছেন যত পুণ্যবান জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
সে সব ভক্তের পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্খায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজী।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি ॥" পৃঃ ৩৭৪

যুধিষ্ঠির পার্থিব ধন সম্পদ চাহেন না, তাঁহার একমাত্র কামনা ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি। নব সংযোজিত কাহিনী সত্যভামার ব্রত পালনের মধ্যেও এই গভীর ভক্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। পার্থিব ঐশ্বর্য অথবা স্বর্গীয় পুণ্যফল কোন কিছুই কাম্য নহে, কাম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণ।

কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর ভক্তি ঈষৎ বক্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কবির বর্ণিত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার সূচনায়। স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণ যখন পাঞ্চজন্যের শুভ শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন তখন কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধ বলিয়াছেন—

"সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
দ্রুপদ বরণ করে তাই সে ইহারে।
বাদ্যকারগণ সহ শঙ্খ বাজাবারে ॥" পৃঃ ২০৭

যদিও কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধ এইরূপ উক্তি করিয়াছে তথাপি ইহা কৃষ্ণ নিন্দা নহে। গভীর কৃষ্ণ-ভক্তি এইরূপ প্রকাশ বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে। প্রকাশের এই বৈচিত্র্যে কবি মহাদেবের কামনাতুর পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন অমৃতমন্থন কাহিনীতে। মোহিনীরূপী নারায়ণকে লাভ করিবার জন্য মহাদেব যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা কবির ব্যাজ-স্তুতির অনুরূপ।

ভগবানের প্রতি ভক্তের গভীর ভক্তি যেমন কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তেমনই ভগবানেরও পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। মোহিনীরূপী নারায়ণ মহাদেবকে অভয়দান করিয়া বলিয়াছেন—

"নাহি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয়।
মোর ভক্তজনে আমি দিই যে অভয় ॥" পৃঃ ২৪

স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছেন—

" ... ... অন্যায় করিলে দুষ্টগণ।
তুমি আমি আছি হেথা কিসের কারণ ॥
মম বিদ্যমানে হেন করে অত্যাচার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্বলের বল আমি সর্ব ফল দাতা ॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধারব ॥" পৃঃ ২২১

কবির রচনায় এই ভক্ত ও ভগবানের কথা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া প্রধান হইয়াছে ভক্তি রস।

কবি কাশীরামদাসের রচনায় ভক্তিরসের সহিত আরও একটি রসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাহা হইল মধুর বা শৃঙ্গার রস। শৃঙ্গার রসাত্মক যেসকল কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, কবিও সেগুলি বিবৃত করায় সেখানে শৃঙ্গার রসের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে কবির রচনায় বর্ণনা ও উপস্থাপনা সংস্কৃত মহাভারতের অনুরূপ না হওয়ায় রসাভিব্যক্তি তেমন প্রবল নয়। কিন্তু অন্য একটি ক্ষেত্রে কবি রচনার নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা মধুর রূপের বর্ণনায়। কবির রচনায় প্রায়শঃই মধুর রূপের

বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ নারী রূপের বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত, তাঁহার দক্ষতা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। প্রায়শঃ এই জাতীয় বর্ণনার সমাবেশ করা হইয়াছে কিন্তু রচনার গুণে ইহা ক্লান্তিকর হয় নাই বরং মধুর রসের সঞ্চারে সমস্ত রচনা মনোহর হইয়াছে।

ভক্তি ও মধুর রসের সহিত করুণ রসের সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত মহাভারতের প্রথমাংশেও ইহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহা কোন সময়ই প্রধান বা প্রবল হইয়া উঠে নাই। ইহার ক্ষণিক অবতারণার পরই রৌদ্র ও বীররসের দ্যোতনা আসিয়াছে। করুণ রস সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম অংশে প্রবল হইলে বীর রসের অমিতদ্যুতি সৃজন করা সম্ভব হইত না। কিন্তু কবি কাশীরামদাসের রচনায় বীর রস প্রায় নাই বলিয়া বাঙ্গালীর কোমল প্রকৃতির জন্য করুণ রস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষভাবে ভক্তিরসের বিকাশে ভক্তের বিনীত আত্মনিবেদনের জন্য, তাহার দীনাতিদীন পরিচয় প্রকাশ করিবার ও তাহার অসহায় আকুলতা জ্ঞাপন করিবার জন্য, এবং সকলের সহানুভূতি ও কৃপা আকর্ষণ করিবার জন্য, করুণ রসের অবতারণা বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। তাই কবির রচনায় কারণে ও অকারণে অশ্রুর প্লাবন বহিয়াছে। স্বয়ম্বর সভার সময় যখন কৃষ্ণ-বলরাম কুন্তীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন তখন কুন্তীর বাক্যে ও আচরণে অসহায় দীন-দুঃখীর ভাব পাঠক চিত্তকে করুণায় আর্দ্র করিয়াছে। কুন্তীর ক্রন্দন উতরোল হইয়াছে যখন পঞ্চপুত্র বনগমন করিয়াছেন। তখন কেবল আত্মীয়রাই নহে আপামর জনসাধারণ সকলেই ক্রন্দনে আকুল হইয়াছে। দ্রৌপদীর আচার ও আচরণে যে অসাহায়া নারীর সুতীব্র বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চরিত্র আলোচনার সময় বিশেষভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পাণ্ডবদের অসহায়তা এবং প্রবল কৌরবদের অত্যাচার প্রকাশ করায় সমস্ত কাহিনী একটি করুণভাবে মণ্ডিত হইয়াছে।

কবির রচনায় সংস্কৃত মহাভারতে যাহার কোন অস্তিত্ব নাই এরূপ একটি নূতন রসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা হইল হাস্যরস। সংস্কৃত মহাভারত এমন একটি ভাবগম্ভীর মহিমময় জগতের কথা প্রকাশ করিয়াছে যে সেখানে হাস্যরসের অবতারণা রসাভাস সৃষ্টি করিত। কিন্তু কবির রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের সেই জগৎটি পরিবর্তিত হইয়া আমাদের পরিচিত লৌকিক জগৎ আত্মপ্রকাশ করায় হাস্যরসের অবতারণা করা সম্ভব হইয়াছে। বিশেষভাবে কাহিনীকে সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করিবার জন্য কবি এই রসের অবতারণা করিয়াছেন। বিপরীত,বস্তুর সমাবেশে আমাদের চিত্তে হাস্যের উদ্রেক হয়। কবি সেই বিপরীত বস্তুর সংস্থাপন করিয়াছেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, দ্রৌপদীকে দর্শন করিয়া রাজাগণের প্রতিক্রিয়া বর্ণনায়। এখানে রাজাগণের যে অরাজকীয় আচরণের তিনি বর্ণনা দান করিয়াছেন তাহা পাঠকচিত্তে গভীর হাস্যের উদ্রেক করে। শচী ও সত্যভামার কলহে, মোহিনীরূপী নারায়ণের প্রতি কামনাতুর মহাদেবের উক্তিতে, দেবদেবীর অদৈবী আচরণও সেইরূপ হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। সুভদ্রা ও অর্জুনের সরস কথোপকথন স্মিত হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিপূর্বে কাহিনীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় ইহাদের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল অংশের জন্য কবির রচনা সংস্কৃত মহাভারত হইতে পৃথক প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। আধার এক হইলেও আধেয়ের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, একই কাহিনীর মধ্যে পৃথক রস অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আঙ্গিক বিচার

সাহিত্যে ভাব ও রূপ দেহ ও আত্মার ন্যায় অভিন্ন। ভাব ব্যতীত রূপের বিচার হইতে পারে না। অন্তঃস্থিত ভাবের উপর বাহ্য দেহের রূপের পরিবর্তন ঘটে। ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি কবি কাশীরামদাসের রচনা সংস্কৃত মহাভারতের তুলনায় পৃথক প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে আর্যবীর চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা মহাকাব্যোচিত মহিমায় ও ভাবগাম্ভীর্যে প্রকাশিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কবি কাশীরামদাসের রচনায় একই কাহিনীর আধারে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য কথা বিবৃত হইয়াছে। একটিতে মহাকাব্যের মহিমা, অপূর্ব শৌর্য ও বীর্য, বীর ও করুণ রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে এবং অপরটিতে শরণাগতকে সর্ববিপদ হইতে পরিত্রাণ করার অপূর্ব ভগবদ্‌মহিমা ও ভক্তের আত্মনিবেদনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই ভাব কাব্যদেহে পৃথক রূপের মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

সংস্কৃত মহাভারতে যে সকল ক্ষাত্র নরনারীদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা পরিচিত সাধারণ জগতের মানব-মানবী নহেন। তাহাদের হৃদয়ানুভূতি যেমন প্রবল তেমনই যে ঘটনা প্রবাহে তাহাদের হৃদয় আন্দোলিত হয় তাহাও তেমনই বিশাল ও কার্যকারণ যোগে সংযুক্ত। ঘটনার এই বিশালতা ও মহিমা মহাকাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই বিশালতা ও মহিমা প্রকাশ সাপেক্ষ। সংস্কৃত মহাভারতে উপযুক্ত বর্ণনার সাহায্যে ইহা সাধিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে রাজকীয় জীবনযাত্রার বৈশিষ্টসমূহ এই বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। এই জীবন যাত্রার ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর, কাহিনীর মধ্যে বর্ণাঢ্য উজ্জলতা সঞ্চার করিয়াছে, একটি গুরুগম্ভীর মহিমা বিস্তার করিয়াছে, ঘটনার উপযুক্ত পটভূমি ও কার্যকারণ যোগ রচনা করিয়াছে এবং মহাকাব্যের রসপরিণতিতে সাহায্য করিয়াছে। কবি কাশীরামদাস কাহিনীর গল্পাংশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, অন্যান্য বৈশিষ্ট সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিলেন না। তাঁহার পাঠক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষেও সাহিত্যের উন্নততর রস আস্বাদন করা সম্ভব নাও হইতে পারে বিবেচনা করিয়া এই সকল বর্ণনার অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়াছেন। অথচ সংস্কৃত মহাভারতে এই সকল বর্ণনা কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিম্নের আলোচনায় বোঝা যাইবে।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজমহিমা, তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের মহিমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই যজ্ঞের মহিমা সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে বহু পরাক্রান্ত নরপতি সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচর্যার জন্য যে বিশদ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

"মহারাজ ! রাজকর্মচারীরা ধর্মরাজের আদেশ অনুসারে, তাঁহাদের বাসগৃহ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সে সকল গৃহে নানাবিধ খাদ্য ছিল এবং তাহার নিকট দীর্ঘ ও সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ ছিল। আর যুধিষ্ঠির সেই সকল রাজার উপযুক্ত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। রাজকর্মচারীরা বাসভবন নির্মিত করিয়া দিলে রাজারা আদৃত ও অভ্যর্থিত হইয়া সেই সকল ভবনে গমন করিলেন। সেই সকল ভবনগুলি কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, মনোহর, সুন্দর, অলংকৃত, সুনির্মিত, শুভ্রবর্ণ, উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সকল দিক পরিবেষ্টিত, সোনার ঝালরে পরিবৃত এবং মণিময় গদি দ্বারা শোভিত ছিল। আর সেই বাড়ীগুলির সিঁড়ি দিয়া সুখে আরোহণ করা যাইত। সেগুলির ভিতর উৎকৃষ্ট আসন ও পরিচ্ছদ ছিল। উপরিভাগ পুষ্পমাল্যে আবৃত ছিল। অগুরুর মনোহর সৌরভ বাহির হইতেছিল এবং সেই বাড়ীগুলির বর্ণ হংস এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ছিল। আর সে বাড়ীগুলি এক যোজনের পথ হইতে অনায়াসে দেখা যাইত। তাহারা পরস্পর সংলগ্ন ছিল না, আর সেগুলির দ্বারসমূহ পরস্পর সমানুপাতে নির্মিত ছিল এবং নানাগুণে ভূষিত ছিল আর হিমালয়ের শৃঙ্গের ন্যায় সে বাড়ীগুলির অঙ্গ সকল ধাতুর দ্বারা বিচিত্র করা হইয়াছিল।" (সভা ৩৪।১৮-২২)

এই বর্ণনা পাঠ করিলে রাজন্যবর্গের জন্য নির্মিত সুন্দর হর্ম্যরাজি মানসপটে জাগ্রত হয়। এই সকল ভবনের যে সৌন্দর্য ও বিশদ ব্যবস্থা তাহা সমবেত নরপতিগণের মহিমা প্রকাশ করিয়াছে। ইহারা সকলে যে যজ্ঞে সমবেত হইয়াছেন সেই যজ্ঞ মহিমাও সেইরূপ। যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনাতেও এই মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনাতে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মার ভবনে দেবগণ ব্রহ্মার্ষিদের সহিত মিলিত হইয়া যেমন জল্পনা করেন, তেমন অসাধারণ তেজস্বী ঋষিরা কার্যের অবসর পাইয়া জল্পনা করিতে লাগিলেন যে ইহা এইরূপই হইবে কিন্তু ওইরূপ নহে, আর ইহা এইরূপ হইবে অন্যরূপ নহে। আবার কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ শাস্ত্রোক্ত যুক্তি দেখাইয়া সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তৃত এবং বিস্তৃত বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। শ্যেন পক্ষীরা যেমন আকাশগত মাংসখণ্ডকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ সেখানে বুদ্ধিমান কতকগুলি ব্রাহ্মণ অন্যোক্ত বিষয়কে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ নানারূপ করিতে লাগিলেন। মহাব্রতধারী ও সমস্ত বেদজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ কতকগুলি ব্রাহ্মণ সেখানে ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে নানাবিধ কথা বলিতে থাকিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। নক্ষত্রগণ দ্বারা নির্মল আকাশ যেমন শোভা পায় সেইরূপ বেদজ্ঞানসম্পন্ন ও দেবতার ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ ও মহর্ষিগণ দ্বারা সেই বেদীটি শোভা পাইতে লাগিল।" (সভা ৩৫।৩-৮) বর্তমান কালেও ক্রিয়া কর্মে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মতভেদ জনিত যে বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয় তাহার একটি বর্ণনা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকন্তু কয়েকটি বিশেষণ ও উপমার সাহায্যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মার ভবনে যেমন দেবগণ মিলিত হন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তেমনই ইহারা সমবেত হইয়াছিলেন এবং ইহাদের সমাগমে যজ্ঞবেদী নক্ষত্র খচিত নীলাকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। নক্ষত্র খচিত নীল আকাশের স্তব্ধ সুন্দর মহিমা এই বর্ণনার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অধিকন্তু তৎকালে যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রূপটিও পাঠকচিত্তে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই রূপ

পৃথক পৃথক বর্ণনার একত্রিত ফল মহাকাব্যের মহিমা রূপে প্রকাশিত হয়। কবি কাশীরামদাস এইগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের মত রাজসভার ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মধ্যেও মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজমহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসভার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার রাজসভার সহিত ইন্দ্র যম বরুণ ও ব্রহ্মার সভার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সভা ৩ ও সভা ৭—১১ অধ্যায়সমূহে। এই সকল বর্ণনার মধ্যে দুর্লভ ঐশ্বর্যের ও আড়ম্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। আপেক্ষিক বিচারে যুধিষ্ঠিরের রাজসভার মহিমা প্রকাশ করার পর, যে সকল স্থান হইতে তাঁহার রাজসভার উপকরণ আহৃত হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে কাহিনীর আভাস পাওয়া যায়। অধিকন্তু এই সকল বিবরণ কাহিনীর মধ্যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবে এবং সাধারণ পাঠক চিত্তে বিস্ময়রস সঞ্চার করিবে সেইজন্য সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়া কবি ইহার অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও দুইটি গ্রন্থের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, কবি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি গ্রন্থে দুই পৃথক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই বর্ণনার সমাবেশ করা হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে ইহা যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য মহিমা প্রকাশ করিয়াছে এবং কবির রচনাতে কাহিনীবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্মাণের জন্য যে উপকরণ আহৃত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"কৈলাস পর্বতের উত্তর দিকে মৈনাক পর্বতের সন্নিকটে স্বর্ণশৃঙ্গ অথচ মহা মণিময় বিশাল একটা পর্বত আছে। সে পর্বতে বিন্দুসর নামে সুন্দর এক সরোবর আছে এবং ভগীরথ রাজা গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুকাল সেখানে বাস করিয়াছিলেন। সে পর্বতে মহাত্মা ভূতনাথ মহাদেব শত শত এবং সহস্র সহস্র প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সে পর্বতে যজ্ঞস্থানে শোভার জন্য মণিময় স্তূপ এবং হিরন্ময় ও মণিময় চত্বর নির্মাণ করা হইয়াছিল। সে পর্বতে ইন্দ্র যজ্ঞ করিয়া দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সে পর্বতে মহাপ্রভাবশালী সনাতন ব্রহ্মা সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভূতেরা তাঁহার সেবা করিয়াছিল আর নর-নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম, রুদ্র ইহারা সহস্র যুগ পর্যন্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বর্ণমালাভূষিত বহুতর রূপ ও দীপ্তিশালী অনেক আয়তন দান করিয়াছিলেন। সেই পর্বতে যাইয়া ময়দানব গদা, শঙ্খ এবং অসুর রাজ বৃষপর্বার স্ফটিকময় দ্রব্যসকল গ্রহণ করিল। অসুরগণ কিংকর নামক রাক্ষস দ্বারা যে প্রচুর ধনরাশি রক্ষা করিতেছিল, ময়দানব সেখানে যাইয়া সে সকলই গ্রহণ করিল এবং তাহা আনিয়া ময়দানব ত্রিভুবন বিখ্যাত স্বর্গীয়মূর্তি, কল্যাণকারী, এবং মণিময়ী সেই নিরূপম সভা নির্মাণ করিল। আর সে সেই উৎকৃষ্ট গদাদি ভীমকে ও দেবদত্ত নামক শঙ্খটি অর্জুনকে সমর্পণ করিল। সেই শঙ্খের শব্দে সমস্ত প্রাণীই ভয়ে কম্পিত হইত।" (সভা ৩।৯-২০) রাজসভা বর্ণনার পূর্বে যথা হইতে ইহার উপকরণ আহৃত হইয়াছে তাহার বর্ণনায় ভূতনাথ মহাদেবের যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণের যজ্ঞ, যজ্ঞস্থানের মণিময় চত্বর, সুবর্ণময় মালিকা দ্বারা শোভনতা বৃদ্ধি, এবং মণিময়, কাঞ্চনময় ও স্ফটিকময় বিভিন্ন ধনরাশির উল্লেখে দুর্লভ ঐশ্বর্যের একটি অত্যুজ্জ্বল চিত্র

পাঠক চিত্তে প্রথমেই মুদ্রিত হয়। স্বভাবতই মনে হয় এই সকল দুর্লভ উপকরণ দ্বারা যে সভা নির্মিত হইবে তাহাও কত সুন্দর হইবে। কবি কাশীরামদাস যে এই অংশ কিরূপ বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে বোঝা যাইবে কিন্তু বিশ্বস্ত অনুসরণ সত্ত্বেও এবং সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত কয়েকটি অংশের উল্লেখ থাকিলেও সংস্কৃত মহাভারতের উজ্জ্বল বর্ণ সমারোহ যে সেখানে নাই তাহাও সহজে বোধগম্য হইবে। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মোর মনোমত সভা নহিল নির্মাণ ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে ॥
বৃষপর্বা নামে ছিল দানবের পতি।
চৌদিকে শাসিয়া তথা করিত বসতি ॥
করিলাম তার সভা পূর্বেতে নির্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান ॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা শাস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল ॥
কৌমোদকী গদাতুল্য পরম সুন্দর।
বিন্দু সরোবরে এক আছে গদাধর ॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব শোভা ধরে।
সেই গদা সাজিবেক বীর বৃকোদরে ॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ যে পাইল মনোহর ॥
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন ॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর গিয়া আমি আনিব সত্বরে ॥
অর্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে ॥
ইহা শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরে মৈনাক যথা রয় ॥
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
যথা করিলেন যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণযুত স্থানে না হয় বর্ণনা ॥

ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপম।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হইল দুই সহোদরে ॥" পৃঃ ৩১৯

কবি এখানে সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত বিন্দু সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন, ভূতনাথ মহাদেবের যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন এবং ভগীরথের ভাগীরথীর জন্য তপস্যার কথা বলিয়াছেন এবং কৌমাদকীগদা ও দেবদত্ত শঙ্খের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা মূল গ্রন্থের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ করে। বোঝা যায় কথকমুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই সকল অপেক্ষাকৃত গৌণ অথচ বিশেষ অংশের উল্লেখ সম্ভব নয়। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণ সত্ত্বেও কবি প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনার উজ্জ্বলতা যে নাই তাহাও সুস্পষ্ট। তথাপি ইহার মধ্যে কাহিনীর আভাস আছে বলিয়া কাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কবি ইহার বিবরণ দান করিয়াছেন। কিন্তু উভয় গ্রন্থের মধ্যে বর্ণনার পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়াছে পরবর্তী অংশে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা বর্ণনায়। এই বর্ণনা দান করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"কনক বৈদূর্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত স্ফটিক ও রৌপ্য চিত্রটাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণিহীরা।
সর্বগৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থান সব কৈল রত্ন ছেদি।
বিচিত্র রঞ্জন কৈল নানামত বেদি ॥
নানা জাতি বৃক্ষে সব ফুল ফল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
ভানু আর অগ্নিজিনি পূর্ণ চন্দ্র প্রভা।
সুরাসুরে অপূর্ব যে কৈল ময় সভা ॥
উচ্চ নীচ বুঝি ভ্রম করে বিজ্ঞলোকে।
বিশেষ বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥
এক মাসে সভা ময় করিয়া রচন।
করিলেক কুন্তীপুত্র প্রতি নিবেদন ॥" পৃঃ ২৬২

কবি কাশীরামদাসের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার তুলনায় সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনা কত বিশদ ও উজ্জ্বল তাহা দেখা যাইবে। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—"মহারাজ! যে সভাটি সকল দিকেই দশ হাজার হাত করিয়া বিস্তৃত ছিল এবং তাহার মধ্যে স্বর্ণময় অনেক বৃক্ষ ছিল। অগ্নি, সূর্য এবং চন্দ্রের সভা যেমন শোভা পাইয়া থাকে, সেই সভাটিও তেমন শোভা পাইতে থাকিয়া সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই দিব্য সভাটি আপন দীপ্তি দ্বারা সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকেও যেন প্রতিহত করিতে

থাকিয়া এবং নিজের অলৌকিক তেজে যেন জ্বলিতে থাকিয়া শোভা পাইত। অসুরদিগের বিশ্বকর্মা ময়দানব যে সভাটি নির্মাণ করিয়াছিল, দেবসভাও তাহার তুল্য ছিল না এবং ব্রহ্মার সভাও সেরূপ সুন্দর ছিল না। আকাশচারী ভয়ংকর আকৃতি বিশাল শরীর অত্যন্ত বলবান, রক্তনয়ন শুক্তিতুল্যবর্ণ এবং মহাযোদ্ধা কিংকর নামক আট হাজার রাক্ষস ময়দানবের আদেশে সেই সভাটিকে রক্ষা করিত এবং প্রয়োজন হইলে স্থানান্তরেও লইয়া যাইতে পারিত। ময়দানব সেই সভায় পদ্মময় অতুলনীয় একটি সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বহুতর স্বর্ণ পদ্ম ছিল, তাহার নালগুলি ছিল মণিময় এবং পাতাগুলি ছিল বৈদূর্য্যময়, আর স্বর্ণময় বহুতর সুগন্ধি উৎপল ছিল। সেগুলির নিকট নানাবিধ পক্ষী ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং স্বর্ণময় প্রস্ফুটিত পদ্ম মৎস্য ও কূর্মদ্বারা সে সরোবরটি বিচিত্রই হইয়াছিল। তাহাতে আশ্চর্য স্ফটিকময় সোপান এবং নির্মল জল ছিল, অল্প অল্প বায়ু আসিয়া তরঙ্গ তুলিত, তাহাতে পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দু ছড়াইয়া পড়িয়া মুক্তার ন্যায় শোভা পাইত এবং সেই সরোবরটির চারিটি তীরেই মহামণিশীলার দ্বারা বেদি নির্মাণ করিয়াছিল। মণি ও রত্নের দ্বারা জলের তলদেশ বদ্ধ ছিল। তাহার কিরণ আসিয়া জলের উপর ছড়াইয়া থাকিত, তাহাতে অনেক রাজা আসিয়া দেখিয়াও তাহা সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। তাই তাঁহারা জলে পড়িয়া যাইতেন। সেই সভাটির সকল দিকেই সর্বদা পুষ্প ও শীতল ছায়াযুক্ত এবং নীলবর্ণ নানাবিধ মনোহর উৎকৃষ্ট বৃক্ষ ছিল এবং সকল দিকেই সৌরভশালী উদ্যান ও পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্করিণীগুলিতে সর্বদাই হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক্ পক্ষী অবস্থান করিত। আর বায়ু, জলপদ্ম ও স্থলপদ্মের সৌরভ লইয়া সর্বদাই পাণ্ডবগণের সেবা করিত।" (সভা ৩।২১-৩৫)

রাজসভার এইরূপ ঐশ্বর্যোজ্জ্বল বর্ণনা, রাজসূয় যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য বর্ণনা, যজ্ঞারম্ভের পূর্বে পাণ্ডবভ্রাতাদের দিগ্বিজয় বর্ণনা এবং যজ্ঞে সমাগতরাজাগণের উপহার দ্রব্যের বিবরণ সমস্ত একত্রিত হইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য সমারোহের চিত্রটি মানসপটে অংকিত হইয়া যায়। অধিকন্তু মহাভারতের কাহিনী রচনার ইহা একটি উপযুক্ত পটভূমি প্রস্তুত করে। সংস্কৃত মহাভারতে এইরূপ ঐশ্বর্যময় ভাবগম্ভীর অত্যুজ্জ্বল বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে স্বয়ম্বর সভায়। সেই সভাকে উজ্জ্বল করিয়া যিনি পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠে মাল্যদান করিয়াছিলেন তাঁহার রূপের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা পাঠক চিত্তে জাজ্জ্বল্যমান। সভাপর্বের বর্ণনামূলক অংশে যে রাজমহিমা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপর জাগিয়া উঠিয়াছে স্বয়ম্বর সভার যাজ্ঞসেনীর অপরূপ মূর্তি এবং ইহাদের কেন্দ্র করিয়া দুর্যোধন চিত্তে সৃজিত হইয়াছে সুতীব্র বিদ্বেষ বহ্নি। ভোগের অপরিমিত ঐশ্বর্য দর্শনে ইহাই স্বাভাবিক। এই ঐশ্বর্যকে ভোগ করিবার জন্য চিত্তের যে অসহ্য দহন তাহাই সৃষ্টি করিয়াছে অধর্মের কামনার ইন্ধন। পরবর্তীকালে যে অন্যায় দ্যূতক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই মূল ঘটনার জন্য যে কার্য-কারণের প্রয়োজন ছিল সংস্কৃত মহাভারতের এই উজ্জ্বল বর্ণনা তাহাতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করিয়াছে এবং কাব্যের রসপরিণতিতে সাহায্য করিয়াছে। দ্রৌপদীর সৌন্দর্য এবং রাজসূয় যজ্ঞের ঐশ্বর্য ব্যতিরেকে দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবদের নির্বাসন ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ কোনটাই সম্ভব ছিল না।

অসংযত কামনার অন্যায় পরিতৃপ্তির আকাঙ্খা হইতে অধর্মের সূচনা এবং এই অধর্মেই অন্যায়ের সমূহ বিনষ্টি। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এই বিনষ্টিও মহিমময়। এই মহাসমরে সংগ্রাম হইয়াছে ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, ধর্মের সহিত অধর্মের, সত্যের সহিত মিথ্যার। কিন্তু ন্যায় অন্যায়, ধর্ম অধর্ম, সত্য মিথ্যা, যাহাদের আশ্রয় করিয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই ক্ষাত্র পরিচয় লইয়া আবির্ভূত, তাহারা প্রত্যেকেই শক্তিমান ও বীর্যবান। তাহাদের অসীম শক্তির, অনমনীয় দার্ঢ্যের এবং বিপুল বীর্যের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে এই মহাসমরে। ক্ষাত্রিয়ের বাহুবলই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই পরিচয়কে সাহিত্যে প্রকাশ করা প্রয়োজন। সে প্রকাশ ভীষণ অথচ সুন্দর ও মহিমময় বর্ণনার উপর নির্ভর করে। নির্ভর করে সবিস্তার উজ্জ্বল অথচ বাস্তবধর্মী বিবরণের উপর। এই বিবরণ গতানুগতিক বা যান্ত্রিক নহে। এক পক্ষের আঘাত অপর পক্ষকে প্রত্যাঘাতে অধীর করিয়া তোলে। অপরপক্ষ অপমানের অসহ্য দাহনে উন্মত্ত চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য, প্রতিহিংসায় প্রচণ্ড সংগ্রামে নিরত হয়। এইরূপে মহাকাব্যের রস নিষ্পত্তির জন্য যে ত্রিলোকআলোড়নকারী ঘটনার প্রয়োজন, সেই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ইহার মধ্যে আমরা বীর রসের সন্ধান পাই। সংস্কৃত মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে এই বীর রসই সহস্রধারায় করুণ রসে উৎসারিত হইয়াছে এবং পরবর্তী অংশে শান্ত রসের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণনার সাহায্যে ঘটনার মধ্যে ভীষণ সুন্দর মহিমা সঞ্চারিত হইয়াছে। একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বর্ণনার এই বৈশিষ্ট্যকে সহজে প্রকাশ করা যায়। সেইজন্য যদিও কবি কর্ণপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করেন নাই তথাপি কর্ণপর্ব হইতে কর্ণার্জুনের শেষ সংগ্রামের চিত্রটি উপস্থাপিত হইল কারণ এখানে সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্ণার্জুন যখন শেষ সংগ্রামের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হন তখন উভয়েই তীব্র মানসিক যন্ত্রণাতে অধীর। অর্জুন ইতিপূর্বে অগ্রজের কুশল সন্ধানে শিবিরে গমন করিয়া এমন অবস্থা বিপাকের মধ্যে পড়েন যে পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজকে তীব্র কটূক্তি করিতে বাধ্য হন। ফলে কঠোর আত্মগ্লানি হইতে মুক্তি লাভের জন্য অগ্রজের চরণ স্পর্শ করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই দিনই রণক্ষেত্রে চিরশত্রু কর্ণকে বধ করিবেন। সুতরাং আত্মগ্লানির জ্বালা, প্রতিজ্ঞা পালনের কঠোর সংকল্প এবং চিরশত্রুকে জয় করার অদম্য আকাঙ্খা সমস্ত একত্রিত হওয়ায় অর্জুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার চরম শিখরে বিরাজমান ছিলেন। কর্ণের অবস্থাও তদ্রূপ। কারণ অর্জুন সেইদিনই রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কর্ণপুত্রগণকে বধ করিয়াছেন। তাই প্রতিহিংসা গ্রহণে এবং শত্রুবিজয়ে তিনিও অধীর। এই অবস্থায় তাঁহারা দুজনে শেষ সংগ্রামে সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সময়ের মূর্তি প্রকাশের অপেক্ষা রাখে। উপযুক্ত বর্ণনার সাহায্যে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। সেই বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে সংস্কৃত মহাভারতের কর্ণ ৫৪।১৩-২২ এই দশটি শ্লোকে। ইহার পর ঐ একই অধ্যায়ের ৩৯ হইতে ৬৪ শ্লোকে দীর্ঘ বর্ণনাতে বলা হইয়াছে এই প্রচণ্ড সংগ্রামে কে কাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। এই বর্ণনাতে দেখা যায় স্বর্গ মর্ত ও পাতাল ত্রিলোকই এই সংগ্রামে আলোড়িত। "অন্তরীক্ষে ইন্দ্র ও সূর্য পরস্পরের পুত্রদের

পক্ষাবলম্বন করিয়া স্পর্ধা ও প্রতিস্পর্ধা প্রকাশ করিতেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও সূর্য দুই পক্ষে থাকিলে তখন দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যেও দুই পক্ষ হইল। ক্রমে মহাত্মা কর্ণ ও অর্জুনকে রণস্থলে মিলিত দেখিয়া দেবতা ঋষি ও চারণগণের সহিত সমস্ত ত্রিভুবনই ভয়ে কাঁপিতে থাকিল।" কর্ণ ৬৪।৬৩-৬৪ শ্লোকসমূহে এইরূপে কর্ণার্জুন যুদ্ধের পটভূমি রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে এক একটি গুরুগম্ভীর শ্লোকে যখন এই দীর্ঘ বর্ণনা প্রদত্ত হয় তখন মনে হয় আসন্ন প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড প্রতাপের কথা স্মরণ করিয়া যেন ত্রিলোক সভয় কম্পমান হইয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধের উত্তেজনা কেবল যোদ্ধাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। ইহা রথ, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই উত্তেজনার চরম অবস্থায় কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু একের আঘাত যতই প্রচণ্ড হউক না কেন অপরে তাহা প্রতিহত করিয়া তীক্ষ্ণতর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সংগ্রামের মধ্যে এক সময় কর্ণকে বধ করিতে স্থির সংকল্প হইয়া এক সাংঘাতিক শর সন্ধানের জন্য অর্জুন কৃষ্ণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—"কৃষ্ণ! জগতের মঙ্গল বিধান ও কর্ণকে বধ করিবার জন্য আমি এই ভীষণ এক মহাস্ত্র আবিষ্কার করিতেছি। অতএব তুমি আমায় অনুমতি কর এবং দেবতারা, ব্রহ্মা, মহাদেব ও ব্রহ্মাণ্ডের সকল লোক অনুমতি করুন" (কর্ণ ৬৫।৮৩)। অর্জুনের এই অনুমতি প্রার্থনার মধ্যে অস্ত্রের ভীষণতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। মনে হয় এই অস্ত্রাঘাত কর্ণের পক্ষে সহ্যাতীত। কিন্তু মহানিপাতের আশংকাজনক চরম মুহূর্তটি পলকের জন্য অতিবাহিত হইলে দেখা যায় অসংখ্য শরজালে অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রতিহত করিয়া অলৌকিক শক্তিধারী বীর কর্ণ প্রবলতর বিক্রমে অর্জুনকে প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। "তদনন্তর কর্ণ ধনুখানাকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া শত্রুনাশক অতি প্রশস্ত, সর্পমুখ উজ্জ্বল, ভীষণ পরিমার্জিত, অর্জুনকে বধ করিবার জন্য চিরকাল বিশেষভাবে রক্ষিত সর্বদা আদৃত চন্দনচূর্ণে স্থাপিত, স্বর্ণময় তূণ হইতে স্থিত, মহাতেজা ও তীক্ষ্ণ ক্রোধে বাণটাকে অর্জুন অভিমুখে সন্ধান করিলেন। তখন কর্ণ যুদ্ধে অর্জুনের মস্তক হরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াই সেই উজ্জ্বল ও ঐরাবত বংশজাত সর্পরূপ বাণ সন্ধান করিয়াছিলেন। তাহার পর দিক সকল ও আকাশ জ্বলিয়া উঠিল এবং ভয়ংকর উল্কা ও বিদ্যুৎ পতিত হইতে লাগিল।" (ক ৬৬।২০-২২) ইহার পরক্ষণেই এই ভীষণ অস্ত্রটিকে অর্জুন অভিমুখে তীব্র বেগে ধাবিত হইতে দেখা গেল। সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনায়—'কর্ণ বাহু নিক্ষিপ্ত, অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল মহাশব্দকারী ও ভীষণ মূর্তি সেই বাণটা ধনুর গুণ হইতে নির্গত হইয়া আকাশের যেন সীমন্ত (সীঁতি) করিতে থাকিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশ পথে যাইতে লাগিল।" (কর্ণ ৬৬।২৭) এই বর্ণনায় মনে হয় প্রতিপক্ষ যত দুর্ধর্ষই হোক, ইহা প্রতিহত করা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনের অবধারিত মৃত্যু জানিয়া স্বীয় পদভারে রথখানিকে অর্ধ বিতস্তি পরিমাণ মাটিতে প্রোথিত করিয়া দিলেন। ফলে অস্ত্র অর্জুনের মস্তক হরণ না করিয়া তাহার কিরীট হরণ করিল। (কর্ণ ৬৬।৩১-৩৭) এই সাতটি শ্লোকে অর্জুনের মুকুটের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে কাব্যের সুর এমনই উচ্চগ্রামে বাঁধা হইয়াছে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে এইরূপ দীর্ঘ বর্ণনা রস নিষ্পত্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করেনা বরং রসপরিণতিতে সাহায্য করে।

এইরূপ তুমুল সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত কর্ণ অর্জুন হস্তে নিহত হন। ইহাকে ইন্দ্রপতন বলা যায়। মধ্যাহ্ন গগন হইতে মহাজ্যোতির্ময় ভাস্করের আকস্মিক মহাপতন। এইরূপে মহাকাব্যোচিত ঘটনার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনা আকস্মিক ভাবে ঘটিতে পারে না, তাহার জন্য পূর্ব প্রস্তুতির ও ঘটনা পরম্পরার প্রয়োজন। বিভিন্ন ঘটনা উত্তরোত্তর বর্ধিত তীব্রতায় এই চরম শিখরে উন্নীত হইতে পারে। ইহাতে পাঠকচিত্তেও উপযুক্ত প্রস্তুতি সাধিত হয়। সংস্কৃত মহাভারতে সেইজন্য প্রায়শঃ যুদ্ধ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে সমুদ্রমন্থন উপলক্ষে দেবাসুরের দীর্ঘ যুদ্ধ বর্ণনা ; বিরাট রাজার গোধন অপহরণের সময় একরকম বলা যায় সংক্ষিপ্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনা ; উদ্যোগপর্বে পরশুরাম ও ভীষ্মের মধ্যে অতি দীর্ঘ যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি অন্যতম। ইহা ছাড়া আরও যুদ্ধ বর্ণনা আছে। এই সকল যুদ্ধ বর্ণনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কবি কাশীরামদাস এই সকল যুদ্ধ বর্ণনা যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন অথবা অতীব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, কবির রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বীর্যগাথাকে তিনি কৃষ্ণ কথায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। সেই সময়ের যুগ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভক্তিভাবের প্রাধান্য দেখা দিয়াছে তাঁহার রচনায়। তাই ভক্তি রসাত্মক দেবমহিমার বর্ণনা প্রায়ই পাওয়া যায়। এই মহিমা দেবদেবীর স্তুতি বর্ণনা রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কাহিনী বর্ণনার মধ্যে যখন কোন দেবদেবীর অবতারণা করা হইয়াছে তখনই তিনি সেই দেবতার প্রশস্তি গাহিয়াছেন, এইজন্য সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে জলরাজ বরুণ যখন লক্ষ্মীকে লইয়া নারায়ণের নিকট উপনীত হইয়াছেন তখন নারায়ণের স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে—

"তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি সর্বব্যাপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগদ্ব্যাপী॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেবনাগ নর॥
তোমার বিশাল সৃষ্টি এই ত্রিভুবন।
স্থানে স্থানে সকলে তোমার নিয়োজন॥
ইন্দ্রে স্বর্গ দিলা যমে সংযমনীপুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর॥
জল মধ্যে আমারে করিয়া দিলা স্থিতি।
তোমার আজ্ঞায় চির করি যে বসতি॥" পৃঃ ১৪

কালকূট বিষপান নিরত মহাদেবের উদ্দেশ্যেও এই জাতীয় স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে—

"তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, ধনের ঈশ্বর।
তুমি সূর্য বায়ু সোম তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্বত সমুদ্র॥
যোগজ্ঞান বেদশাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমিই ধারণা ধ্যান তুমি উগ্রতপ॥

নিবৃত্ত করিলে তুমি এ মহাপ্রলয়।
কি করিব আজ্ঞা তবে দেহ মৃত্যুঞ্জয়॥" পৃঃ ২০

এই দুই স্তুতি বর্ণনায় দেখা যাইবে কবি সকল দেবতার উদ্দেশ্যেই সমানভাবে স্তুতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং বক্তব্য প্রায় অভিন্ন থাকিলেও তাহাকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামার স্তুতি বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যভামা পুরাণ কাহিনীর নায়িকা, নাম করা কোনও দেবতা নহেন। তথাপি ইন্দ্র সত্যভামার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী রতি সতী অরুন্ধুতী
পার্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতিস্বর্গ তুমি দাতা চতুর্বর্গ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা॥" পৃঃ ২৭৯

প্রায়শঃ এইরূপ স্তুতি বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক সময় স্তুতি বর্ণনার সহিত যুক্ত হইয়াছে রূপ বর্ণনা। কৃষ্ণের স্তুতি এবং রূপ বর্ণনা উভয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণের রূপের মধ্যে যেমন তাঁহার বিশ্বরূপের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তেমনই মোহন মুরলীধারী নবঘন শ্যামরূপও প্রকাশিত হইয়াছে। গীতায় বর্ণিত বিশ্বরূপের অনুসরণ করিয়া কবি কাশীরামদাস বর্ণনা দান করিয়াছেন—

"বিশ্বরূপ প্রকাশেন দেব জনার্দন।
যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পঞ্চানন॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীটভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধে শোভে সহস্রেক কর।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধর॥
সহস্র সহস্র যেন সূর্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভিত হৃদয়॥" পৃঃ ৩৭৩

ইহার পরেই পুনর্বার বর্ণনা করিয়াছেন—

"তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম॥
তড়িতজড়িত পীত কৌষেয় বসন।
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষ কৌস্তুভ ভূষণ॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্বলোক নাথ॥" পৃঃ ৩৭৪

এইরূপ প্রথানুগ বর্ণনাই নহে, বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী রূপের বর্ণনার মধ্যে বিশেষ ভাব প্রকাশ করায় কবি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমুদ্র-মন্থন কাহিনীতে পার্বতীর কটুভাষে ক্রুদ্ধ মহাদেবের বর্ণনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এখানে মহাদেবের ক্রোধান্বিত মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাদেবের পৌরাণিক রূপবৈশিষ্ট্য এবং গ্রাম্য লোকের ক্রুদ্ধ আচরণ দুইয়ের একত্র সন্ধান পাওয়া যায়, সাধারণ ক্রুদ্ধ বাঙ্গালী যেমন উত্তেজিত হইয়া কর্মোদ্যত হয় এবং সেই উত্তেজনা প্রকাশিত হয় পরিধেয় বসন ও সম্মার্জনীর সবেগ বন্ধনে তেমনই ব্যাঘ্রবাস মহাদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁকালে নাগের দড়ি বাঁধিয়াছেন। কবি এই বর্ণনা দান করিয়াছেন—

"পার্বতীর কটুভাষ শুনি রোষে দিগ্‌বাস
টানিয়া বান্ধিল ব্যাঘ্রবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালে বাঁধিল বেড়ি
করে তুলি নিল মৃগবাস॥
কপালে কলঙ্কি কলা গলে দোলে হাড়মালা
করযুগে কঞ্চুক কঙ্কণ।
ভালে বৃহদ্ভানু শশী বিবিধ প্রকারে ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
ভ্রমে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
যজ্ঞাগিরির আভা কোটি চন্দ্রমুখ শোভা
ফণী মণি মুকুটে বিরাজে॥" পৃঃ ১৭

এই বর্ণনার মত ছদ্মবেশী অর্জুনের রূপ বর্ণনাও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বাংলা সাহিত্যে অতি পরিচিত। সেখানেও অর্জুনের বীর্যের সহিত কমনীয়তার দুর্লভ সমন্বয় অপূর্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। উপমার সাহায্যে তাঁহার এই অর্ধাচ্ছন্ন রূপ প্রকাশ করিয়াছেন কবি—

"মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত॥" পৃঃ ২১৯

ভীমের রূপ বর্ণনার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বারণাবত নগরে জতুগৃহ দাহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যখন জননী সহ পঞ্চভ্রাতা পরিভ্রমণরত সেই সময় হিড়িম্বা ভীমকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ভীমের রূপ মাধুর্যের মধ্যে আকৃতিগত বিশালতা ও সৌন্দর্যকে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন কবি—

"নিশাচরী দূরে থাকি বীর বৃকোদরে দেখি
শরীর নেহারে ঘনঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া যেন শালদ্রুম কোঁড়া
শশিমুখ পংকজ নয়ন॥
সিংহের বিক্রমধর ভুজযুগ করিকর
কম্বু কণ্ঠ খগবর নাসা।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষণে প্রীতি বড় পায় মনে
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা॥" পৃঃ ১৭৬

কেবল ভীমের নয় যে রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে তাহারও রূপ লাবণ্যের অনুপম বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। বহু পরবর্তী কালে রাক্ষসী শূর্পণখার মানবী রূপ অঙ্কন করিয়াছেন এবং তাহার সেই রাক্ষসী বিভীষিকার মধ্যে মানবিক প্রেমের সন্ধান দান করিয়াছেন মহাকবি মধুসূদন।' এই বিষয়ে কবি কাশীরামদাসকে মধুসূদনের পূর্বসূরী বলা যায়। হিড়িম্বার পূর্বরাগের, তাহার সলাজ মধুর প্রেমের এবং তাহার কমনীয় রূপের সুন্দর বর্ণনা দান করিয়াছেন কবি কাশীরামদাস--

"এতেক কামনা করি কামরূপা নিশাচরী
দিব্য রূপা হইলা কামিনী।
মুখপদ্ম শরৎশশী নয়ন কুরঙ্গ দৃশী
স্তনযুগবরা নিতম্বিনী॥
কামের কার্মুক ভুরু তিল পুষ্প নাসা চারু
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গৃধিনী।
করি কর যুগ উরু উলট কদলী তরু
মদমত্ত মাতঙ্গ চলনী॥
চম্পক কুসুম আভা অঙ্গের বরণ শোভা
কটাক্ষে মোহিত মুনিমন।
আসিয়া ভীমের পাশে সলজ্জ মধুর ভাষে
কহে যেন কোকিল নিস্বন॥" পৃঃ ১৭৬

মধুর রূপের বর্ণনায় কবি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় বহন করে, ইহাতে তাঁহার আনন্দ। তাই এই জাতীয় মধুর রূপ বর্ণনার প্রায়শঃ সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ বর্ণনা চাতুর্যে তাহা এরূপ মনোহর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে যে উপমার ঐক্য এবং বক্তব্যের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে ক্লান্তিকর বলিয়া মনে হয় নাই। হিড়িম্বার ন্যায় কিশোরী সুভদ্রার রূপের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে—

"বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুল।
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরুবক ফুল॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দিকে ঝংকারিয়া অনুক্ষণ বুলে॥
দুই গণ্ড কুন্তল মণ্ডিত শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমোতি শোভে নাসা দুলে॥
বদন নিন্দিয়ে চাঁদ নাসা তিল ফুলে।
কটাক্ষের চাহনিতে মুনি মন ভুলে॥
কুচযুগ সমপূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুল॥
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতি যূথী হার পরে মালতী বকুল॥" পৃঃ ২৬৭

এই একই নারীরূপের পৃথক বর্ণনা দিয়াছেন কবি দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনাতে। বর্ণনা চাতুর্যে এই দুই অংশই সমান মনোহর মনে হইবে।

"পূর্ণ সুধাকর যিনি মনোহর
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা তিল ফুল নাসা
দেখি মুনি মন সুখ॥
নেত্রযুগ মীন দেখিয়া হরিণ
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রূ উন্নত দেখিয়া মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর বিরাজে অধর
পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দূর চিকুরজালে॥
তড়িৎ মণ্ডল কর্ণেতে কুণ্ডল
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
উরোজ যুগোল কোরক কোমল
তনুশোভা তাহে বাড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেশিল জলে লাজে॥" পৃঃ ২০৯

উপরি উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও লক্ষ্মীর রূপ, মোহিনীরূপী নারায়ণের রূপ, তপতীর রূপ ও হরিহরের যুগল রূপ প্রভৃতি রূপের বর্ণনা রহিয়াছে। এই সকল বর্ণনার মধ্যে পদাবলী সাহিত্যের রূপ বর্ণনার প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু সেই ধারার অনুগামী হইয়াও কবি তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং স্বীয় ক্ষেত্রে এরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন যে তাঁহাকে অনেক বৈষ্ণব পদকর্তার প্রতি যেরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, সেই ভাবে তাঁহাকে মধুর রূপের কবি আখ্যা প্রদান করা যায়।

নারীরূপের এই সকল মধুর বর্ণনার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ বর্ণনার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই বর্ণনাতে উপমা ও অলংকার প্রয়োগের এবং ভাষার ঐক্যও দেখা যায়। আসলে ভাষা ভাবের উপযুক্ত বাহন। কবিমানস ছিল পদাবলীর ভাবে ভাবিত। মধুর ভাব ও ভক্তিভাবে কবিচিত্ত পূর্ণ। সেইজন্য ভাষাও সুললিত সরল ও মধুর হইয়াছে। ইতিপূর্বে রূপ বর্ণনার সময় যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনের সাহায্যে ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। নুপুরের শিঞ্জিনীর ন্যায় শব্দ ধ্বনিও, রচনার মধ্যে ভাবের মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। ইহা ছাড়া তৎসম শব্দের সার্থক প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্জুনের রূপ

বর্ণনা, ক্রুদ্ধ মহাদেবের বর্ণনা, অন্যান্য দেব দেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বহুল তৎসম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতে কবির 'শিক্ষাগত মানের' যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয় হইয়া নাই। পাণ্ডিত্যের উপরে তাঁহার কবি পরিচয়ই প্রধান হইয়াছে। কারণ শব্দসমূহকে তিনি আপনার ভাবনার তাপে এরূপে তপ্ত করিয়াছেন যে ইহারা তাঁহার কাব্যভাবের সার্থক বাহন হইয়াছে। অর্থভার বিলুপ্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে ব্যঞ্জনার দ্যোতনা আসিয়াছে। ভস্মাচ্ছাদিত অর্জুনের রূপ বর্ণনায় কবির উক্তি "অগ্নি অংশ যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত" অথবা "মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত" ভাষা ও ছন্দে সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছে। ভাষা প্রয়োগে কবির স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তিনি সংস্কৃত তৎসম শব্দের সহিত চলতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কোথাও রসাভাব সৃষ্টি হয় নাই। যে মহাদেবের করযুগে কঞ্চুক কংকন এবং "কপালে কলাঙ্ককলা" শোভা পায় তিনিই ক্রুদ্ধ হইয়া "বাসুকি নাগের দড়ি দিয়া কাঁকালে বেড়ি" বাঁধিয়াছেন।

কিন্তু রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে দেশীয় ও চলিত শব্দের সার্থক প্রয়োগ থাকিলেও মাঝে মাঝে কবির শব্দ প্রয়োগ মহাকাব্যের মহিমাকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়া পরিচিত লৌকিক জগতের ভাব প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ শব্দ প্রয়োগের জন্য চরিত্র সমূহের মহিমাও খর্ব হইয়াছে। চরিত্র আলোচনার সময় এ বিষয়টি উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করা হইয়াছে। বনপর্বে ঘোষ যাত্রার সময় গন্ধর্ব রক্ষীকে যখন কর্ণ "ঢেকা" মারিয়া বাহির করিয়াছেন তখন তাঁহার আচরণ যেমন আভিজাত্য বর্জিত সাধারণ মানবোচিত হইয়াছে তেমনই "ঢেকা" শব্দটির প্রয়োগও কাব্যের মহিমা ও গুরুগম্ভীর ভাবকে খর্ব করিয়াছে। এইরূপ চলতি শব্দ প্রয়োগের সন্ধান পাওয়া যায় কুন্তীর উক্তিতে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যখন কুন্তীদেবী বলিয়াছেন "হাপুতির পুত মোর অন্ধলার নড়ী" তখন অসহায় গ্রাম্য বিধবার মুখের কথার অবিকল উদ্ধৃতি বলিয়া মনে হয়। অর্জুনের ধনঞ্জয় নামকরণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি কুন্তীর প্রতি গান্ধারীর তীক্ষ্ণ কর্কশ বাক্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"গান্ধারি বলেন রাঁড়ি এত গর্ব তোর।
কিমতে পূজিস লিঙ্গ সংপূজিত মোর ॥" পৃঃ ৭১৮

"ঢেকা" "কাঁকালি" "হাপুতির পুত" "অন্ধলার নড়ি" "রাঁড়ি" প্রভৃতি গ্রাম্য চলিত শব্দ। বাংলাদেশের অত্যন্ত সাধারণ মানুষের কণ্ঠেই শোনা যায়। আভিজাত্য বর্জিত এই সকল শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে মহাকাব্যের সমস্ত ভাব যেন দূরীভূত হয়।

ইহাদের সহিত যুক্তাক্ষর সম্বলিত, দীর্ঘ সমাসবহুল গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের তুলনা করিলে দেখা যায় যে ইহা বাংলা শব্দ প্রয়োগের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। মহাকাব্যের ভাব-গাম্ভীর্য গুরুগম্ভীর মহিমা, এবং শৌর্য ও বীর্য অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা শব্দের এ বিষয়ে প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পরবর্তীকালে মহাকবি মধুসূদন তাঁহার অসাধারণ কবি প্রতিভা ও সজ্ঞান প্রচেষ্টার সাহায্যে ভাষায় ওজঃগুণ সঞ্চার করিতে ও বীর রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্য এই দুই গ্রন্থের

ভাষার তুলনা করিলে সহজে বোঝা যাইবে। ইতিপূর্বে চরিত্রের আলোচনার সময় কীচক পদাঘাতে নিগৃহীতা দ্রৌপদীর রূপের এবং তাঁহার ক্রুদ্ধ উক্তির কথা আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে দেখান হইয়াছে বক্তব্যের মধ্যে মিল থাকিলেও ব্যঞ্জনার মধ্যে কিরূপ ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যঞ্জনার পার্থক্য ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগের দ্বারা প্রধানতঃ সাধিত হইয়াছে। বিরাট ১৫।১৭-২১ এই পাঁচটি শ্লোকের প্রতিটির শেষে "তেষাং মানিনী ভার্যা সুতপুত্রং পদাবধীত"—"তাহাদের মানিনী ভার্যা আমি, সেই আমাকেই সুত-পুত্র পদাঘাত করিল" এই কথা বারংবার আবর্তিত হইতে থাকায় মনে হয় যেন ক্রুদ্ধ ফণিনীর তীক্ষ্ণ গর্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে। ইহা দ্রৌপদীর তীব্র অন্তর্জ্বালা, এবং অসীম তেজস্বিতা প্রকাশ করিতেছে। ইহার সহিত বাংলা ভাষায় দ্রৌপদীর যে উক্তি বিবৃত হইয়াছে তাহা কারুণ্যে হৃদয় বিগলিত করিয়াছে, কিন্তু ক্রোধে উদ্দীপ্ত করে নাই।

উদ্যোগপর্ব হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া সংস্কৃত ভাষার মহিমা প্রকাশ করা হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্বে কৃষ্ণ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হইলে এবং এতদুদ্দেশ্যে কৌরব সভায় গমনোদ্যত হইলে, দ্রৌপদী ক্রোধে ক্ষোভে, অভিমানে আলোড়িত হইয়া দীর্ঘ ভুজঙ্গ সদৃশ বেণী করপদ্মে ধারণ করিয়া অসিতঅপাঙ্গলোচনে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। এই সময়ের দ্রৌপদীর চিত্র অংকিত হইয়াছে—

"ইত্যুক্ত্বা মৃদু সংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতপাঙ্গী সর্বগন্ধাধিবাসিতম্ ॥
সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা ॥
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপত্য গজগামিনী।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণম্ বচনমব্রবীৎ ॥" উদ্যোগ ৭৬।৩৩-৩৫

"এই কথা বলিয়া নীলনয়নপ্রান্তা, বরারোহা পদ্মনয়না ও গজগামিনী দ্রৌপদী অশ্রু-পূর্ণ নয়নে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকট যাইয়া বামহস্ত দ্বারা কোমল বেণী, কুটিলাগ্র মনোহর, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সর্বসৌরভশালী অপূর্ব সুলক্ষণযুক্ত ও মহাসর্পের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন কেশ-কলাপ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন" (উদ্যোগ ৭৬।৩৩-৩৫)। ভাষা ও ছন্দের ব্যঞ্জনা দ্রৌপদীর বেদনার গভীরতা প্রকাশ করিয়াছে। এই বেদনা কৃষ্ণের বীর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছে। তিনি উদ্দীপিত হইয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন এবং কঠোর প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত করিয়াছেন—

"এবং তা ভীরু! রোৎস্যন্তি নিহত জ্ঞাতি বান্ধবাঃ।
হতমিত্রা হতবলা যেষাং ক্রুদ্ধাসি ভাবিনি ॥
অহঞ্চ তৎ করিষ্যামি ভীমার্জুন যমৈঃ সহ।
যুধিষ্ঠির নিয়োগেন দৈবাচ্চ বিধি নির্মিতাৎ ॥
ধার্তরাষ্ট্রাঃ কালপক্বা ন চেচ্ছৃণ্বন্তি মে বচঃ।
শেষ্যন্তে নিহতা ভূমৌ শ্বশৃগালাদনীকৃতাঃ ॥

চলেদ্ধি হিমবান শৈলো মেদিনী শতধা ভবেৎ।
দৌঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মে মোঘং বচো ভবেৎ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি কৃষ্ণে! বাষ্পা নিগৃহ্যতাম্।
হতমিত্রান্ প্রিয়া যুক্তানচিরাদদ্রক্ষ্যসে পতীম্॥" উদ্যোগ ৭৬।৪৫-৪৯

"ভীরু। ভাবিনী। তুমি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র ও সৈন্য নিহত হইলে তাহাদের ভার্যারাও এইরূপই রোদন করিবে। যুধিষ্ঠিরের আদেশে এবং বিধাতৃ প্রেরিত অদৃষ্ট অনুসারে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া আমিই তাহা করিব। কালপক্ক ধার্তরাষ্ট্রগণ যদি আমার কথা না শোনে তবে তাহারা নিহত এবং শৃগাল কুকুরের খাদ্য হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। হিমালয় পর্বত যদি স্থান ভ্রষ্ট হয়, পৃথিবী যদি শতধা বিদীর্ণ হয় এবং নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আকাশ-মণ্ডল যদি পতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হইবে না। দ্রৌপদী! তুমি অশ্রু সংবরণ কর, আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। তুমি অচিরকাল মধ্যে আপন পতিদিগকে হতশত্রু ও রাজলক্ষ্মীযুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইবে।" (উদ্যোগ ৭৬। ৪৫-৪৯) সংস্কৃত মহাভারতের ধ্বনিগাম্ভীর্য কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার উক্তির মধ্যে বীর রসের সঞ্চার করিয়াছে।

অলংকার প্রয়োগের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত মহাভারতে প্রকৃতি ও অরণ্যজীবন হইতে উপমা আহৃত হইয়াছে। প্রচলিত জীবনযাত্রা হইতেও উপমা ও চিত্রকল্প আহৃত হইয়াছে। কিন্তু যে জগৎ হইতেই ইহারা আহৃত হউক না মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য এইসব অলংকার প্রয়োগের মধ্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনে যাগযজ্ঞের বহুল প্রচলন ছিল। তাই বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে আহত যোদ্ধার বর্ণনায় বলা হইয়াছে যজ্ঞেতে আহূত ঘৃত যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে তেমনই যোদ্ধারাও তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কর্ণপর্বে ৬২ অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে—"রাজা ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ বৃষসেন নকুলের বাণাঘাতে, ক্রোধে, আপন কান্তিতে এবং অস্ত্রক্ষেপে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিলেন।" কর্ণপর্বে ৫৮ অধ্যায়ে ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে অরণ্য জীবন হইতে উপমা প্রদত্ত হইয়াছে। বিপক্ষের সৈন্য সংহার করার কথায় বলা হইয়াছে—"ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন বন-মধ্যে হরিণগণকে পীড়ন করে, তেমন কর্ণ পাঞ্চালদেশীয় শ্রেষ্ঠ রথীগণকে ও অপর শত্রু-দিগকে পীড়ন করিতে থাকিলেন।" সিংহের বীর্য ও মহিমা কর্ণের কার্যের মধ্যে উপমা প্রয়োগের দ্বারা সঞ্চার করা হইয়াছে। প্রকৃতি জগৎ হইতেও উপমা আহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির যে সকল বৈশিষ্ট্যে, বিশালতা, মহিমা ও গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলি গৃহীত হইয়াছে। যেমন পলায়মান সৈন্যের কোলাহল কর্ণ ৫৭।২০ শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে—"সমুদ্রের বিশাল জলপ্রবাহ পর্বতে সংঘর্ষ পাইয়া বিদীর্ণ হইতে থাকিলে তাহার যেমন মহাশব্দ হয় তেমন পলায়মান সেই সৈন্যের সম্মুখে মহাশব্দ হইতে লাগিল।" অথবা কর্ণ ৬৫।৩৫ শ্লোকে কর্ণ ও অর্জুনের সংগ্রামে পরস্পরের সংঘাতকে প্রকাশ করা হইয়াছে "একখানা মেঘের সহিত অপর মেঘ যেমন মিলিত হয় কিংবা ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা পর্বতের সঙ্গে অন্য পর্বত যেরূপ সংযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ ও অর্জুন ধনুষ্টংকার, হস্তাবরণের শব্দ ও চক্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাণসৃষ্টি করিতে

থাকিয়া পরস্পরে মিলিত হইলেন।" প্রকৃতির গম্ভীর, বিশাল ও ভয়াবহ বস্তুর মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের বীর পরিচয়কে প্রকাশ করা হইয়াছে উপযুক্ত অলংকারের সাহায্যে। এই প্রকাশই অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। কর্ণার্জুনের সংগ্রামে আহত কর্ণের মূর্তিকে একটি উপমার সাহায্যে কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে "বিশাল ও স্থূল বক্ষা কর্ণ বৎসদন্ত বাণে ব্যাপ্ত হইয়া সুপুষ্পিত অশোক পলাশ ও শাল্মলিবৃক্ষ সমন্বিত ও চন্দনযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।" (ক ৬৬।৭৪) ইতিপূর্বে দ্রোণপর্বে আহত অর্জুনের রূপও এই জাতীয় একটি অপূর্বসুন্দর উপমার দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে একটি তীক্ষ্ণধার ভল্ল অর্জুন ললাটে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকে এক শৃঙ্গ একটি পর্বতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল এবং ললাট নির্গত রক্তরাজি বক্ষদেশ রঞ্জিত করিয়া সুবর্ণ মালিকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। (দ্রো ৬০।৩-৫)

কবি কাশীরামদাসের রচনাতেও অলংকার প্রয়োগের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে কিন্তু ইহা রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এখানে পদাবলী সাহিত্যে প্রচলিত উপমাসমূহ অনেক সময় প্রযুক্ত হইয়াছে। কণ্ঠের সহিত কম্বুর, বক্ষের সহিত দাড়িম্বের, তিলফুলের সহিত নাসার এবং প্রবালের সহিত অধরের উপমা দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনায় পাওয়া যায়। কবি অলংকরণের ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় দান করিয়াছেন এবং পরিচিত জীবন ও জগত হইতেও উপমা আহরণ করিয়াছেন। হিড়িম্বার রূপের বর্ণনায় "করি করযুগ উরুর" সহিত তিনি "উলট কদলী তরুর" উপমা দান করিয়াছেন। অনেক সময় উলট কদলী তরুর পরিবর্তে বাঁশের কোঁড়ার কথাও বলিয়াছেন। সৈন্য-গণের ছিন্ন মস্তক ভূতলশায়ী হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভাদ্র মাসে পাকাতাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে মুণ্ড কাটি পড়ে॥" পৃঃ ২৩১

তালবৃক্ষ হইতে তালফলের পতনের কথা সংস্কৃত মহাভারতেও বর্ণিত হইয়াছে শল্য-পর্বের ৭ম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে—"মহারাজ! তালবৃক্ষ হইতে তালফল পতিত হইতে থাকিলে যেমন শব্দ শোনা যায়, মস্তকগুলি ভূতলে পতিত হইতে থাকিলে তেমন শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।" অবশ্য সংস্কৃত মহাভারতের ন্যায় বিশাল গ্রন্থে কোথায় এইরূপ উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা সন্ধান করিয়া কবি আহরণ করিয়াছেন এরূপ চিন্তা না করিয়া তিনি তাঁহার পরিচিত জগৎ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক হইবে। তবে সংস্কৃত মহাভারতের যে বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে তাহা কবির রচনায় কোথাও পাওয়া যায় না।

মোটের উপর বর্ণনা, ভাষা, অলংকরণ ও ছন্দ প্রয়োগে সর্বত্রই কবির মধুর ও ভক্তি-ভাবেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে কোথাও মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় নাই। আসলে বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার সহিত পয়ার ছন্দ যুক্ত হইয়া কবির রচনাকে এমন কোমল খাদে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে সেখানে মোহনমুরলীধ্বনি শোনা যাইলেও "ইরম্মদের" গর্জন শোনা যায় না। পয়ার ছন্দের একটানা দীর্ঘ সুর অবসাদ ও ক্লান্তি প্রকাশ করে কিন্তু উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে না। এই ছন্দে, এই ভাষায়

এবং এই অলংকার প্রয়োগে মধুপের মধু গুঞ্জন শ্রুতিগোচর হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের "ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টংকারের" জন্য প্রয়োজন ছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের, প্রয়োজন ছিল বিশেষ শব্দ প্রয়োগের, প্রয়োজন ছিল একটি বিশেষ যুগ পরিবর্তনের এবং মহাকবি মধুসূদনের। সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কবি কাশীরামদাসের মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনায় সর্বাধিক মনে পড়ে মহাকবি মধুসূদনের কথা। ভাষাগত ও ছন্দগত এক অনন্য সাধারণ পরিবর্তন সাধন করিয়া তিনি তাঁহার মেঘনাদ বধ কাব্যে সেই ভাবের সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন যাহার সহিত সংস্কৃত মহাভারতের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কবি কাশীরামদাস ভাষা ও ছন্দের এইরূপ পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, পরিবর্তে তিনি সংস্কৃত মহাভারতে অভিব্যক্ত ভাবের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

দেশ ও কালের প্রভাব

কবি কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করিয়া বাংলা মহাভারত রচনা করিয়াছেন। কাব্য সৃষ্টির অনিবার্য নিয়মে তাঁহার কাব্যে বাংলাদেশের এবং সমসাময়িক কালের প্রতি-ফলন ঘটিয়াছে। দেশ ও কাল তাঁহার রচনায় কতখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এই অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইল।

কবি কাশীরামদাস সপ্তদশ শতকের সূচনাতে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যজীবনের এবং বৈষ্ণব ধর্মের পরিপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। গোষ্ঠীগত ধর্মসাধনায় সমগ্র বাঙ্গালী বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে নাই কিন্তু মহাপ্রভুর দিব্যজীবনে এবং বৈষ্ণব ভাবধারায় ও জীবন চেতনায় সমস্ত বাঙ্গালী অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ইহা বাঙ্গালী জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় হইয়াছিল। তখনকার কালে মানুষের জীবন ছিল ভগবৎ নির্ভর। ভগবৎচেতনা, ভগবানের সহিত মানবের সম্পর্ক এবং ভগবানের নিকট মানবের কামনা এই তিনটিকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের জীবন যাত্রা অনেক অংশে নিয়ন্ত্রিত হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে আমরা পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারায় ভগবানের ঐশ্বর্যরূপের সাধনা করিয়াছি। বিভিন্ন আচার বিচারের মাধ্যমে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট আমাদের সহস্র কামনা জ্ঞাপন করিয়াছি। মধ্যযুগে যে সকল লৌকিক দেবতা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন তাঁহাদেরও শক্তিরূপের কাছে সকল অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ লাভের এবং পার্থিব সুখ সম্পদের প্রার্থনা জানাইয়াছি। দেবতার কাছে নিত্য কামনার মানসিক দৈন্য হইতে মহাপ্রভু বাঙ্গালীকে মুক্ত করিয়া রাগানুগাভক্তির সন্ধান দান করিয়াছেন। বাঙ্গালী স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ। সেইজন্য জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম, ভগবৎ সাধনার এই ত্রিবিধ পথের মধ্যে, বাঙ্গালী প্রেমের সহজ ও প্রশস্ত পথ গ্রহণ করিয়াছে। মহাপ্রভুরও আবেগ প্রধান ভগবৎ সাধনা সহজেই সমস্ত বাঙ্গালী চিত্তকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। হৃদয় ধর্মপ্রধান প্রেমসাধনায় তিনি বাঙ্গালীকে একটি নূতন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজে ছিলেন বিরহবিপ্রলম্ভের মূর্ত প্রতীক। ভগবানের সহিত তাঁহার ভালবাসা জন্ম জন্মান্তরের, তিনি বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ—রাধা ভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণস্বরূপ। তাই যে প্রেম সাধনায় তিনি নিজে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। সর্বসাধারণের পক্ষে ইহা আয়ত্তের অতীত। জীব সাধারণের জন্য রাগানুগাভক্তিই প্রশস্ত। কিন্তু ভগবানের প্রতি আসক্তি বা মমত্ববুদ্ধি না থাকিলে রাগানুগাভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না। বৈষ্ণব ধর্মে এই আসক্তি বা রতির পাঁচটি প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি রতিতে ভগবদ্ভক্ত বাঙ্গালী ঈশ্বরচিন্তাকে আপন প্রাণের

সম্বন্ধে বাঁধিয়াছে। তাহাদের ঈশ্বরচিন্তা নূতন পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্বেকার ভগবানের ঐশ্বর্য বা শক্তিরূপের পরিবর্তে তাঁহাকে প্রধানতঃ আনন্দরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহার সহিত পূর্বেকার ব্যবধান হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বে ছিল কেবলই ভক্তির সম্বন্ধ। ভক্তির সহিত যুক্ত হইয়াছিল ভীতি। এখন হইতে ভক্তির সহিত প্রীতি মিশ্রিত হইল আর ভগবানের কাছে ঐহিক সুখ-সম্পদ, অথবা পারমার্থিক মুক্তির পরিবর্তে কাম্য হইল ভালোবাসা। যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মকে গোষ্ঠীগত সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাও সকলে এই নূতন বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালী জীবন কৃষ্ণ-ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল এবং পার্থিব সুখ লাভের পরিবর্তে শুদ্ধাভক্তিই হইয়াছিল তাহার একমাত্র কাম্য। এই ভাবধারায় পরিবর্ধিত হইয়া কবি কাশীরামদাস কাব্য রচনা করেন।

যুগপ্রভাবে কৃষ্ণ-ভক্তিতে কবির চিত্ত ছিল পরিপূর্ণ। এই মানসিক অবস্থায় তিনি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই মহাভারতের কাহিনীতে কৃষ্ণের যে ভূমিকা আছে তাহা তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভক্তির সুগভীর রাগিণী সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা তাহাকে মহাভারত কাহিনীর আধারে কৃষ্ণকথা পরিবেশন করার অবকাশ দান করিয়াছিল। তাই কবি যখন তাঁহার কাব্য রচনা করিলেন তখন দেখা গেল মূল গ্রন্থের প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে পরস্পর আত্মীয় রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক শক্তি-সমূহের উত্থান পতনের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। রাজশক্তির পতন অভ্যুদয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি এই রাজন্যবর্গের আত্মীয় ও বন্ধু। অন্যতম রাজপুরুষ। তাঁহার মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংস্কৃত মহাভারতে তাঁহার ভগবৎ পরিচয়ও আছে। কিন্তু এই পরিচয় কখনও প্রধান বা একমাত্র পরিচয় হয় নাই। কবির রচনায় কৃষ্ণের মানবিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার ভগবৎ পরিচয় একমাত্র পরিচয় হইয়াছে এবং তিনিই তাঁহার ভগবৎসত্তা লইয়া সমস্ত কাহিনী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ফলে রাজশক্তির দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিবর্তে, প্রবলের অত্যাচার হইতে ভগবান ভক্তকে কিরূপে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা কবির রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্যোধন শক্তিমান, অহংকারী ও অত্যাচারী। এই জ্ঞাতি শত্রুর হস্তে পাণ্ডুপুত্রগণ অসহায়ভাবে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, তাহারা পিতৃহীন অনাথ, সহায় সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল দীন দরিদ্রের একমাত্র সম্বল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অবিচল ভক্তি আর ভালোবাসা। কবির যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরা সেইজন্য প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজেদের অসহায় বেদনা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন—

> "বিস্তর করিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
> সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ ॥
> না জানি পূর্বেতে কত করিনু কুকর্ম।
> সে কারণে দুঃখ শোকে গেল মম জন্ম ॥
> প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
> অল্পকালে পিতা মম গেলা পরলোক ॥

পোঁহাইনু সেই কাল পরের আলয়ে।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়ে ॥
তারপর দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর মন্ত্রণা ॥
বনের অশেষ দুঃখ এমন সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে ॥
এসব সঙ্কট হইতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমত সংযোগ আনি করিল বিধাতা ॥" পৃঃ ৫১১

কবির রচনায় ভক্ত প্রেমডোরে বাঁধা ভগবান স্বীয় মাহাত্ম্যে অসহায় পাণ্ডুপুত্রগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। কাহিনীর এই প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেশ ও কালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব নির্দেশ করিতেছে।

এখানে যে কৃষ্ণকথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণ যেমন বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর ভক্তের ভগবান, তেমনই তিনি সর্বশক্তিমান, বিশ্ববিধাতা, জগৎস্রষ্টা ও জগৎ নিয়ন্তা। তাঁহার এই পরিচয়ের সহিত সংস্কৃত মহাভারতে প্রকাশিত কৃষ্ণের দৈবী সত্তার ঐক্য আছে। কবি কাশীরামদাস যুগপৎ কৃষ্ণের দুই রূপেরই বর্ণনা দিয়াছেন। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন--

"অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি ॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায় ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয় ॥" পৃঃ ৪৩৯

এই বন্দনার সহিত সংস্কৃত মহাভারতে ভগবদগীতায় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বর্ণনার ঐক্য দেখা যায়। কিন্তু ভগবানের এই ঐশ্বর্যরূপে বাঙ্গালী বেশীক্ষণ তাঁহাকে আরাধনা করিতে পারে না। ইহাতে দেবতার সহিত মানবের যে ব্যবধান সৃজিত হয় তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে অসহনীয়। সে তাই ভগবানের ঐশ্বর্যরূপের পরিবর্তে তাঁহার আনন্দরূপকে বেশী ভালোবাসে। তাই তাহার কৃষ্ণ "অনাথের নাথ" "নির্ধনের ধন" "সুখ দুঃখ কহিবার একমাত্র স্থান।" সেইজন্য তাঁহার নিকট বেদনা-বিধুর দ্রৌপদী নিজের দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন। দুঃখ ও বেদনা হইতে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্খায় যে দ্রৌপদী এইরূপ তাঁহার মর্মবেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি তাঁহার আত্মার আত্মীয়ের নিকট নিজের ব্যথিত হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া শান্তি পাইয়াছেন। ভগবানের প্রতি কি গভীর ভালোবাসাতে তাঁহাকে এমন আপন করিয়া পাওয়া যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ভালোবাসাই দান করে অধিকারবোধ এবং অধিকারবোধ হইতে সৃজিত

হয় অভিমান। দ্রৌপদীর উক্তির মধ্যে সেইজন্য সুগভীর ভক্তির সহিত সামান্য অভিমানেরও রেশ রহিয়াছে। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃ স্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অবিরাম ঝরে॥
পুনঃ গদগদ কণ্ঠে বলয়ে পার্ষতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি॥" পৃঃ ৪৪০

সংসারে দ্রৌপদী একা এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার হইয়াছে। তাই একান্ত আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিমান প্রকাশিত হইয়াছে এবং উল্লেখ না থাকিলেও ইহার মধ্যে কৃষ্ণও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার নিকট এই ক্ষুব্ধ উক্তি এবং চোখের জল। অভিমান এখানে স্পষ্ট না হইলেও তাহার অস্তিত্ব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। সংস্কৃত মহাভারতে এইরূপ অংশে দ্রৌপদীর উক্তিতে অভিমানের সুর অনেক স্পষ্ট। দ্রৌপদী বলিয়াছেন তাঁহার কেহই নাই। এমন কি কৃষ্ণও নাই (বন ১১—১২৬)। কৃষ্ণ নাই এইরূপ কথা বাঙ্গালী নারীর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ কৃষ্ণ তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, চরম আশ্রয়। সংস্কৃত মহাভারতের কৃষ্ণ দ্রৌপদীব সখা। তাই মানবিক সখ্য সম্বন্ধে কৃষ্ণের প্রতি অভিমান সহজেই স্ফুটতর হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধ একান্তভাবে মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ। এখানে কবির রচনায় মানবিক ভাব ও ভগবৎপ্রেম একত্র যুক্ত হইয়াছে। ভগবানের সহিত ভক্তের প্রীতি-নির্ভর এক অপূর্ব ভক্তির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর মানস বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে।

ইতিপূর্বে যে জীবনবোধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে দেবতার কাছে এক-মাত্র কাম্য হইয়াছে অহৈতুকী ভক্তি, তাহা কবির রচনায় মহারাজা যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য যুধিষ্ঠিরের করায়ত্ত হইয়াছে। সমস্ত রাজা মহারাজা, এমন কি স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত কৃষ্ণের মাহাত্ম্যে যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম জানাইয়াছেন। কিন্তু এই অপরিমেয় প্রাপ্তিতে যুধিষ্ঠির অহংকারে স্ফীত হন নাই। জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। যে ভক্তিস্নিগ্ধ শান্ত জীবনযাত্রা বাঙ্গালীর তৎকালীন বৈশিষ্ট্য, তাহা প্রকাশ করিয়া গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রাণের অকপট কামনা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম॥
তড়িৎ জড়িত পীত কৌষেয় বসন।
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বপু কৌস্তুভ ভূষণ॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্বলোক নাথ॥
সংসারে আছেন যত পুণ্যবান জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ॥
সে সব ভক্তের পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্খায় মাগিবারে না করি ভরসা॥

যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি ॥'' পৃঃ ৩৭৪

যুধিষ্ঠির আত্মস্থ হইয়া কৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়াছেন। প্রিয়জনের রূপ দর্শন এবং তাহার বর্ণনা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। যুধিষ্ঠির সেই আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহার দেবতার নিকট প্রাণের কামনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিনয়ে বিগলিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন যে সকল ভক্ত ভগবানের চরণ নিত্যবন্দনা করেন, যাঁহারা রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী, তিনি তাহা লাভ করিবার ভরসা করেন না। তাহা মহাজনদের পক্ষে লভ্য। সাধারণ মানুষ হইয়া তিনি এই সকল ভক্তের পদ বন্দনা করিতে অভিলাষী। ইহাই তাঁহার জীবনের কাম্য। জীবনে তাঁহার প্রাপ্তির সীমা নাই কিন্তু তিনি জানেন "এ সকল অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।" জীবনে একমাত্র নিত্য বা সার বস্তু হইল ভক্তি, যে ভক্তিতে ভগবানকে জন্ম জন্মান্তরে লাভ করা যায়। তাই যুধিষ্ঠিরের একটি মাত্র কামনা "অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ।" যে মনোভাব ও জীবনবোধ যুধিষ্ঠিরের এই উক্তিতে প্রকাশিত হইযাছে তাহা যেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব বিরচিত "শিক্ষাষ্টকের" অন্যতম দুইটি শ্লোকের নির্যাস বলিয়া মনে হইবে। শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

"তৃণ হইতেও নীচ হইযা, তরুর মত সহিষ্ণু হইয়া নিজে নিরভিমান হইয়া এবং সর্বজীবে সম্মান দিয়া সর্বদা হরিনাম করিবে।" মহারাজা যুধিষ্ঠির পার্থিব সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াও এইরূপ নম্র শান্তজীবন কামনা করিয়াছেন। শিক্ষাষ্টকে জীবনের যে কামনা অভিব্যক্ত হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরেরও তাহাই কাম্য—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতা ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

"হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, সুন্দরী বা কবিতা কামনা করি না, যেন জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণে আমার ভক্তি থাকে।" যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে এই শ্লোকের ভাব অত্যন্ত অকপট সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে—

"যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥" পৃঃ ৩৭৪

এক হিসাবে ইহা অত্যন্ত সাধারণ ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যহীন কামনা। কারণ ভগবানে ভক্তি ইহা সকলের কাম্য। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে সর্বজন চিত্তে ইহা এইরূপে বিরাজমান ছিল না। পার্থিব ধন-সম্পদের পরিবর্তে ভগবানের প্রতি ভক্তির আকাঙ্খাকে তিনি জাগ্রত করিয়াছিলেন এবং এই কামনায় তাহাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণ বাঙ্গালীর কামনা যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতিতে এই কামনা হইতে ভ্রষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। আত্মবিস্মৃত সত্যভামার দর্পচূর্ণের কথা সত্যভামার ব্রতপালনের কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর ভালোবাসায় সত্যভামা মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণের উপর তাঁহার একমাত্র অধিকার, তাই পরজন্মে কৃষ্ণকে স্বামী রূপে লাভ করিবার পুণ্যফল লোভে সত্যভামা ব্রতপালন করিয়াছিলেন এবং পুণ্যফল লাভে ব্রত উদ্‌যাপন করিতে নারদের নিকট কৃষ্ণকে দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবের জীবনে কৃষ্ণই একমাত্র বস্তু ইহা ছাড়া অন্য কিছু নাই। সত্যভামা জীবনের এই আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। পরে নিদারুণ বেদনার মধ্যে উপলব্ধি করিলেন নাম ও নামী অভিন্ন, তুলসীপত্রের কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণের সমান এবং কোনও রূপ পুণ্যের লোভে তাঁহাকে দান করা যায় না।

কৃষ্ণের প্রতি এই সুগভীর ভক্তি, তাঁহাকে পাওয়ার আকাঙ্খা যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন সাধক ভক্ত যে অবস্থায় উপনীত হন তাহাকে দিব্যদশা বলা হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনে ভক্তির এই চরম প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। বহু গৌরচান্দ্রিকাতে শ্রীচৈতন্যের এই দিব্য রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্যতম বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তা গোবিন্দদাস নবদ্বীপের সুরধুনী তীরে পরিভ্রমণরত গৌরাঙ্গের বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন যে কনককান্তি গৌরচন্দ্র সুরধুনী তীর উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হইতেছে, তাঁহাব দেহ কদম্ব কেশরের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইতেছে। তিনি অহর্নিশি দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া বাহ্য জ্ঞানহারা হইয়া রহিয়াছেন, এবং ভক্ত ভ্রমরগণ তাঁহার চরণে ঝংকার করিতেছেন। এই জাতীয় পদ কবি কাশীরামদাসকেও কতখানি প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার রচিত ছত্র উদ্ধৃত করিলে বোঝা যাইবে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর রাজা যুধিষ্ঠিরেব বর্ণনা দিয়া কবি বলিয়াছেন –

> "কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
> ভয়েতে আকুল হৈয়া কম্পিত শরীর ॥
> নয়ন যুগলে পড়ে বারিধারা নীর।
> মুহূর্মুহূ অচেতন হয় কুরু বীর ॥" পৃঃ ৩৭৩

কৌরব বীর তাঁহার বীর্যবত্তা প্রকাশ না করিয়া গভীর ভক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহারও বারিধারায় নয়ন বিগলিত হইয়াছে। শরীরে কম্পের শিহরণ জাগিয়াছে। এবং তিনিও মুহূর্মুহূ অচেতন হইয়াছেন।

কবির রচনায় ভগবানেরও পবিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তের এই ভালোবাসাতে ভগবান দূরে থাকিতে পারেন নাই। তিনিও ভক্তের প্রতি ভালোবাসাতে আবদ্ধ। তিনিও ভক্তের চরণে নত হইয়াছেন। রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম জানাইয়া বলিয়াছেন—

> "আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে।"

সমস্ত দুঃখ বিপদ হইতে ভগবান ভক্তকে উদ্ধার করেন। এইজন্য কবির রচনায় ভগবানের মানবিক উদ্বেগটুকুও লক্ষ্য করার মত। বনপর্বে দুর্বাসার আগমনে পাণ্ডবগণ যখন উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন তখন দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ

রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে পাণ্ডব সমীপে গমন করিয়াছেন। রুক্মিণীর মৃদু অভিযোগের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
কেবল আমার ভক্ত সুখ দুঃখ দাতা॥
ভক্তজন যথা মম থাকে দেবী সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয়॥
সে কারণে ভক্তদুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল॥" পৃঃ ৫৯১

এই ভক্ত ও ভগবানের কথা সংস্কৃত মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান যদিও কৃষ্ণ রূপে কবির রচনায় বিরাজমান তথাপি বাঙ্গালী মনে কৃষ্ণের সহিত অন্যান্য দেব-দেবীও আসন গ্রহণ করিয়াছেন। গোষ্ঠীগত ধর্মসাধনায় এই সকল দেবদেবীর অনুগামীরা পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন এবং সাধন ভজনের পৃথক পৃথক পথ অনুসরণ করিতেন, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর চেতনায় সমস্ত দেবতাই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। বাঙ্গালী জীবনে, অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসনে বিরাজমান হইলেন শিব দেবতা। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালীর চেতনাতে যে শিব দেবতা বিরাজমান তাহার মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয়বিধ ভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পুরাণের মহাদেব বাঙ্গালীর কুটীরে আসিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীতে প্রায়শঃই দ্বন্দ্ব ও কলহের সৃষ্টি হইয়াছে। মঙ্গল কাব্যসমূহে হরগৌরীর কলহের বিবরণ পাওয়া যায়। কবি কাশীরামদাসও এই ধারায় সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে হরগৌরীর কলহের সরল বিবরণ দান করিয়া দাম্পত্য মাধুর্যের সঞ্চার করিয়াছেন এবং কাহিনীকে মানবিক ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিনটি সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। শৈব ও শাক্তের বিরোধ সত্ত্বেও বাঙ্গালীর সমন্বয়ী চেতনাতে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক মিলনেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মোহিনীরূপী নারায়ণ ও মহাদেবের মিলিত রূপের যে বর্ণনা দান করিয়াছেন কবি সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে, তাহাতে যেমন হরি ও হরের মিলনের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণবের মিলনের কথা প্রকাশিত হইয়াছে তেমনই অর্ধ-নারীশ্বর রূপের মধ্যে শৈব ও শাক্তের মিলনের কথাও অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালী জীবনে অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে লক্ষ্মীর একটি বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রহিয়াছে। এই গুরুত্ব এবং লক্ষ্মীর প্রতি বাঙ্গালীর চিত্তের সুগভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে। অমৃত লাভ ছিল সংস্কৃত মহাভারতের উদ্দেশ্য। কবির রচনায় বিবৃত হইয়াছে অমৃত নহে লক্ষ্মী লাভই হইল মন্থনের একমাত্র লক্ষ্য। ইহা বাঙ্গালী মনের অন্যতম আকাঙ্খা প্রকাশ করিতেছে।

দেশ ও কালের সর্বাধিক প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায় উভয় মহাভারতের চরিত্র-সমূহের তুলনামূলক আলোচনায়। সংস্কৃত মহাভারতের পাত্রপাত্রীসমূহ প্রধানতঃ

ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ অথবা ক্ষত্রিয় রমণী। শৌর্য, বীর্য, আত্মসম্মানবোধ, প্রতিহিংসা প্রবণতা, দার্ঢ্য এবং তেজস্বিতার ক্ষাত্র পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবি কাশীরাম-দাসের রচনায় স্বভাবতই এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আচ্ছন্ন হইয়া বাঙ্গালীসুলভ কোমলতা ও ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে যে চরিত্র সত্যকার রাজকীয় গুণে ভূষিত হইয়া রাজমহিমায় বিরাজমান, কাশীরামদাসের রচনায় সেই চরিত্র রাজবেশে সজ্জিত হইলেও প্রকৃতির বিচারে সাধারণ বাঙ্গালীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। চরিত্রের আলোচনার সময় দেখান হইয়াছে প্রতিটি চরিত্রেই রোদনশীলতা, বাঙ্গালীসুলভ কোমলতা এবং তৎকালোচিত ভক্তিভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য সংস্কৃত মহাভারতের যুধিষ্ঠির কবির রচনায় জ্ঞাতিশত্রু নিগৃহীত ধর্মভীরু সাধারণ বাঙ্গালী। দুর্যোধন প্রতিষ্ঠাকামী বীর নৃপতি নহেন সাধারণ পরস্বঅপহারী দুর্বৃত্ত মাত্র। প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের তেজ ও দর্প দুর্যোধন চরিত্রকেও মাঝে মাঝে কিরূপ মহিমান্বিত করিয়াছে তাহা সংস্কৃত মহাভারত অনুধাবন করিলে বোঝা যাইবে। দুর্যোধন সহায়ক রাজা কর্ণের চরিত্র মহিমা অদ্বিতীয়। পুরুষকারের সহিত প্রতিকূল অদৃষ্টের সংগ্রামে মহিমময় এই চরিত্রে যে রাজটীকা লাঞ্ছিত হইয়াছে, কবি কাশীরামদাসের রচনায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি দুষ্কৃতকারী দুর্যোধনের সহায়ক মাত্র। পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অন্যান্য পাণ্ডবদের চরিত্র বিচারেও এই পার্থক্য। ভীম চরিত্রের মধ্যে যে রূঢ় ভাষণ, যে কঠোরতা ও তেজ প্রকাশিত তাহা কবির মহাভারতে নাই। ভীমের রূঢ়তা বহুলাংশে প্রশমিত বীর্যবত্তা অতিরঞ্জনে অস্বাভাবিক ও হাস্যকর, ঔদরিকতায় ক্ষাত্র মহিমা বিসর্জিত। সংস্কৃত মহাভারতের অর্জুন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আপন বাহুবলে নির্ভরশীল, কৃষ্ণ মহিমায় আত্মনিবেদিত ভক্ত বৈষ্ণব বাঙ্গালী নহেন। সর্বাধিক রূপান্তর সাধিত হইয়াছে কৃষ্ণ চরিত্রে।

সংস্কৃত মহাভারতের পুরুষ চরিত্রের ন্যায় স্ত্রী চরিত্রসমূহও দেশ ও কালের প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতে যে সকল তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণীর সন্ধান পাওয়া যায়, কবির রচনায় তাঁহাদের বাঙ্গালী রমণী রূপেই দেখা যায়। সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সহধর্মিণী, বংশ গৌরবে ও স্বামী সৌভাগ্যে সচেতনা তেজস্বিনী ক্ষাত্র রমণী। অপমানে ও অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া তিনি ক্রন্দন করিয়াছেন কিন্তু ক্রন্দনের সহিত তাঁহার কণ্ঠে ক্রোধের গর্জনও শোনা গিয়াছে। কবি কাশীরাম-দাসের রচনায় অনাথা অসহায়া দুর্বল রমণীর আত্মবিলাপ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে ব্যাকুল প্রার্থনা শোনা যায়। দ্রৌপদীর ন্যায় কুন্তীও কবির রচনায় অসহায়া বিধবা, ভাগ্য বিড়ম্বিতা, জ্ঞাতিশত্রু হস্তে নির্যাতীতা বাঙ্গালী জননী মাত্র। দেশ ও কালের প্রভাবে চরিত্রসমূহে এই রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু আকৃতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রকৃতিগত ব্যবধান সৃজিত হইয়াছে।

চারিত্রিক পরিবর্তনসমূহ সাধিত হইয়াছে জীবনবোধের পরিবর্তনে এবং দেশ ও কালগত প্রভাবে জীবনবোধের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের কাছে বাহুবল প্রকাশ করিয়া শৌর্যে বীর্যে অনন্য হওয়া ছিল জীবনের লক্ষ্য। যিনি অস্ত্রসন্ধানে নিপুণ, রণক্ষেত্রে যাঁর বাহুবল অন্য সকলকে পরাভূত করিতে পারিত, তিনিই সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। শক্তিমত্তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা

সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্রসমূহের অন্তরতম কামনা রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা, দেশের শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করার আকাঙ্খা দুর্যোধন চরিত্রের সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। কর্ণ চরিত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এইখানে। নীচে পড়িয়া থাকা, সুতপুত্রের পরিচয়কে একমাত্র পরিচয় বলিযা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিরুদ্ধ ও সহানুভূতিহীন যে জগৎ অর্জুনেব প্রশংসায পঞ্চমুখ সেই জগতে অর্জুন অপেক্ষাও নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ কবিতে হইবে, এই প্রমাণ কেবল আত্মশ্লাঘার দ্বাবা নহে। কর্মক্ষেত্রে অপরিমিত বীবত্বেব মাধ্যমে। এমন কি রাজা যুধিষ্ঠিরেবও চবিত্র বিশ্লেষণ কবিযা দেখানো হইযাছে যে দুর্যোধনেব সমস্ত রাজ্য অধিকার কবাব জন্যই তিনি দ্যূতক্রীড়ায প্রবৃত্ত হইযাছিলেন। এই সকল বীব ক্ষত্রিয়গণ রণক্ষেত্রে পরস্পবকে স্পর্ধা কবিযাছেন, প্রতিপক্ষেব আঘাতে আহত হইয়া কিছুতেই সেই আঘাতকে স্বীকাব কবিতে পাবেন নাই। দ্বিগুণ শক্তিতে প্রতি-আঘাত করিতে উদ্যত হইযাছেন। সামান্যতম চবিত্রও বাহুবলে, আত্মসম্মানে, প্রতিষ্ঠাব আকাঙ্খাতে এবং আত্মপ্রকাশের বাসনাতে উজ্জ্বল।

এই জীবনবোধ কবি কাশীবামদাসেব কালে ছিল না। শক্তিমত্তার মধ্যে আত্ম-প্রকাশেব পরিবর্তে ভক্তিভাবে বিভোর হইযা আত্মনিবেদনই ছিল জীবনের লক্ষ্য। সেই সময় অপরের নিকট হইতে আঘাত পাইয়া পুনবাঘাত করাব পরিবর্তে সেই আঘাত ক্ষমা করাই ছিল সাধারণ নিযম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে এই সময়ের বাঙ্গালী জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন সুবে বাঁধা। সংস্কৃত মহাভাবতে প্রকাশিত জীবনবোধের ইহা ছিল সম্পূর্ণ বিপবীত। এই সমযেব বাঙ্গালী জীবনবোধ বৈষ্ণব ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই ভাবধাবাব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই নিবন্ধের সূচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে বিবৃত হইযাছে বৈষ্ণব চেতনায় সর্ব অহংকাব বিসর্জন দিয়া নিজেকে দীনাতিদীন বলিয়া মনে করিতে হইবে। "তৃণাদপি সুনীচেন তবোবিব সহিষ্ণুনা" ছিল মহাপ্রভুর উপদেশ। সুতবাং অপবেব আঘাতে প্রতিহিংসায উন্মত্ত হইযা তাহাকে প্রতি আঘাত করিলে চলিবে না, তরুব ন্যায অপাব সহিষ্ণুতায এবং শিশুর প্রতি মাতার যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসায তাহাকে ক্ষমা কবিতে হইবে। ইহাই যাহাদের জীবন বাণী, তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত মহাভাবতের চরিত্রসমূহেব জীবনবোধ স্বীকাব করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য সংস্কৃত মহাভাবতের প্রতি আঘাত ও প্রতিহিংসার পরিবর্তে কবির রচনায় বাঙ্গালীব প্রেম ও ক্ষমাব কথা প্রকাশিত হইযাছে। অহংকারকে সর্ব প্রযত্নে বর্জন করার কথা বলা হইয়াছে। কবি কাশীরামদাস সংযোজিত "অকাল আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ" কাহিনীতে দ্রৌপদীর অহংকার কিরূপে চূর্ণ হইয়াছে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। বনপর্বে ঘোষ যাত্রায দ্বন্দ্ব কলহ অপেক্ষা প্রেম ও ভালোবাসার কথা, দুর্যোধন-কণ্ঠে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইযাছে। দুর্যোধনাদি সকল কৌরব নিগৃহীত হইলে যুধিষ্ঠিবেব আদেশে পাণ্ডবেরা তাঁহাদেব রক্ষা করেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরের মাহাত্ম্যে অভিভূত হইযা দুর্যোধন বলিয়াছেন—

"পূর্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ ঘটিবে॥

ভীমার্জুন হৈতে মোরে তাঁর স্নেহ অতি।
যতনে পালিত মোরে ধর্ম নরপতি॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাই করিনু বিশ্বাস॥" পৃঃ ৫৪৯

সংস্কৃত মহাভারতে দুর্যোধনের কণ্ঠে এই জাতীয় উক্তি একেবারেই সম্ভব নহে। ইহা তাঁহার মূল প্রকৃতির পরিপন্থী। কিন্তু কবির দুর্যোধন একথা সহজেই বলিতে পারিয়াছেন ভীমার্জুন হইতে তাঁহার প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভালোবাসা অধিক। আসলে সংস্কৃত মহাভারতের বিরোধ ও সংগ্রাম বাঙ্গালীর মানসিক আবহাওয়ার অনুকূল নহে। সম্ভবতঃ এইজন্য রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের অনুবাদ পরে আরম্ভ হইয়াছিল। কবি কাশীরামদাসের কৃতিত্ব যে, যুগচেতনার অনুগামী হইয়া সংস্কৃত মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থের তিনি ভাবগত পরিবর্তন সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

মূল্যায়ন

সংস্কৃত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কবি কাশীরামদাসের কাব্য বিচার করিয়া দেখা গেল কবি সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। তিনি সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বনে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফলে দুইটি গ্রন্থ পৃথক প্রকৃতির অধিকারী হইয়াছে। এই পার্থক্যকে ইতিপূর্বের আলোচনায় পরিস্ফুট করা হইয়াছে। বর্তমানে তাহাদের সার সংকলন করিয়া কবির কৃতিত্বের পরিমাপ করা হইল।

সংস্কৃত মহাভারতের অন্যতম পরিচয় তাহার আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারত সেইজন্য তৎকালে আহরিত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ রূপে গৃহীত হয়। কোন অনুবাদকের পক্ষে ইহার আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব হইলেও ইহার সার সংগ্রহ করা এবং তাহার পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর উপযোগী করিয়া উপস্থাপন করা যে একটি অত্যন্ত দুরূহ বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা কবি কাশীরামদাসের বিশেষ কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিষয়বস্তুর আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে সংস্কৃত মহাভারতের যে সকল রীতিনীতি ও বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের আলোচনা আছে সেগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ অথবা পরিপূর্ণ রূপে বর্জন কোনটিই করেন নাই। তাহাদের মধ্যে যেগুলি সাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় এবং কৌতুহলোদ্দীপক সেইগুলিকে অত্যন্ত সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া এরূপে পরিবেশন করিয়াছেন যে তাহারা সাধারণ মানুষের একেবারে মর্মে প্রবেশ করিয়াছে। মহাভারতের বাণী বলিয়া সাধারণ মানুষও তাহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে তাহাদের মানস প্রকৃতি নির্ধারিত হইয়াছে এবং বাংলাদেশের জনসাধারণ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির সহিত কতক অংশে সংযুক্ত হইয়াছে।

মহাভারতের রসধারাই নহে, তাহার শিক্ষাধারাও আবহমান কাল হইতে জাতীয়-জীবনে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহাকে বারে বারে নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। মহাভারতের চিরন্তন শিক্ষা এবং জাতীয় জীবনে তাহার অবদানের কথা প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"মহাভারতের মহৎ সমুজ্জল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন, মহাভারত নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপ একইকালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে, কর্মে, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, তত্ত্বজ্ঞানে বহু ব্যাপক। তারপর ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্ম-গ্রন্থি বার বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য ও অপমানে সে জর্জর, কিন্তু

ইতিহাস বিস্মৃত সে যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক প্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান।"* রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের চিরন্তন শিক্ষার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহার মর্ম গ্রহণ করা একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। ইহা সাধারণ মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার অতীত। কাশীদাসের পাঠক সম্প্রদায় বা শ্রোতৃমণ্ডলী যে শিক্ষাদীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সে সম্বন্ধে কবি বিশেষ সচেতন ছিলেন। সুতরাং মহাভারতের প্রকৃত পরিচয়কে, তাহার আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহকে এবং তাহার চিরন্তন শিক্ষাকে যদি কবি ভাষান্তরিত করিয়া সামগ্রিকভাবে পরিবেশন করিতেন, তাহা হইলে মহাভারতের শিক্ষা সম্ভবতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত হইত না। সংস্কৃত মহাভারতের আলোচিত বিষয়বস্তুকে সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত করিয়া পরিবেশন করায় কবি কেবল ভাষাগত ব্যবধানই দূর করেন নাই, তিনি সংস্কৃত মহাভারতের শিক্ষার স্রোতটিকেও সাধারণের উপযোগী করিয়া অনেকাংশে পরিবেশন করিয়াছেন।

জনমানসের গ্রহণ ক্ষমতা সম্পর্কে কবি যে বিশেষ সচেতন ছিলেন তাহা তাঁহার কাহিনী রচনার মধ্যেও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি কবি কাহিনীর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কারণ কাহিনীর আকর্ষণ সার্বজনীন। এই একই কারণে তিনি কাহিনীকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। কবির কৃতিত্ব এই যে সংস্কৃত মহাভারতের মূল কাহিনীকে তিনি প্রায় অনুসরণ করিয়াছেন। সামান্য দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মূল ঘটনাকে অপরিবর্তিত রাখিয়া ইহার মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করিয়াছেন। মহাভারতের কাহিনী অথবা তাঁহার সংযোজিত অন্য পুরাণ কাহিনীর মধ্যে কখনও পারিবারিক জীবনচিত্র উপস্থাপন করিয়া, কখনও রোম্যান্টিক প্রেমের সৌরভ সঞ্চার করিয়া, অথবা লঘু পরিহাসের বা কৌতুককর ঘটনার সমাবেশ সাধন করিয়া তিনি তাঁহার রচনাকে পৃথক আস্বাদ দান করিয়াছেন।

কাহিনীকে সরল ও লঘুগতি সম্পন্ন করিবার জন্য কবি সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীর পটভূমি বর্জন করিয়াছেন। দীর্ঘ বর্ণনামূলক যে সকল অংশ কাহিনীর মধ্যে পৃথক ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা উচ্চ সাহিত্যরস সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে, কিংবা কাহিনীর মধ্যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সঞ্চার করিয়াছে, সেইগুলি তিনি প্রায় বর্জন করিয়াছেন। কেবল রূপবর্ণনা এবং ভক্তিভাব প্রসূত ভগবত মহিমা বর্ণনা কবির রচনায় স্থান লাভ করিয়াছে, অন্যান্য সকলপ্রকার বর্ণনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বর্ণনামূলক অংশ সমূহ পরিত্যক্ত হওয়ায় কাহিনীর পটভূমি পরিত্যক্ত হইয়াছে। পটভূমির সহিত কবির দেশ কাল ও ব্যক্তি প্রকৃতির প্রভাবে চরিত্রসমূহেরও মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাহাদের বাহ্য সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রধানতঃ সংলাপের পরিবর্তনে, অন্তঃপ্রকৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার বিশদ পরিচয় চরিত্র

---

* রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড), জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার প্রকাশিত পৃঃ ৬৮০

আলোচনার সময় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ফল স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি দুর্যোধনাদি কৌরবেরা দাম্ভিক, শক্তিশালী, ক্রুর, অত্যাচারীতে পরিণত হইয়াছেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব জ্ঞাতিশত্রু হস্তে নিগৃহীত সহায়সম্বলহীন দরিদ্র আত্মীয়ে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ইহার ফলে সংস্কৃত মহাভারতের রাজপরিবারের অন্তর্বিরোধের মধ্যে যে রাজনৈতিক শক্তির উত্থানপতনের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কবির রচনায় আমাদের পরিচিত জগতের জ্ঞাতি-বিরোধে পর্যবসিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতেও বিরোধ ও সংঘাত জ্ঞাতিদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানেও ধর্মের সহিত অধর্মের সংঘাতের কথা বলা হইয়াছে। সপ্ত অক্ষৌহিণী শক্তির নিকট একাদশ অক্ষৌহিণী শক্তি পরাভূত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে ক্ষাত্র বীর চরিত্রসমূহের প্রকৃতি এবং কাহিনীর পটভূমি এতই পৃথক যে তাহার ব্যঞ্জনাও পৃথক। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করিয়াছে কৃষ্ণ চরিত্রের প্রকৃতিগত পরিবর্তন এবং কাহিনী নিয়ন্ত্রণে তাঁহার ভূমিকা। সংস্কৃত মহাভারতে কৃষ্ণ তাঁহার দৈবী মহিমাতে কোন কোন সময় কাহিনী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার দৈব সত্তা অপেক্ষা মানবিক বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত মহাভারতে অধিকতর প্রকাশিত, পক্ষান্তরে কবির রচনায় কৃষ্ণ সম্পূর্ণ রূপেই দীনতারণ ভগবান। সহায়-সম্বলহীন আর্ত পাণ্ডবদের অচলা ভক্তিতে তাহাদের সর্ববিপদে উদ্ধার সাধন করিয়া দীনতারণ নামের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু চারিত্রিক এই পরিবর্তনের সহিত কৃষ্ণের ভূমিকারও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারত কবির রচনায় কৃষ্ণ কথায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে আসিয়াছে জীবনবোধের আমূল পরিবর্তন। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদাব সংগ্রামের পরিবর্তে পাওয়া গিয়াছে কৃষ্ণভক্তিতে ভগবৎ চরণে নিঃশেষ আত্মনিবেদনের কথা। ইহা বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। দেশ, কাল ও কবির ব্যক্তিপ্রকৃতির প্রভাবে তাঁহার রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের মূল সুব পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালীর অন্তরের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

কাহিনীর ও জীবনবোধের রূপান্তর রসেরও রূপান্তর সাধন করিয়াছে। কবির রচনায় ভক্তিরসই হইয়াছে মূলরস। ভক্তিরস এবং ইহাব অনুষঙ্গী করুণরস কবির কাহিনীক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে। সূচনায মধুব রসের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাও বাঙ্গালীর মানসপ্রকৃতির এবং বাংলা সাহিত্য ধারার অনুগামী। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে যে অপূর্ব রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় কবির রচনায়ও সেই বর্ণনার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয। মধুর রূপ বর্ণনা এবং প্রেমের রোম্যান্টিক কাহিনী বর্ণনার দ্বারা কবি মধুর রসের অবতারণা করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতেও সূচনাতে মধুর রসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষযে সংস্কৃত মহাভারতের সহিত ঐক্য থাকিলেও ব্যবধান স্বল্প নয়। দুটি যে পৃথক সুরের তাহা সহজেই বোঝা যায়। একটিতে মহাকাব্যের মহিমময় শান্ত গম্ভীর পরিমণ্ডল অপরটিতে পরিচিত জগতের তরল আবহাওয়া বিদ্যমান।

সংস্কৃত মহাভারতে সূচনায় মধুর রসের এবং পবে রৌদ্র ও বীর রসের অবতারণা করা হইয়াছে। পরে করুণ রসের ধারা বহিয়াছে। ইহার পূর্বে করুণ রসের যে সন্ধান পাওয়া যায় তাহা অতীব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু কবির রচনায় মধুর রসের সহিত যুক্ত হইয়াছে হাস্যরস যাহা সংস্কৃত মহাভারতে একেবারেই নাই। হাস্যরসের আবেদন

সহজ ও সার্বজনীন। ইহা ছাড়া ভক্তি ও করুণরসে কবির কাহিনী ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্লাবিত হইয়াছে। ফলে সংস্কৃত মহাভারত মহাকাব্যের ভাব গাম্ভীর্য ও গৌরব সমুন্নতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল কাহিনীর মধ্যে পরিচিত পারিবারিক জীবন-চিত্রসমূহ সংযোজিত হওয়ায়, তরল পরিহাস মুখর এবং কৌতুককর ঘটনাসমূহের সমাবেশ ঘটায় এবং চরিত্র-সমূহের ও জীবনবোধের পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এবং ইহাদের অনিবার্য ফলস্বরূপ অভিব্যক্ত রসের পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় কবির রচনা মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর প্রাণের সম্পদে পরিণত হইযাছে।

সবশেষে আর একটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া এ আলোচনার উপসংহার করিব। সাধারণ ভাবে প্রচলিত আছে কবি কাশীরামদাস নাকি সংস্কৃত জানিতেন না। কথকমুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করেন। এ বিষয়ে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত বঙ্গবাসী সংস্করণ মহাভারতের ভূমিকায় একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে। প্রথমে তাহা উদ্ধৃত হইল—"কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন কি না ইহা লইয়া সমালোচক সমাজে মতদ্বৈধ আছে। একদল বলেন কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, তিনি কথক-যাত্রাওয়ালার স্থানে শুনিয়া পয়ার রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ বাদিগণ তাঁহাদের নিজবাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য কাশীরামের রচিত একটি পয়ার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করেন। সে পয়ারটি এই—

"শ্রুতিমাত্র লিখি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"

কিন্তু আমরা এই পাঠটি ঠিক পাঠ বলিয়া মনে করি না। আমাদের সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে যে খানি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সে খানির পাঠ—'সূত্র মাত্র লিখি আমি রচিয়া পয়ার' এইরূপ। এ প্রকার পাঠ বৈষম্য হইবার কারণও আমরা স্থির করিয়াছি। তাহা এই—যাহারা প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি পড়িয়া থাকেন তাঁহারা জানেন সেকালের 'সূ' আর একালের মুদ্রিত 'শ্রু' একই প্রকার। এজন্য আমরা মনে করি পূর্ব মুদ্রাকরগণ সূ-স্থানে শ্রু করিয়াই কাশীরামদাসকে অসংস্কৃতজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। বাদিগণেরা উপরি উক্ত একটি প্রমাণ ভিন্ন যে অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। আরও ওই পয়ারের পরবর্তী দুই পঙক্তি পাঠ করিলেও তাঁহাদের সংশয় অপনোদিত হইতে পারে।

"শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত রচিত মুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥........."

যে দুইটি ছত্র কবির রচনা তথা কবির সংস্কৃত জ্ঞান সম্পর্কে প্রভূত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, সেই রহস্যের কিছুটা সমাধান করা হইয়াছে পূর্ব উদ্ধৃতিতে। কবির রচনা বিশ্লেষণ করিয়া, সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াও অনেকে কবির সংস্কৃত জ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় গীতা ধ্যানের সপ্তম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত কবির রচনাংশের ঐক্য দেখাইয়াছেন। আমরাও দেখিয়াছি কবি তাঁহার

কাহিনী রচনায় প্রচলিত পুরাণ হইতে নব কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন। অধিকন্তু ইতিপূর্বের আলোচনার সময় প্রায়শঃই দেখা গিয়াছে কবি কত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়াছেন। কবির সংস্কৃত জ্ঞান এবং সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে কবির রচনায় সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদের পরিমাণও কম নয়। 'পরিশিষ্ট' 'চ'-তে এই অনুবাদের পরিমাণ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে কথকমুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এইরূপে কাব্য রচনা সম্ভব নহে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞান ও পরিণত প্রতিভা লইয়া কবি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর রস পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং মহাভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির সহিত তাহার পরিচয় সাধিত হইয়াছে। সর্বোপরি কবির রচনা সংস্কৃত মহাভারতের ন্যায় বিশাল ও জটিল গ্রন্থ অনুবাদের একটি সহজ ও সরল পথ নির্দেশ করিয়াছে এবং ইহার ফল স্বরূপ বহু কবি মহাভারতের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অথবা কোন না কোন অংশ অনুবাদ করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করিয়াছেন। এইরূপে সমগ্র মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আমরা পাইয়াছি। সেইজন্য আমাদের সমগ্র আলোচনা স্মরণে রাখিয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলিতে পারি—

"হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।"

পরিশিষ্ট—'ক'

কবি কাশীরামদাসের নামে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্ব ও উপাখ্যান এবং তাহাদের পুঁথি সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	পর্বের/উপাখ্যানের নাম		প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা
১।	অজ্ঞাত পর্ব	...	৪৫৩
২।	অনুশান্তি পর্ব	...	৭৭
৩।	অনুশাসন পর্ব	...	৩
৪।	অনুশৌচিক পর্ব	...	১
৫।	অভিষেক পর্ব	..	৫
৬।	অরণ্য পর্ব	...	৩
৭।	অশ্বমেধ পর্ব	...	১৬৮
৮।	অষ্টাদশ পর্ব	...	১
৯।	আদি পর্ব	...	৩১১
১০।	আশ্রমিক পর্ব	...	৮১
১১।	আশ্চর্য পর্ব	...	১১
১২।	উদ্যোগ পর্ব	...	১১৭
১৩।	ঊনশান্তি পর্ব	...	১
১৪।	ঐষিক পর্ব	...	৪২
১৫।	কর্ণ পর্ব	...	১১৫
১৬।	কৌশিক পর্ব	...	১
১৭।	গদা পর্ব	...	১৪০
১৮।	জন্ম পর্ব	..	১
১৯।	জল পর্ব	...	২
২০।	জান পর্ব	...	৬
২১।	জানু পর্ব	...	২
২২।	জ্ঞান পর্ব	...	৩
২৩।	দণ্ডী পর্ব	...	৮
২৪।	দান পর্ব	...	১১
২৫।	দ্রোণ পর্ব	...	১৬১
২৬।	দ্বৈপায়ন পর্ব	...	২
২৭।	নারী পর্ব	..	৪১

ক্রমিক সংখ্যা	পর্বের/উপাখ্যানের নাম		প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা
২৮।	পয়ান পর্ব	...	২
২৯।	বনপর্ব	...	৬৫
৩০।	বিরাট পর্ব	...	৩৪০
৩১।	বৃহৎ শাস্তি পর্ব	...	৪
৩২।	বৃহৎ সভা পর্ব	...	১
৩৩।	ব্যাসাশ্রম পর্ব	...	২
৩৪।	ভীষ্ম পর্ব	...	১৩৮
৩৫।	মুহাপ্রস্থান পর্ব	...	২
৩৬।	মৌষল পর্ব	...	৭৯
৩৭।	যজ্ঞ পর্ব	...	১
৩৮।	যান পর্ব	...	১৬
৩৯।	শক্তি পর্ব	...	১
৪০।	শল্য পর্ব	...	৯০
৪১।	শান্তি পর্ব	...	১১২
৪২।	শোচশান্তিপর্ব	...	১
৪৩।	শাসন পর্ব	...	১
৪৪।	সন্ধি পর্ব	...	২
৪৫।	সভা পর্ব	...	১৫৫
৪৬।	সৈনিক পর্ব	...	১
৪৭।	সৌপ্তিক পর্ব	...	৬৬
৪৮।	স্ত্রী পর্ব	...	৪৮
৪৯।	স্বপ্ন পর্ব	...	১৩
৫০।	স্বর্গারোহণ পর্ব	...	১৩৬
৫১।	স্বস্তি পর্ব	...	১
৫২।	স্বস্তিক পর্ব	...	২
৫৩।	অনুভাব পর্ব	...	২
৫৪।	অভিমন্যু পালা	...	১
৫৫।	অভিমন্যু বধ	...	২
৫৬।	অভিমন্যু যুদ্ধ	...	১
৫৭।	অর্জুন ও কর্ণ যুদ্ধ	...	১
৫৮।	অশ্বত্থামা মণিহরণ	..	৩
৫৯।	আদি সমুদ্রমন্থন	...	১
৬০।	কলি মোচন	...	১
৬১।	কুন্তী বাণ ভিক্ষা	...	৩
৬২।	কুরু রায়বার	...	১

ক্রমিক সংখ্যা	পর্বের/উপাখ্যানের নাম		প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা
৬৩।	কৃষ্ণার্জুন সংবাদ	...	১
৬৪।	জন্মেজয় উপাখ্যান	...	১
৬৫।	দণ্ডী রাজা উপাখ্যান	..	১
৬৬।	দাতা কর্ণ	...	২
৬৭।	দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ	...	২
৬৮।	নল উপাখ্যান	..	১
৬৯।	নিষাদ চণ্ডাল কথা	...	১
৭০।	পাণ্ডব বিজয়	...	১
৭১।	পাণ্ডব মিলন	..	২
৭২।	পাতড়া	..	২
৭৩।	বীরবাহু যুদ্ধ	...	১
৭৪।	মৎস্য রাজা	...	১
৭৫।	রাজসূয় যজ্ঞ	...	২
৭৬।	রাম রাবণ যুদ্ধ	..	১
৭৭।	সর্প যজ্ঞ-আস্তীক উপাখ্যান	...	১
৭৮।	সাবিত্রী উপাখ্যান	..	৬
৭৯।	কিরাত পর্ব	...	১

মোট পুঁথি সংখ্যা—৩১১৯

পরিশিষ্ট—‘খ’

মহাভারত রচয়িতা—কবিগণ
বর্ণানুক্রমিক নাম সূচী

১। অভিরাম দ্বিজ
২। অম্বরীষ কবি
৩। অম্বুষ্ঠ বল্লভ
৪। আদিত্যরাম
৫। কবিকংকণ চক্রবর্ত্তী
৬। কবিচন্দ্র দ্বিজ
৭। কবি বল্লভ
৮। কবিরাজ দ্বিজ
৯। কবীন্দ্র পরমেশ্বর
১০। কালিদাস
১১। কাশীরামদাস
১২। কাশীশেখর
১৩। কীর্তিচন্দ্র দ্বিজ
১৪। কুমুদানন্দ দত্ত
১৫। কৃষ্ণজীবন
১৬। কৃষ্ণদাস
১৭। কৃষ্ণদেব
১৮। কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
১৯। কৃষ্ণমোহন কুণ্ডু
২০। কৃষ্ণরাম
২১। কৃষ্ণরাম দাস
২২। কৃষ্ণরাম দ্বিজ
২৩। কৃষ্ণানন্দ বসু
২৪। কেশব মিত্র
২৫। কৌশরি
২৬। গঙ্গাদাস সেন
২৭। গঙ্গাধর সেন
২৮। গঙ্গাধর দাস
২৯। গুণরাজ খাঁ
৩০। গোপালরাম নাগ দাস
৩১। গোপীনাথ দত্ত
৩২। গোপীনাথ দ্বিজ
৩৩। গোপীনাথ পাঠক
৩৪। গোবর্দ্ধন দ্বিজ
৩৫। গোবিন্দ চরণ
৩৬। গোবিন্দ দাস
৩৭। গৌরী কান্ত
৩৮। ঘনশ্যাম দাস
৩৯। চণ্ডীশীল সুত
৪০। চন্দন দাস
৪১। ছুটি খাঁ
৪২। জগদানন্দ
৪৩। জগন্নাথ কবিবল্লভ
৪৪। জয়কৃষ্ণ নন্দী
৪৫। জয়দেব
৪৬। জয়ন্ত দাস
৪৭। জয়ন্তী দেব
৪৮। জিত ঘটক
৪৯। জৈমিনি
৫০। তনয় শেখর
৫১। তীর দাস
৫২। ত্রিলোচন চক্রবর্তী
৫৩। দৈবকী নন্দন
৫৪। দ্বারিকানাথ
৫৫। দ্বৈপায়ন
৫৬। দ্বৈপায়ন দাস
৫৭। নন্দরাম দাস
৫৮। নিত্যানন্দ দাস
৫৯। নিতানন্দ ঘোষ (দাস)
৬০। নিত্যানন্দ দাস
৬১। নিমাই পণ্ডিত
৬২। পঞ্চানন বৈদ্য

৬৩। পরমানন্দ
৬৪। পরাগল খাঁ
৬৫। পার্বতী নাথ
৬৬। পুরুষোত্তম দাস
৬৭। প্রেমানন্দ দাস
৬৮। প্রেমানন্দ দ্বিজ
৬৯। বলরাম দ্বিজ
৭০। বাগেশ্বরী প্রসাদ
৭১। বাঞ্ছারাম ধর
৭২। বালিনাথ সুত
৭৩। বাসুদেব
৭৪। বিজয় পণ্ডিত
৭৫। বিশ্বনাথ সুত
৭৬। বিশ্বেশ্বর ধর
৭৭। বৈদ্যনাথ দ্বিজ
৭৮। ব্রজসুন্দর দ্বিজ
৭৯। ভক্ত নারায়ণ
৮০। ভবানন্দ দীন
৮১। ভবানী দাস
৮২। ভানু নারায়ণ
৮৩। মধুসূদন বৈদ্য
৮৪। মনোহর দাস
৮৫। মহীনাথ দ্বিজ
৮৬। মহীন্দ্র কবি
৮৭। মাধব চন্দ্র
৮৮। মাধব দ্বিজ
৮৯। মুকুন্দ দাস
৯০। মোহন পালিত
৯১। রঘুনাথ দত্ত
৯২। রঘুরাম দ্বিজ
৯৩। রাজমোহন দাস
৯৪। রাজারাম দত্ত
৯৫। রাজারাম দাস
৯৬। রাজীব সেন
৯৭। রাজেন্দ্র দাস
৯৮। রাধাকান্ত দাস
৯৯। রামচন্দ্র খাঁন
১০০। রামচন্দ্র দ্বিজ
১০১। রামচরণ ঘোষ
১০২। রামচরণ চক্রবর্তী
১০৩। রামনন্দন দ্বিজ
১০৪। রামনাথ
১০৫। রাম নারায়ণ
১০৬। রামনারায়ণ ঘোষ
১০৭। রামনারায়ণ দত্ত
১০৮। রামমাণিক দ্বিজ
১০৯। রামরত্ন দ্বিজ
১১০। রামরাম দাস
১১১। রাম লোচন
১১২। রাম সুর দাস
১১৩। রামানাথ
১১৪। রামেশ্বর দাস
১১৫। রামেশ্বর নন্দী
১১৬। রুদ্রদেব দ্বিজ
১১৭। লোকনাথ দত্ত
১১৮। শম্ভু দাস
১১৯। শিব কর
১২০। শিব রাম
১২১। শিবানন্দ দত্ত
১২২। শেখর কবি
১২৩। শ্রীকর নন্দী
১২৪। শ্রীধর নন্দী
১২৫। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ
১২৬। ষষ্ঠীধর
১২৭। ষষ্ঠীবর
১২৮। ষষ্ঠীবর সুত
১২৯। সঞ্জয়
১৩০। সদানন্দ নাথ
১৩১। সাগর বসু
১৩২। সারণ কবি
১৩৩। সুবুদ্ধিরাম দাস
১৩৪। সুবুদ্ধি রায়
১৩৫। হরিদাস দ্বিজ
১৩৬। হরিরাম দ্বিজ
১৩৭। হরেন্দ্র নারায়ণ

পরিশিষ্ট—'গ'

কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রিত সংস্করণ

কবি কাশীরামদাস চারিপর্ব মহাভারত রচনা করিলেও তাঁহার নামে যেমন অন্যান্য পর্বের অসংখ্য পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তেমনই বাংলা ভাষায় বহু পূর্ণাঙ্গ কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রথম কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ১৮৫৪ সালে শোভাবাজার বটতলার ব্যবসায়ী শ্রীমধুসূদন শীল মহাভারত প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে অসংখ্য বটতলার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাদের অধিকাংশের সন্ধান পাওয়া আজ দুর্লভ। যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের এবং অন্যান্য কাশীদাসী সংস্করণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	সম্পাদকের ও প্রকাশকের নাম	প্রকাশের তারিখ ও স্থান
১।	মহাভারত ৪ খণ্ড	জয়গোপাল তর্কালংকার সম্পাদিত মার্শম্যান সাহেব প্রকাশিত	১৮০২ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস
২।	মহাভারত—দুই বালস	জয়গোপাল তর্কালংকার সম্পাদিত	১৮৩৬
৩।	মহাভারত—আদি সভা, বন—বিরাট প্রভৃতি অষ্টাদশ পর্ব	মধুসূদন শীল প্রকাশিত	১৮৫৪ শোভাবাজার বটতলা
৪।	মহাভারত দুই খণ্ড	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত	১২৬২
৫।	মহাভারতীয় উদ্যোগপর্ব	—	১২৬৪
৬।	মহাভারত—ভীষ্মপর্ব	—	১৮৫৭
৭।	মহাভারত	—	১৮৬৭
৮।	ঐ	—	১৮৬৮
৯।	ঐ	—	১২৭৬
১০।	মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব	—	১২৭৬
১১।	মহাভারত	—	১৮৭৫
১২।	ঐ	—	১৮৭৬
১৩।	ঐ	—	১৮৭৭

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	সম্পাদকের ও প্রকাশকের নাম	প্রকাশের তারিখ ও স্থান
১৪।	মহাভারত (অন্য সংস্করণ)	—	১৮৭৭
১৫।	ঐ	—	১৮৭৮
১৬।	ঐ	—	১৮৮০
১৭।	মহাভারত স্বপ্ন পর্ব	—	১৮৮০
১৮।	বৃহৎ মহাভারত—২য় সংস্করণ	—	১৮৮০
১৯।	মহাভারত	—	১৮৮১
২০।	মহাভারত—৩য় সংস্করণ	—	১৮৮১
২১।	মহাভারত আদি পর্ব	দুর্গাচরণ প্রকাশিত	১৮৮২, ১৮৮৪ (২য় সংস্করণ) ১৮৮৬ (৩য় সংস্করণ)
২২।	মহাভারত	—	১৮৮৮
২৩।	ঐ —৩য় সং	—	১৮৮৯
২৪।	ঐ (অপর সং)	—	১৮৮৯
২৫।	মহাভারত	—	১৮৮৯
২৬।	ঐ	—	১৮৯০
২৭।	ঐ	—	১৮৯৮
২৮।	ঐ	—	১৯০৩
২৯।	মহাভারত দান পর্ব	শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	১৩১৫
৩০।	মহাভারত	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত	১৯০৮
৩১।	ঐ	—	১৯০৯
৩২।	মহাভারত—১০ম সং	—	১৯১০
৩৩।	মহাভারত	—	১৯১০
৩৪।	মহাভারত	দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত	১৯১২
৩৫।	ঐ	—	১৯১৩
৩৬।	ঐ	আশুতোষ দেব সম্পাদিত	১৯১৪
৩৭।	ঐ	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	১৯১৬
৩৮।	ঐ	বঙ্গবাসী সংস্করণ	১৯১৭
৩৯।	মহাভারত—৩য় সংস্করণ	দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত	১৯১৮
৪০।	মহাভারত	সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত	১৯২৩
৪১।	মহাভারত	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	১৯২৬
৪২।	মহাভারত আদি পর্ব	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত	১৩৩৫

ব. বি./কাশীরামদাস/২৪-১২

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	সম্পাদকের ও প্রকাশকের নাম	প্রকাশের তারিখ ও স্থান
৪৩।	মহাভারত—৭ম সং	দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত	১৯২৬
	(১৯৩৪-এ অপর দুই সংস্করণ প্রকাশিত হয়)		
৪৪।	অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত—২য় সংস্করণ	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ভূমিকা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধ সম্বলিত।	—
৪৫।	কাশীদাসী সচিত্র মহাভারত	—	১৯৩২
৪৬।	মহাভারত	প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	১৯৩৭
৪৭।	মহাভারত—দুই খণ্ড	পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সম্পাদিত	১৯৩৭
৪৮।	মহাভারত	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	১৩৬৯

পরিশিষ্ট—'ঘ'

মহাভারত আশ্রয়ী-রচনা

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রকাশের তারিখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১।	অর্জুন	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৩২২	১২০
২।	অর্জুনের লক্ষ্যভেদ	তিনকড়ি বিশ্বাস	১৮৭৬	৫৬
৩।	অর্জুনের গৌরব ভঙ্গ	মহেশচন্দ্র দে	১৮৫৬	২২
৪।	অর্জুন বধ	নন্দলাল রায়	১৮৭৯	৫৮
৫।	অভিমন্যু বধ যাত্রা	নফরচন্দ্র দত্ত	১৮৭৯ (২য় সং)	৩২
৬।	সচিত্র অভিমন্যু বধ যাত্রা	ঐ	১৮৮১	৩৪
৭।	অভিমন্যু বধ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১২৮৮	১০৯
৮।	অভিমন্যু বধ কাব্য	অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬৮	১০৭
৯।	অভিমন্যু বধ যাত্রা	অক্ষয়কুমার দে	১৮৭৮	৬৮
১০।	অভিমন্যু বধ নাটক	নন্দলাল রায়	১২৮৬	৩৫
১১।	অভিমন্যু যাত্রা	ঐ	১২৮৯	৪৪
১২।	অভিমন্যু বধ	—	—	৯৪
১৩।	অভিমন্যু বধ নাটক	ঈশ্বরচন্দ্র সরকার	১৮৭৭	৬০
১৪।	অভিমন্যু বধ নাটক	নরেন্দ্রকুমার শীল	১৮৭৯	৪৬
১৫।	অভিমন্যু বধ নাটক	প্রাণচন্দ্র দাস	১৮৭৬	৬০
১৬।	অভিমন্যু বধ নাটক	তিনকড়ি বিশ্বাস	১৮৮০	৪৬
১৭।	অভিমন্যু বধ যাত্রা	ঐ	১৮৮০	৪৮
১৮।	অভিমন্যু বধ যাত্রা	কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৭৮	৭০
১৯।	উতঙ্ক	দীনেশরঞ্জন দাস	১৮৮৭	—
২০।	কর্ণার্জুন	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯২৩	—
২১।	কংস বধ	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৭৫	৭২
২২।	কংস বিনাশ কাব্য	দীননাথ ধাড়া	১৮৬২	১০০
২৩।	কীচক বধ কাব্য	হরিশচন্দ্র মিত্র	১৮৭৮ (ঢাকা)	৯২
২৪।	কেশবার্জুন	রামগোপাল ভট্টাচার্য	১৩৪০	১২৭
২৫।	কৌরব বিয়োগ	হরচন্দ্র ঘোষ	১৮৫৮	১৭৬
২৬।	কুরুক্ষেত্র উপাখ্যান	শ্যামাচরণ দাস	১৮৭৫	৮৭
২৭।	কুরুক্ষেত্রে দশ দিন	যতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩০৯	১৮৩
২৮।	কুরুক্ষেত্র	নবীনচন্দ্র সেন	—	—

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রকাশের তারিখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
২৯।	খাণ্ডবদহন কাব্য	ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৯১৯	—
৩০।	গান্ধারীর বিলাপ	ভুবনমোহন ঘোষ	১৮৭০	৪০
৩১।	চিত্রাঙ্গদা	অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	১৯২৫	—
৩২।	জনা	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	১৯৩৪	—
৩৩।	জরাসন্ধ বধ নাটক	কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৭৮	—
৩৪।	জয়দ্রথ বধ	রামরতন পাঠক	১২৯২	১০৬
৩৫।	জয়দ্রথ বধ	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮০৬ (শক)	১২৭
৩৬।	জয়দ্রথ বধ নাটক	প্রাণচন্দ্র দাস	১৮৮০	—
৩৭।	দণ্ডীপর্ব গীতাভিনয় বা উর্বশীর শাপমোচন	অহিভূষণ ভট্টাচার্য	১৯০৩	—
৩৮।	দণ্ডীরাজার উপাখ্যান	—	—	—
৩৯।	দময়ন্তী	অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	১৯২৭	—
৪০।	দময়ন্তী বিলাপ	প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬৮	৩৩
৪১।	দময়ন্তী	রাধানাথ মিত্র	—	৭২
৪২।	দুর্যোধনের উরুভঙ্গ	'শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য	১২৯৮	৪০
৪৩।	দুর্যোধন	উপেন্দ্রনাথ নাগ	—	—
৪৪।	দুর্যোধন বধ কাব্য	জীবনকৃষ্ণ ঘোষ	১২৯৩	১২০
৪৫।	দুর্যোধনের উরুভঙ্গ যাত্রা	কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৮০	৬৬
৪৬।	দুর্যোধনের দর্পচূর্ণ	ঐ	১৮৭৭	১০৪
৪৭।	দুষ্মন্ত কীর্তি	ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়	১৯২২	—
৪৮।	দাতা কর্ণ	বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৫	৫১
৪৯।	দ্রৌপদী হরণ	দুর্গাচরণ দত্ত	১২৯৫	৮৮
৫০।	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৩৩৪	১৮৫
৫১।	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যাত্রা	কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়	১২৮১ (২য় সং)	৪৮
৫২।	দ্রৌপদী বিলাপ নাটক	কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৮০	৬৬
৫৩।	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	মতিলাল রায়	১৮৮১	১৬১
৫৪।	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	নফরচন্দ্র দত্ত	১৮৮১	৫৮
৫৫।	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যাত্রা	উদয়নারায়ণ ভাদুড়ী	১৮৭৬ (বোয়ালিয়া)	১০৮
৫৬।	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	তিনকড়ি বিশ্বাস	১৮৮১	—
৫৭।	দ্রৌপদী	ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯৩৭	—
৫৮।	দ্রোণ সংহার	ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়	১৯২৬	—
৫৯।	ধ্রুব যোগাখ্যান	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৭৭	৭২
৬০।	ধ্রুব তপস্যা নাটক	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	১৮৭৩	৭২
৬১।	ধ্রুবোপাখ্যান	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৩	৬২

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রকাশের তারিখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
৬২।	ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	অঘোরনাথ গুপ্ত	১৯১০	—
৬৩।	ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	ধীরেন্দ্রনাথ বসু	১৮৭৬	—
৬৪।	নলোপাখ্যান	হারাধন ভট্টাচার্য	১৯১২	—
৬৫।	নল দময়ন্তী গীতাভিনয়	অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী	১৯২৬	—
৬৬।	নলদময়ন্তী নাটক	কালিদাস সান্যাল	১২৭৪	১০০
৬৭।	নল দময়ন্তী	মধুসূদন ভট্টাচার্য	১৩১৮	১৪৮
৬৮।	নল দময়ন্তী নাটক	অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	—
৬৯।	নল দময়ন্তী নাটক	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৭৯	৮৮
৭০।	নল দময়ন্তী নাটক	প্রাণচন্দ্র দাস	১৮৮০	৪৪
৭১।	নল দময়ন্তী কাব্য	কিশোরীলাল রায়	১৮৭২	১০২
৭২।	নল দময়ন্তী নাটক	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	১৮৮৭	—
৭৩।	নল দময়ন্তী পালা	ঐ	১৯২৩	—
৭৪।	নল দময়ন্তী	হারাধন রায়	১৯০৫	—
৭৫।	নল দময়ন্তী	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১৯০৩	—
৭৬।	নহুষ উদ্ধার	অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	—	—
৭৭।	নিবাত কবচ বধ	মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি	১৮৮৩ (২য় সং)	৩৪০
৭৮।	পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ	প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়	—	৩৫৫
৭৯।	পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ	সুরথনাথ ভট্টাচার্য	১২৯৩	১২০
৮০।	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৭৫	৪০
৮১।	পাণ্ডব বনবাস	শরৎচন্দ্র গুপ্ত	১২৯২	৯৪
৮২।	পাণ্ডব চরিত	হৃদয়রঞ্জন খাঁ	১৩০৪	১৮৮
৮৩।	পাণ্ডব বিলাপ কাব্য	হরিপদ কোঁয়ার	—	—
৮৪।	পাণ্ডব বিলাপ নাটক	অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৮১	১৪৬
৮৫।	পাণ্ডব চরিত	ভুবনমোহন রায় চৌধুরী	১৮৭৬	—
৮৬।	পাণ্ডব গৌরব	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	১৯০০	—
৮৭।	পারিজাত হরণ	রামচন্দ্র নাগ	১৩০৬	১১১
৮৮।	পারিজাত হরণ	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৮১	৪৪
৮৯।	পারিজাত হরণ	—	—	৭২
৯০।	প্রহ্লাদ চরিত নাটক	মহেশচন্দ্র দাস	১২৯৭	৪৮
৯১।	প্রহ্লাদ মহিমা বা প্রহ্লাদ চরিত্র—২য় খণ্ড	রাজকৃষ্ণ রায়	১২৯৭	১৫১
৯২।	প্রহ্লাদ নাটক	—	১৮৭২ (ঢাকা)	১৭৯
৯৩।	প্রহ্লাদ	অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	১৯০৫	—
৯৪।	প্রহ্লাদ চরিত্র	অক্ষয়কুমার ঘোষ	১৯০২	—

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রকাশের তারিখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
৯৫।	প্রহ্লাদ চরিত	অটলবিহারী দাস	১৮৭৮	৪৩
৯৬।	বভ্রুবাহনের যুদ্ধ	অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল	—	—
৯৭।	বলি দমন বা বামন ভিক্ষা গীতাভিনয়	অহিভূষণ ভট্টাচার্য	১৯১১ —	— —
৯৮।	বিরাট পর্ব বা উত্তরা পরিণয় গীতাভিনয়	ঐ	১৩০৮	১১০
৯৯।	বিশ্বামিত্র	হরিশচন্দ্র সান্যাল	১৩১৮	১৮৭
১০০।	বৃহন্নলা নাটক	মদনমোহন মিত্র	১২৮০	৬৭
১০১।	বৃষকেতু বা দাতাকর্ণ গীতাভিনয়	—	—	—
১০২।	বভ্রুবাহনের যুদ্ধ	তিনকড়ি বিশ্বাস	১৮৮০	৭০
১০৩।	বেণী সংহার নাটক	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০৮	১৫৯
১০৪।	বেণী সংহার নাটক	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৯১৩ (সম্বৎ)	৯৬
১০৫।	বেণী সংহার নাটক	ভট্টনারায়ণ কৃত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত	১৮৫৫	১২৪
১০৬।	বেণী সংহার নাটক	নারায়ণ ভট্ট	১৮৭০	—
১০৭।	ভদ্রার্জুন	তারাচরণ শিকদার	১৭৭৪ (শক)	১৪২
১০৮।	ভদ্রোদ্বাহ কাব্য	হরিচরণ চক্রবর্তী	১৭৮২ (শক)	৪৮
১০৯।	ভদ্রা	ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১৩১৭	১৮২
১১০।	ভীম বিক্রম বা কীচক বধ নাটক	অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ	১৮৭৮	৪২
১১১।	ভীষ্ম বিক্রম বা কীচক বধ নাটক	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৯১৩	—
১১২।	ভীষ্ম	শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৩২০	১২৫
১১৩।	ভীষ্মের শরশয্যা	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৮৮৫	—
১১৪।	ভীষ্মের শরশয্যা —১ম খণ্ড	নবীনচন্দ্র কর্মকার	১২৯২	২১৩
১১৫।	ভীষ্ম চরিত	রজনীকান্ত গুপ্ত	১৮৯৭ (৪র্থ সং)	১৪
১১৬।	ভীষ্ম চরিত—১ম খণ্ড	হরিনারায়ণ মিত্র	১২৯৫	১৭১
১১৭।	যুধিষ্ঠিরোপাখ্যান	মাখনলাল ঘোষ	১৮৬৮	৮৮
১১৮।	যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষেক	বিনোদবিহারী মল্লিক	১৮৮০	৫৬
১১৯।	রাজসূয় যজ্ঞ বা শিশুপাল বধ	অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	১৯২৬	—
১২০।	শকুন্তলা	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১৫	৯৫
১২১।	শকুন্তলা উপাখ্যান	পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য	১৩১৪	—

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রকাশের তারিখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১২২।	শকুন্তলা উপাখ্যান	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলিত	১৯১১ (সম্বৎ) —	১১২ —
১২৩।	মহাভারতীয় শকুন্তলা উপাখ্যান	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	১৭৭৯	৫০
১২৪।	শকুন্তলা নাটক	নন্দলাল রায়	১৮৮০	৬৬
১২৫।	অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক	—	১৮৮১ (ঢাকা)	৫৪
১২৬।	শকুন্তলা	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৩০	—
১২৭।	শকুন্তলা নাটক	নন্দকুমার রায়	—	—
১২৮।	শকুন্তলা	অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত	১৯৩৭ (ঢাকা)	—
১২৯।	শর্মিষ্ঠা	মধুসূদন দত্ত	১২৮২ (৪র্থ মুদ্রণ)	৮৪
১৩০।	শ্রীবৎস নাটক	শশিভূষণ মিত্র	১৮৭৮ (সিলেট)	৩৫
১৩১।	শ্রীবৎস চিন্তা	রাধানাথ মিত্র	১২৯১	২১৮
১৩২।	শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান	পূর্ণচন্দ্র শর্মা	১২৭৩	৬৮
১৩৩।	শ্রীবৎস চিন্তা	জীবনকৃষ্ণ সেন	১২৯১	৯৪
১৩৪।	শ্রীবৎস চরিত	রামজয় প্রামাণিক	১২৯৩	১৩৮
১৩৫।	সন্ধ্যাসমর বা ঘটোৎকচ বধ	গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৯২৬	—
১৩৬।	সপ্তরথী নাটক	অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	১৯২৬	—
১৩৭।	সপ্তরথী নাটক	—	১৮৭৬	৮৮
১৩৮।	সাবিত্রী চরিত কাব্য	ভোলানাথ চক্রবর্তী	১৮৬৮	১৮০
১৩৯।	সাবিত্রী	সত্যচরণ সেনগুপ্ত	১৩০৪	৯৪
১৪০।	সাবিত্রী সত্যবান নাটক	কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৮০	৬৬
১৪১।	সাবিত্রী সত্যবান যাত্রা	তিনকড়ি বিশ্বাস	১৮৮০	৫৬
১৪২।	সত্যভামার ব্রত	গোপালচন্দ্র দে	১৯২৩	—
১৪৩।	সুভদ্রা	বিধুভূষণ বসু	১৩১৯	১০৬
১৪৪।	সুভদ্রা হরণ	যদুগোপাল বসু	১২৮৩	২০
১৪৫।	সুভদ্রা	বগলামোহন দাশগুপ্ত	১৯২৬	৬১
১৪৬।	হরিশ্চন্দ্র	অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	—	—
১৪৭।	হরিশ্চন্দ্র চরিত	জগন্মোহন তর্কালংকার	১৮৬৮	৮৮
১৪৮।	হরিশ্চন্দ্র নাটক	মনোমোহন বসু	১৮৮৫ (৪র্থ মুদ্রণ)	১২৭
১৪৯।	রাজা হরিশ্চন্দ্র	গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৯২৬	—
১৫০।	রাজা হরিশ্চন্দ্র	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯৮ (শক)	১০০

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রকাশের তারিখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১৫১।	হরিশ্চন্দ্র চরিত নাটক	পার্বতীচরণ তর্করত্ন	১৮৭৩	৭৯
১৫২।	রাজা হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান	দ্বারিকানাথ চন্দ্র	১৮৫০	—
১৫৩।	রাজা হরিশ্চন্দ্র	হরচন্দ্র দেবনাথ	১৯২৩	—
১৫৪।	হিড়িম্বা বধ	শশিভূষণ লাহা	১৮৭৮	৩৯
১৫৫।	হিড়িম্বা বধ	প্রাণচন্দ্র দাস	১৮৭৮	৮০

পরিশিষ্ট-'ঙ'

কাশীদাসী মুদ্রিত সংস্করণের সহিত বিভিন্ন পুঁথির পাঠের তুলনা

মুদ্রিত গ্রন্থ *[১]

ব্রহ্মারে কহিল পূর্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ লৈয়া মন্থহ সাগার॥
অমৃত উৎপত্তি হবে সমুদ্র মন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধা পানে॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দর লৈয়া মথ ফেলিয়া সাগরে॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্বত যথা করিল গমন॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগণ।
উর্দ্ধে উচ্চে ত্রয়োদশ সহস্র যোজন॥
উপাড়িতে বহু শ্রমকৈলা দেবগণে।
না পরিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে॥

পৃঃ ১২

৯৮৫ বঙ্গাব্দের পুঁথি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থ। *[২]

ব্রহ্মারে কহিল পূর্বে দেব বিশ্বেশ্বর।
দেবাসুরগণ লঞা মথহ সাগর॥
অমৃত উৎপতি হব সমুদ্র মথনে।
দেবগণ অমর হইব সুধা পানে॥
জতেক মৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দার লইয়া ফেলিয়া সাগরে॥
বিষ্ণুর পাইআ আজ্ঞা জত দেবগণ।
মন্দার পর্বত যথা, করিল গমন॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
উভে উশ্চ একাদশ সহস্র যোজন॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে।
না পারিআ নিবেদিল বিষ্ণুর চরণে॥

পৃঃ ৮

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ ২৩০০ *[৩]

ব্রহ্মাকে কহিল পূর্ব্বে দেব বিশ্বেশ্বর।
দেবা সুরগণ লঞা মথহ সাগর॥
অমৃত উৎপত হব সমুদ্র মন্থনে।
দেবগণ অমর হইব সুধাপানে॥

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ ১০৭৩ *[৪]

ব্রহ্মাকে কহিল পূর্বে দেব বিশ্বেশ্বর।
দেবাসুরগণ লঞা মথহ সাগর॥
অমৃত উতপতি হব সমুদ্র মন্থনে।
দেবগণ অমর হইব সুধা পানে॥

---

*১ মুদ্রিত গ্রন্থ বলিতে আমাদের আশ্রয় গ্রন্থ, পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগরমহাশয় সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারতকেই বুঝান হইয়াছে।

*২ কাশীদাসী মহাভারতের প্রাচীনতম পুঁথিরূপে ৯৮৫ বঙ্গাব্দের পুঁথিটিকে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য ইহার প্রাচীনত্ব লইয়া মতভেদ আছে। ইহা সম্পাদনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, তাই প্রাচীনতম পুঁথির পাঠরূপে, শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ উদ্ধৃত হইল।

*৩ কঃ বিঃ ২৩০০—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংখ্যা ২৩০০ এইরূপ বুঝিতে হইবে।

*৪ সা ১০৭৩—সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ১০৭৩ এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জতেক মৌসধি আছে প্রিথিবি ভিতরে।
মন্দার লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে ॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা জত দেবগণ।
মন্দার পার্বিত জথা করিল গমন ॥
অতিসয় গিরিবর পরসে গগণ।
উভ উচ্চ একাদস সতেক জোজন ॥
উপাড়িতে বহু সক্তি কৈল দেবগণ।
না পারিয়া নির্বেদিল বিষ্ণুর সদন ॥

পৃঃ ১০ ক

জতেক মৌসধি আছে প্রিথীর ভিতরে।
মন্দার পর্ব্বত পোজ (?) মথহ সাগরে ॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা জত দেবগণ।
পর্বত জোথা করেন গমণ ॥
অতিসয় গিরিবর পরসে গগনে।
উভে উশ্চ একাদস সহস্র জোজন ॥
উপাড়িতে বহু সক্তি কৈল দেবগণ।
না পাইয়া নির্বেদিল বিষ্ণুর চরণ ॥

পৃঃ ৭

মুদ্রিত গ্রন্থ

তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল. তুমি সর্ব্বব্যাপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগদ্ব্যাপী ॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর ॥
তোমার বিশাল সৃষ্টি এই ত্রিভুবন।
স্থানে স্থানে সকলে তোমার নিয়োজন ॥
ইন্দ্রে স্বর্গ দিলা যমে সংযমনী পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর ॥
জল মধ্যে আমারে করিয়া দিলা স্থিতি।
তোমার আজ্ঞায় চির করি যে বসতি ॥

পৃঃ ১৪

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

তুমি শূণ্য তুমি স্থূল তুমি সর্ব্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগদ্ব্যাপী ॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর ॥
তোমার সৃজন দেব ই তিন ভুবন।
স্থানে স্থানে সকল তোমার নিয়োজন ॥
ইন্দ্র স্বর্গ যমে দিলে সঞ্জীবনী পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর ॥
জলমধ্যে আমারে রহিতে দিলে স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করিএ বসতি ॥

পৃঃ ১০

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

তুমি সনী (?) তুমি স্থূল তুমি সগ্ররূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমী জগতব্যাপী ॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাস পাতাল তুমী দেব নাগ নর ॥
তোমার সৃষান দেব এ তিন ভুবন।
স্থানে স্থানে তোমার সকল নিজজন ॥
ইন্দ্রে সর্গ জমে দিলে সঞ্জমুনি পুর।
কুবেরে কৈলাস দিল ধনের ঠাকুর ॥
জল মধ্যে আমারে রহিতে দিলে স্থিতি।
তব আঙ্গায় চিরকাল করিএ বসতি ॥

পৃঃ ১২ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

তুমি শূন্য তুমি স্থূল তুমি সর্ব্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর তুমি সর্ব্বব্যাপী ॥
স্থাবব জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধারাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর ॥
তোমার সৃজন দেব ই তিন ভবন।
স্থানে স্থানে তোমার সরূপ নিজোজন ॥
ইন্দ্রে স্বর্গ দিলে জমে সঞ্জীবনী পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর ॥
জলমধ্যে আমারে করিতে দিলে স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চির করি এ বসতি ॥

পৃঃ ৮ ও ৯ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলা যথা না দেয় উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভাদি মণিরত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি ॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন।
পারিজাতে কিবা কাজ ধুতুরা ভূষণ ॥
এ সকল চিন্তি মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিয়া উহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল ॥

পৃঃ ১৬

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

কাহারে এতেক বাক্য বৈলে মুনিবর।
বৃক্ষেরে কহিলে জেন না দেই উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা ভূষণ জাহার।
কৌস্তুভ আদি মণিরত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দনে জার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ তার ভক্ষ্য সিদ্ধিমূলি ॥
মাতঙ্গে কি কাজ জার বলদ বাহন।
পারিজাতে কি কাজ ধুতুরা ভূষণ ॥
এ সব চিন্তিআ মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
ভবানী বলেন মুনি কি কহিব আর।
অবিরত ভূতপ্রেত সঙ্গে চলে জার ॥
জানিঞা এহাঁরে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে আমি শরীর তেজিল ॥

পৃঃ ১১

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

কাহারে এতেক বাক্য বৈলে মুনিবর।
বৃক্ষেরে কহিলে জেন না পাই উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূসণ জার।
কৌস্তুবাদি মণি রত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দন জার বিভূসণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ জার ভক্ষ সৃধি গুলি ॥
মাতঙ্গে কি কাজ জার বলদ বাহন।
পরিজাত কিবা জার ধুতুরা ভূসন ॥
এসকল চিন্তি মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্বের বিতান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিঞা ইহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে আমী স্বরির তেজিল ॥

পৃঃ ১৩ ও ১৩ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

কারে তুমি এত কথা বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে কহিলে জেন না পাই উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূসন জার।
কস্তুভাদি মণিরত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দন জার ভূসন জে ধূলি।
অমৃতে কি কাজ তার ভক্ষ সিদ্ধি গুলি ॥
মাতঙ্গে কি কাজ জার বলদ বাহন।
পারিজাতে কি কাজ তার ধুতুরা বিভূসন ॥
এইসব চিন্তি মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বির্ত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
এ সব জানিঞা দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে আমি সরির তেজিল ॥

পৃঃ ১০

মুদ্রিত গ্রন্থ	হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ
দেবী বলে ভার্য্য পুত্রে গৃহী যেইজন ।	দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেই জন ।
তাহারে না হয় যোগ্য এ সব বচন ॥	তাহারে না হয় যুক্ত এ সব কারণ ॥
বিভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে ।	বিভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয় যতনে ।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন জনে ॥	সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন জনে ॥
সংসারেতে যেজন বিমুখ এ সকলে ।	সংসারেতে যে জন বিমুখ এ সকলে ।
তাহারেই কাপুরুষ সর্ব্বলোকে বলে ॥	কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে ॥
পৃঃ ১৭	পৃঃ ১১

*　　*　　*　　*　　*　　*

পার্ব্বতীর হেন বাক্য শুনিয়া শংকর ।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর ॥
পৃঃ ১৭

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি । কঃ বিঃ ২৩০০	১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি । সাঃ ১০৭৩
দেবি বলে দেবপুত্র হয় জেইজন ।	দেবী বলে দারা পুত্র গৃহেতে জে জন ।
তাহারে না যুক্ত হয় এসব বচন ॥	তাহারে না হয় যুক্ত এসব বচন ॥
বিভাগ (?) বিভূতি আদি সঞ্চএজতনে ।	বৈভব বিশেস বিদ্যা সঞ্চার জতনে ।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোনজনে ॥	সংসারে বিমুখ জগতে আছে কোনজনে ॥
পৃঃ ১৪ক	কাপুরুষ বলি তারে সর্ব্ব লোক বলে ।
	ধন হিন জন জিএ বৃথা ভবমণ্ডলে ॥
	পৃঃ ১০

*　　*　　*　　*　　*

পার্ব্বতির বাক্য তবে সুনিএা সংকব ।
ক্রোধেতে অবস অঙ্গ কাপে থরথর ॥
পৃঃ ১৪ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

পার্ব্বতীর কটুভাষ　　শুনি রোষে দিগ্‌বাস
টানিয়া বান্ধিল ব্যাঘ্রবাস ।
বাসুকি নাগের দড়ি　　কাঁকালে বাঁধিল বেড়ি
করে তুলি নিল মৃগবাস ॥
কপালে কলংকি কলা　　গলে দোলে হাড় মালা
করযুগে কণ্ডুক কংকণ ।
ভালে বৃহদ্ভানু শশী　　বিবিধ প্রকারে ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ ॥

যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
ভ্রমে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
রজত গিরির আভা কোটি চন্দ্র মুখ শোভা
ফণি মণি বিরাজে মুকুটে॥
পৃঃ ১৭

হ ঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

পার্ব্বতীর কটুভাষ সুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস
টানিএগ পরিল ব্যাঘ্রবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালে বান্ধিল বেঁড়ি
করে তুলি নিল মৃগা বাস॥
কপালে কলঙ্ককলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কুমকুম কঙ্কণ।
ভালে বৃহদ্ভানু শশী বিবিধ প্রকারে ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয়'কিরণ॥
জেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
ক্রীড়ে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
রতন বরণ আভা কোটি চন্দ্র মুখ শোভা
ফণিমণি বিরাজে মুকুটে॥
পৃঃ ১২

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ ২৩০০

পার্ব্বতীর কটুভাস সুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস
রক্তবর্ণ তিত্রিয় লোচন।
কপালে কঙ্কন কলা কণ্ঠে সোভে হাড় মালা
করযুগে কনক কংকন॥
ভানু বৃহদ্ভানু সসী তিমির প্রকাসে ভুসী
ক্রোধে জেন প্রলয় কারণ।
তিলেক না করে ব্যাজ নিজ গাত্রবর্ণে সাজ
পঞ্চ মুখে ডাকে পঞ্চানন॥
জেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরি উঠে
সিরে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
রজত-আভা কোটী চন্দ্র মুখ সোভা
ফণিমণি বিরাজে মুকুটে॥
পৃঃ ১৪ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি—সা ১০৭০

পার্ব্বতির ক্রোধে ভাশ সুনী ক্রোধে দিকবাশ
টানিঞা পরিল বাঘবাস।
বাশুকি নাগের দড়ি কাঁকালে বেড়িয়া ভেড়ি
করে তুলি নিল মৃগবাস॥
কপালে কলাঙ্ক কলা গলা এ হাড়ের মালা
করজুগে কণ্ডুক কঙ্কণ।
ভানু বৃহস্তানু সসি বিবিধ আকারে ভূসি
ক্রোধে জেন প্রলয় কিরণ॥
জেন গিরি হেমঘটে আকাশে লহরি উঠে
সিরে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
রজত মন্দার আভা কোটি চন্দ্র মুখ সোভা
ফণিমণি বিরাজে মকুটে॥

পৃঃ ১০।১১ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু ধনের ঈশ্বর।
তুমি সূর্য্য বায়ু সোম তুমি বৈশ্বানর॥
[illegible]
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্বত সমুদ্র॥
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমিই ধারণা ধ্যান তুমি উগ্রতপ॥

পৃঃ ১০

হ ঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ধনেশ্বর।
ব্যোম সোম বাউ তুমি সূর্য্য বৈশ্বানর॥
[illegible]
মন্দর লইতে সভে করিল যতন॥

পৃঃ ১৪

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ ২৩০০

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু সিব মহেশ্বর।
……বাউ সম তুমি বৈসানর॥
তুমি সেস বরুণ নক্ষত্র বসুরুদ্র।
তুমি সর্গ তুমি খেতি ধরা পর্ব্বত সমুদ্র॥
জোগজ্ঞান বেদ সাস্ত্র তুমি-তপ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তিনরূপ॥

পৃঃ ১৬

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সা ১০৭৩

তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব ধনের ঈশ্বর।
জম সম বাউ শূর্জ তুমী বৈস্যানর॥
বরুণ অরুণ তুমি অষ্ট বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধ এ সপ্ত সমুদ্র॥
জোগি জোগ্য বেদ সাস্ত্র তুমি—জুগ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিল তিন রূপ॥

পৃঃ ১১

মুদ্রিত গ্রন্থ

চৈতন্য পাইয়া হর একদৃষ্টে চান।
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান ॥
কন্যা বলে, যোগী! তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাইয়া কাছে এস বুড়া ছন্নমতি ॥

পৃঃ ২১

হ ঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

চেতন পাইআ হর একদৃষ্টে চায়।
দুই ভুজ প্রসারিআ ধরিবারে জায় ॥
কন্যা বলে যোগি তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাঞিঞা আসহ তোর না বুঝি চরিতি ॥

পৃঃ ১৫

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ ২৩০০

চেতন পাইআ হর এক দিষ্টে চাঅ।
দুই ভুজ পসারিআ ধরিবারে জাঅ ॥
কন্যা বলে জোগি তোর কেমন চরিত।
ঘনইআ আইলে বড় না বুঝি প্রকৃত ॥

পৃঃ ১৭

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সা ১০৭৩

চেতন পাইয়া হর চারিদিকে চায়।
দুই হস্ত প্রসারিয়া ধরিবারে জায় ॥
কন্যা বলে জোগি তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাঞা আসহ বড় না বুঝি চরিত ॥

পৃঃ ১৩

মুদ্রিত গ্রন্থ

কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
মোর পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ ॥
তৈল নাই অঙ্গে ছাই শিরে জটা ভার।
তাম্বুল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার ॥
কাঁকালে বসন নাই বেড়া বাঘছাড়।
দীঘল বাঘের নখ পাকা গোঁফ দাড়ি ॥
অঙ্গের দুর্গন্ধে ওঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছয়ে কি না বদনে দশন ॥
মোর গাত্র গন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পুরিত।
অঙ্গের ছটায় দেখ ত্রৈলোক্য মোহিত ॥
কোন লাজে চাহ মোরে করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুই আইলি মোর পাশ ॥

পৃঃ ২২

হ ঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাঞি লাজ।
মোর পরিচয়েতে তোমার কোন কাজ ॥
তৈল বিনু তোমার মাথায় জটাভার।
তাম্বুল বিহনে দন্ত ফটিক আকার ॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্র ছড়ি।
দীঘল করের নখ পাকা গোঁফ দাড়ি ॥
অঙ্গের দুর্গন্ধিতে মুখেতে উঠে অন্ত।
নাঞি জানি মুখ মধ্যে নাঞি পারা দন্ত ॥
মোর অঙ্গ গন্ধ দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূজিত।
অঙ্গের ছটায় দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত ॥
কোন লাজে চাহ আরে করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুমি আস্য মোর পাশ ॥

পৃঃ ১৫

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ ২৩০০

কর্না বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
মোর পরিচএতে তোমার কিবা কাজ॥
তৈল বিনে বিভূতি মাথাঅ জটাভার।
তাম্বুল বিহনে দন্ত ফটিক আকার॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্র ছড়ি।
দিঘল করের নখ পাকা গোঁফ দাড়ি॥
অঙ্গের দুর্গন্ধেতে মুখে উঠে অন্ন।
না জানি—কি বা আছে দন্ত॥
মোর অঙ্গ গন্ধ দোখ তৈলক পূরিত।
অঙ্গের জটার দেখ তিলক মোহিত॥
কোন কাজে চাহ মোর করিতে সম্ভাস।
কেমন সাহসে তুমি আইস মোর পাস॥

পৃঃ ১৮ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সা ১০৭৩

কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
মোর পরিচএতে তোমার কোন কাজ॥
তৈল বিনে বিভূতি মাথায় জটাভার।
তাম্বুল বিহনে দন্ত ফটীক আকার॥
বশন না মিলে তেঞীপর বাঘছড়ি।
দিঘল করের নখ পাকা গোঁফ দাঁড়ি।
অঙ্গের দুর্গন্ধে দেখ বাহিরায় আঁত।
না জানি মুখেতে কেবা আছে নাহি দাঁত॥
মোর অঙ্গ গন্ধ দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাক কত কন্দর্প মোহিত॥
কোন লাজে চাহ মোরে করিতে সম্ভাশ।
কেমন সাহসে তুমি আশ্য মোর পাস॥

পৃঃ ১৩।১৪ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

শিব বলে কন্যা এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা নাহি জানি আর॥
ত্যজিলাম সর্ব্বকর্ম্ম ভার্য্যা পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন॥

পৃঃ ২৩

হ ঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

শিব বলেন কন্যা মোর সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনে না ভজিব আর॥
তেজিলাঙ সব কাম নারী পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পায় দেহ আলিঙ্গন॥

পৃঃ ১৫

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ ২৩০০

সিব বলে কর্না আমার সত্য অঙ্গীকার।
আজ হৈতে তোমা বই না ভজিব আর॥
তেজিলাম সব কর্ম নারি পুত্রগণ।
সেবিল তোমার পাএ দেহ আলিঙ্গন॥

পৃঃ ১৯ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সা ১০৭৩

সিব বলে কন্যা মোর দড় অঙ্গিকার।
আজি হৈতে তোমা বিনে না ভজিব আর॥
তেজিলাঙ সর্ব্ব কর্ম্ম নারি পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন॥

পৃঃ ১৪

মুদ্রিত গ্রন্থ	হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ
পত্নীরূপে মেনকায় নিল নিজ ঘরে।	মেনকা সহিত সম্ভোগিল মহামুনি।
তপজপ ত্যজি তথা দোঁহে বাস করে॥	কামে হত হয়্যা মুনি পিছে নাঞি গুনি॥
হেন মতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।	একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা বা বন্দনা পূজা নাহি মনে পশে॥	সন্ধ্যা হেতু বৈল তারে জল দেহ আনি॥
একদিন দিনগতে বিশ্বামিত্র মুনি।	সুনিঞা মেনকা হাসি বলিল বচনে।
সন্ধ্যা হেতু বলে, শীঘ্র জল দেহ আনি॥	ভাল সন্ধ্যা স্মরণ হৈল এতদিনে॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।	এত সুনি কোপিত হইলা মুনিবর।
এতদিনে সন্ধ্যা তব হইল স্মরণ॥	দেখিআ মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥
এতশুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।	পৃঃ ৫২
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥	
পৃঃ ৭০	

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ ২৩০০	১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ ১০৭৩
মেনকা ধরিআ মুনি নিল নিজ দেশে।	মেনকা ধরিয়া মুনি নিল নিজ দেশ।
কেন তেন (?) হিত হআ সিঙ্গার বিসেসে॥	কামেতে মোহিত হইলা শৃঙ্গারের বেশ॥
হেন মতে কথক দিন গেল ক্রীড়া রসে।	হেন মতে বহুদিন বহে ক্রীড়া রসে।
জপতপ সকল—কাম রসে॥	তপজপ সকল তেজিল কামরসে॥
একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।	একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বৈল তারে জল দেহ আনি॥	সন্ধ্যা হেতু বৈল তারে জল দেহ আনি॥
ষুনিআ মেনকা আসি বলল বচনে।	সুনিঞা মেনকা হাসি বললা বচনে।
ভাল সন্ধ্যা মুনিবর হৈল এতদিনে॥	ভাল সন্ধ্যা স্মরণ হইল এতদিনে॥
এত ষুনি মুনিবর কুপিত অন্তর।	এত সুনি হৈল মুনি কোপিত অন্তর।
দেখিআ মুনির ক্রোধ পালাএ সর্ত্তর॥	দেখিয়া মেনকা ভয়ে হইল সর্ত্তর॥
পৃঃ ৬২ক	পৃঃ ৪৩

মুদ্রিত গ্রন্থ	হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ
এতশুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত।	এতসুনি শকুন্তলা হইলা লজ্জিত।
ক্রোধেতে ওষ্ঠাধর হইল সঘনে কম্পিত॥	মহাক্রোধে অধরোষ্ঠ সঘনে কম্পিত॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা।	কি বোল বলিলে রাজা নাঞি ধর্ম্মভয়।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলে রাজভোগে ভোলা॥	তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয়॥
কি বাক্য বলিলা রাজা নাহি ধর্ম্মভয়।	জানিঞা সুনিঞা মিথ্যা কহে জেই জন।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয়॥	সহস্র বৎসর তার নরক ভোজন॥
দৈবে সেই সব কথা কেহ নাহি জানে।	মিথ্যা হেন বাক্য রাজা কভু ভাল নহে।
আপনি ভাবিয়া রাজা দেখ মনে মনে॥	মিথ্যা হেন পাপ নাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন।	পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
সহস্র বৎসর তার নরকে গমন॥	নীচ জন হেন মোরে না চাহ রাজন॥
	পৃঃ ৫৪

লুকাইয়া যেইজন করে পাপ কর্ম্ম।
লোকে তা না জানিলেও জানেন তা ধর্ম্ম ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল ॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ নরবৃত্তি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম ফল তার দেয় ত' শমনে ॥
মিথ্যা কথা বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
পতিব্রত নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন ॥

পৃঃ ৭২

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

এতবুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত।
করেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত ॥
পুন কোপ সম্বরিআ বলে সকুন্তলা।
পূরব সত্য পাসরিলে রাজ ভোগে ভোলা ॥
কি বল বলিল রাজা নাহি ধর্ম্মভয়।
তুমি হেন কথা বল উচিত না হঅ ॥
দৈবে সে সকল কেহ নাহি জানে।
আপন আস্বঅ (?) রাজা ভাবে মনে মনে ॥
জানিএগ বুনিএগ মির্থা বলে জেই জন।
সহস্র বৎসর তার নবকে ভোজন ॥
লুকাইয়া পাপ কর্ম্ম করে জেই জনে।
লোকে না জানিল তাহা জানহ আপনে ॥
চন্দ্র যুর্জ বাউ অগ্নি পৃথিবি আর জন।
আকাস সমান ধর্ম্ম জানহ সকল ॥
রাত্রি দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃ নরবৃত্তি জানে।
ফলাফল ধর্ম্মাধর্ম্ম — (??) সমান ॥
মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সাস্ত্রে হেন কহে ॥
পতিব্রতা ন্যার আমি না কর হেলন।
নিচ জন হেন মোরে না ভাব রাজন ॥

পৃঃ ৬৪।৬৪ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

এত শুনি শকুন্তলা হইলা লজ্জিত।
মহাকোপে অধরোষ্ঠ সঘনে কম্পিত ॥
কি বোল বলিলে রাজা নাহি ধর্ম্মভয়।
তুমি হেন মিথ্যা কহ উচিত না হয় ॥
জানিএগ শুনিএগ মিথ্যা কহে জেইজন।
সহস্র বৎসর তার নরক ভোজন ॥
মিথ্যা হেন বৈলে রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাএি সর্ব্ব সাস্ত্রে কহে ॥
পতিব্রতা নারি আমি না কর হেলন।
নিচজন হেন মোরে না চাহ রাজন ॥

পৃঃ ৪৪।৪৫ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

পুত্ররূপে জন্মে পিতা ভার্য্যার উদরে।
শাস্ত্রের প্রমাণ আছে জানে চরাচরে ॥
সে কারণে ভার্য্যারে জননীসমা দেখি।
করিলা অনেক দোষ আমারে উপেক্ষি ॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি মর্ত্ত লোকে ॥
পরম সহায় হয় পতিব্রতা নারী।
যাহার সাহায্যে রাজা সর্ব্বকর্ম্ম করি ॥
ভার্য্যা বিনা গৃহশূণ্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে যদি গৃহস্থ বলায় ॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস ॥
ভার্য্যাবান লোক ইহলোকে বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তারে পরলোকে ॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি অপেক্ষায় রহে স্বামী তরে ॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতি শাস্ত্রে রাজা কহে সুরবর্গে ॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহা হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ ॥

পৃঃ ৭৩

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
জাহার সহায় রাজা সর্ব্ব ধর্ম্মে তরি ॥
ভার্য্যা বিনে গৃহ শূন্য ঘর বন প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বোলায় ॥
স্বামীর জিয়ন্তে ভার্য্যা আগে জদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে ॥
ভার্য্যা হইতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
জেই পুত্র হৈতে লোক ভুঞ্জেঞ্জ স্বর্গসুখ ॥

পৃঃ ৫৪

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

পূর্ব্বে মুনিগণ উক্তি সুন নৃপবরে।
পতি ভার্জা পুত্র হআ জন্মাএ উদরে ॥
তে কারণে ভর্জারে—সম দেখি।
বহু দোসে ভার্জারে—নাহি দেখি ॥
অর্দ্ধেক স্বরির ভার্জা সব্ব সাস্তে লেখে।
ভাজার সমান বন্ধু নাহি মর্ত্তলোকে ॥
পরম স্বহায় হঅ পতিব্রতা নারি।
জাহার স্বহাঅ রাজা সব্ব ধম্ম করি ॥
ভাজা বিনে গৃহ সন্য কাননের প্রাঅ।
বনে ভাজা সঙ্গে থাকে গ্রহস্ত বলাঅ ॥

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি

সাঃ ১০৭৩

পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারি।
জাহার সহায় রাজা সর্ব্বধর্ম্মে তরি ॥
ভার্য্যা বিনে গৃহশূন্য ঘর বনপ্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গ্রহস্থ বোলায় ॥
স্বামির জিয়ন্তে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথে চায়্যা থাকে ভার্য্যা স্বামি অনুসারে ॥
ভার্জ্যা হইতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
জেই পুত্র হৈতে লোক ভুঞ্জ স্বর্গসুখ ॥

পৃঃ ৪৪।৪৫ক

ভাজা বিন লোক কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুখিত সেই সদাই উদাস ॥
ভাজাবন্ত লোক হলে লোকে বক্ষে ঝুখে।
মরেণে সঙ্গীত ইহা তারে পরলোকে ॥
স্বামীর জিঅন্তে ভাজা আগে জদি মরে।
পথ নিরখিআ থাকে স্বামি অনুসারে ॥
মরিলে স্বামিরে উদ্ধারিআ লঅ সর্গে।
হেন নিত সাস্ত্রে আছে কহে ষুরবর্গ ॥
ভাজা হৈতে নরপতি দেখে পুত্র— ।
সেই পুত্র হইতে লোক ভুঞ্জে সর্গসুখ ॥

পৃঃ ৬৪

মুদ্রিত গ্রন্থ

পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্ম মাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে ॥
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি শুনি রাজা বেদেতে ব্রহ্মার ॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণে।
অধ্যায়নে গুরুশ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গনে ॥
ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ের সর্ব্ব দুঃখ হয় নিবারণ ॥

পৃঃ ৭৩

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্ম মাত্র মুখ দেখি মাতা পিতা তরে ॥
পিণ্ডদানে মাতা পিতার করএ উদ্ধার।
হেন নীত কহে রাজা বেদেতে ব্রহ্মার ॥
ধূলায় ধূসর পুত্র কর আলিঙ্গন।
হৃদয়ের জত দুখ্খ হইবে খণ্ডন ॥

পৃঃ ৫৪

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্ম মাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে ॥
পিণ্ড দানে--গণে করএ উদ্ধার।
হেন নিত কহে রাজা বেদের বিচার ॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রহ্মাণে।
অধাঅন গুরুশ্রেষ্ট পুত্র আলিঙ্গনে ॥
ধূলায় ধূসর পুত্র করি আলিঙ্গন।
হ্রিদএর সর্ব্বদুখ করহ খণ্ডন ॥

পৃঃ ৬৪।৬৫ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্ম মাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে ॥
পিণ্ডদান দিআ পিতা করএ উদ্ধার।
হেন নিত কহে রাজা বেদেতে ব্রহ্মার ॥
ধূলাএ ধূসর পুত্র কয় আলিঙ্গন।
হৃদএর সব দুখ হইবে খণ্ডন ॥

পৃঃ ৪৪।৪৫ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

শতেক বৎসর তপ করে যেইজন।
অক্রোধের সমান তাহা নহে কদাচন॥
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপমান কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্পের দংশনে যথা বিষে অঙ্গদয়।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যথা অগ্নি হয়॥
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
বলে আর চক্ষে ধারা বহে দরদর॥

পৃঃ ৮৩

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ববিজ্ঞ ধর্ম্ম জান্য জে ক্রোধ সম্বরে॥
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপ্রমিত কৈল্য মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্পের দংশনে জেন সর্ব্ব অঙ্গদয়ে।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘরিষণে যেন অগ্নি হএ॥
ততোধিক পিতা মোর দহে কলেবর।
না হয় নিবর্ত্ত মোর সুনহ উত্তর॥

পৃঃ ৬০

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

সতেক বৎসর তপ করে জেইজন।
অক্রোধ সহিত সম নহে সেইজন॥
দেবযানি বলে বাপা আমি সব জানি।
অপ্রমিত বৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনি॥
সর্পের কামড়ে জেন সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
কাষ্টে কাষ্টে ঘরিসনে জেন অগ্নী দহে॥
ততোধিক তাপ মোর দহে কলেবর।
না হয় নিবত্ত মোর জলিছে অন্তর॥

পৃঃ ৭২

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক জেই সে ক্রোধ সম্বরে॥
দেবজানী বলে পিতা শব আমি জানি।
অশ্রমিত কৈল্য মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্পের দংসনে জেন বিসে অঙ্গ দহে।
কাঠে কাঠে ঘরিসনে জেন অগ্নি হএ॥
ততোধিক পিতা মোর দহে কলেবর।
না হয় নিবর্ত্ত মোর জোলিছে অন্তর॥

পৃঃ ৪৯

মুদ্রিত গ্রন্থ

আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর॥
ধন রত্ন লহ তুমি যাহা ইচ্ছা মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগ গণে॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া তুষ্টি জন্মাও ইহার॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভোজন॥

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

আমার নাতির নাতি হয় বৃকোদর।
কি করিব প্রীত তব কহত উত্তর॥
ধন রত্ন লহ তুমি জেই তব মনে।
এত সুনি বলিল জতেক নাগগণে॥
তোমার এ বন্ধু জদি পবন কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া তোষ করহ এহার॥
ধন রত্নে এহার নাহিক প্রয়োজন।
এহার পরম প্রীত পাইলে ভক্ষণ॥

ইহারে লইয়া গৃহে করহ গমন।
যাহারে এ তৃপ্ত হয় করহ রাজন ॥
এতশুনি ফণিরাজ লৈয়া বৃকোদরে।
গৃহে আনি বসাইল পালংক উপরে ॥
নাগের আলয়ে আছে সুধা কুণ্ডচয়।
ভীমে বলে কর পান মন যত লয় ॥
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান কবহ এক্ষণে ॥
পৃঃ ১৪১

এত সুনি ফণিরাজ লয়্যা বৃকোদরে।
গৃহে আনি বসাইলা পালঙ্গ উপরে ॥
নাগের আলয়ে আছে সুধা কুণ্ডগণ।
ভীমে বৈল কর পান জত লয় মন ॥
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ডপানে।
জত ইৎসা তত পিয় নাহি নিবারণে ॥
একে বৃকোদর তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহাতে অপূর্ব্ব লোকে পাইলেক সুধা ॥
একে একে অষ্ট কুণ্ড সুধা পান কৈল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল ॥
পৃঃ ১০৮

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

আমার নাতির নাতি হয় বৃকোদর।
গ্রীহে লঞা বসাইল পালংক উপর ॥
নাগের আলএ আছে সুধা কুণ্ডগণ।
ভীমে বৈল কর পান জত লয় মন ॥
সহস্র হস্তির বল এক কুণ্ডপানে।
জত ইচ্ছা তত খাও আপনার মনে ॥
একে ভীম বিয় আরো পরিশ্রম খুধা।
তাহে বিব পাইল অপূর্ব্ব কুণ্ড সুধা ॥
একে একে অষ্ট গোটা কুণ্ড পান কৈল।
চলিতে নারিল সক্তি উদর পূরিল ॥
পৃঃ ১২৮।১২৯ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি কি প্রীত তব কহনা সর্ত্তর ॥
ধন রত্ন লহ তুমি জাহা ইর্চ্ছা মনে।
এত সুনি বলিল জতেক নাগগণে ॥
তোমার এ বন্ধু জদি পবন কুমার।
ভোক্ষ্য ভোজ্য দিআ তুষ্ট করহ ইহার ॥
এত শুনি ফণিরাজ লয়্যা বৃকোদর।
গৃহে লইয়া বসাইল পালংক উপর ॥
নাগের আলয়ে আছে সুধা কুণ্ডগণ।
ভীমে বৈল কর পান জত লয় মন ॥
সহস্র হস্তীর তেজ এক কুণ্ড পানে।
জত ইৎসা তত খায় নাহিক বারণে ॥
একে পরিশ্রম আর পরিশ্রম খুধা।
তাহে ভীম পাইল অপূর্ব্ব কুণ্ড সুধা ॥
একে একে অষ্ট গোটা কুণ্ড পান কৈল।
চলিতে নাহিক সক্তি উদর পূরিল ॥
পৃঃ ৮৬

মুদ্রিত গ্রন্থ

নিশাচরী দূরে থাকি বীর বৃকোদরে দেখি
শরীর নেহালে ঘনঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া যেন শালদ্রুম কোঁড়া
শশি মুখ পংকজ নয়ন ॥
সিংহের বিক্রমধর ভুজযুগ করি কর
কম্বুকণ্ঠ খগবর নাসা।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষণে প্রীতি বড় পায় মনে
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা ॥
পৃঃ ১৭৬

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

নিশাচরী দূরে থাকি বৃকোদর বীরে দেখি
শরীর নেহালি ঘনে ঘনে।
কিবা সুমেরুর চূড়া জেন শালদ্রুম গোড়া
শশিমুখ পংকজ নয়ন ॥
সিংহের বিক্রমধর ভুজযুগ করি কর
কণ্ঠ কুম্ব খগবর নাসা।
অঙ্গ নিরক্ষিআ ক্ষেণে পড়িল অনঙ্গ বাণে
মনে চিন্তি হিড়িম্বার শ্বসা ॥
পৃঃ ১৩৬

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।   কঃ বিঃ ২৩০০

নিসাচরি দূরে থাকি বির ব্রকোদরে দেখি
স্বরির নিহানে ঘনেঘন।
জেন স্নুমেরুর চূড়া কিবা সালদ্রোম কুড়া
ষসিমুখ পংকজ নঅন ॥
সিংহের বিক্রমধর ভুজযুগ করি কর
কম্বুকণ্ঠ খগবর নাসা।
অঙ্গ নিরক্ষিআ ক্ষেণে পড়িল অনঙ্গ বাণে
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা ॥
পৃঃ ১৬০ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ ১০৭৩

নিশাচরি দূরে থাকি বির বৃকোদরে দেখি
সরির নেহালে ঘনেঘন।
কিবা শৃমেরু চূড়া জেন শাল দ্রুম গোড়া
সশীমুখ পংকজ নয়ন ॥
সিংহের বিক্রমধর ভুজযুগ করিবর
কম্বুকণ্ঠ খগবর নাসা।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষেণে পড়িল অনঙ্গ বাণে
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা ॥

পৃঃ ১১৩

মুদ্রিত গ্রন্থ

এতেক কামনা করি কামরূপা নিশাচরী
দিব্যরূপা হইল কামিনী।
মুখপদ্ম শরৎশশী নয়ন কুরঙ্গ দৃশী
স্তন যুগবরা নিতম্বিনী ॥
কামের কার্মুক ভুরু তিল পুষ্প নাসা চারু
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গৃধিনী।
করি কর যুগ ঊরু উলট কদলী তরু
মদমত্ত মাতঙ্গ চলনী ॥
চম্পক কুসুম আভা অঙ্গের বরণ শোভা
কটাক্ষে মোহিত মুনিমন।
আসিয়া ভীমের আশে সলজ্জ মধুর ভাষে
কহে যেন কোকিল নিস্বন ॥

পৃঃ ১২৬

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

এতেক কামনা করি কামরূপা নিশাচরী
দিব্যরূপ হইল কামিনী।
মুখপদ্ম সরশশী নয়ন কুরঙ্গ ভূষি
স্তনযুগবরা নিতম্বিনী ॥
কামের কামান ভুরু তিল পুষ্প নাসা চারু
শ্রুতিযুগ জিনিঞা গৃধিনী।
করিকর জিনি উরু জেন রাম রম্ভা তরু
মত্তবর মাতঙ্গ চলনি ॥

চম্পক কুসুম আভা   অঙ্গের বরণশোভা
কটাক্ষ মোহিনী মুনিমন।
আসিআ ভীমের পাশে   সলজ্জিত মৃদু ভাষে
কহে জেন পিকুর নিস্বন ॥
পৃঃ ১৩৬

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।   কঃ বিঃ ২৩০০

এতেক কামনা করি   কামরূপা নিসাচরি
দিব্যরূপ হইল কামিনি।
মুখপদ্ম সরৎ সসি   নঅন কুরঙ্গ দৃসি
স্তনযুগবরা নিতম্বিন ॥
তিলপুষ্প নাসা চারু   কামের কামনা ভুরু
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গোধিনি।
করবরাজ—উরু   উলট কদলী তরু
মর্ত্তবর মাতঙ্গ চলন ॥
চম্পক — —   বিমল অঙ্গের সোভা
কটাক্ষে মোহিত মুনি মন।
আসিআ ভিমের পাসে   সলজ্জিত মৃদু ভাসে
কহে যেন কোকিল নিস্বন ॥
পৃঃ ১৬০ক।১৬০

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।   সাঃ ১০৭৩

এতেক কামনা করি   কামরূপ নিশাচরি
দির্ব্বা রূপ হইল কামিনী।
মুখপদ্ম সরত সশি   নয়ন কুরঙ্গ ভূষি
স্তন যুগবর নিতম্বিনী ॥
কামের কামান ভুরু   তিল পুষ্প নাশা চারু
শ্রুতযুগ নিন্দিত গির্ধিনী।
করিকর জিনি উরু   উৎকণ্ঠ কদলিতরু
মর্ত্তগজ মাতঙ্গ চলনি ॥
চম্পক কুসুম আভা   অঙ্গের বরণশোভা
কটাক্ষে মোহিত মুনিমন।
আসিয়া ভিমের পাশে   সলজ্জিত মৃদুভাশে
শুধা নিন্দি মধুর বচন ॥
পৃঃ ১১৩

মুদ্রিত গ্রন্থ

করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
তাই সে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকারগণ সহ বাদ্য কারবারে ॥
* *
নন্দ গোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ অন্ন খাইয়া চরাত গোরুপাল ॥
* *
গোপালের চরিত্র হয় বেদ অগোচর।
কেহ না কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড ধরিল যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিল অর্দ্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার নিঃশ্বাসে প্রলয় ॥
পৃঃ ২০৭

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

করতালি দিআ হাসি বলে শিশুপাল।
সভা হৈতে শঙ্খ ভাল বাজায় গোপাল ॥
তে কারণে দ্রুপদ বরিল ইঁহাকারে।
বাদ্যকার সহ এই শঙ্খ বাজাবারে ॥
* *
নন্দ গোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ অর্ণ খাইঅ রাখিত গোরুপাল ॥
* *
গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রিলোক ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলিএ এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
অর্দ্ধকোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে দেহে।
এমন বিরাট জার নিশ্বাস প্রলএ ॥
পৃঃ ১৬৩

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

করতালি দিয়া হাসি বলে সিষুপাল।
সভা হৈতে ভাল সঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
তেকারণে দ্রোপদ বরিআছে ইহারে।
বাদ্যকারগণ সঙ্গে সঙ্খ বাজাবারে ॥
* *
নন্দ গোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপঅন্ন খাইআ রাখিত গরুপাল ॥
* *
গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্যে কি কহিতে পারে তৈলক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলিএ এক চতুর্দ্দস লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিন — কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে দেহে।
এমত বিরাট জার নিশ্বাস না সহে ॥
পৃঃ ১৯১।১৯২ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

করতাসি দিয়া হাশি বলে সীসুপাল।
সভা হৈতে ভাল সঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
তেকারণে দ্রোপদ বরিয়াছে ইহারে।
বাদ্যকারগণ সহ সঙ্খ বাজাবারে ॥
* *
নন্দ গোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ অর্ন খাইয়া রাখিল গরুপাল ॥
* *
গোপালের চরিত্র বেদে অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুশ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিন অর্দ্ধ কোটি শে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট জার নিশ্বাস প্রলএ ॥
পৃঃ ১৩২

মুদ্রিত গ্রন্থ

পূর্ণ সুধাকর জিনি মনোহর
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা তিল ফুল নাসা
দেখি মুনি মনঃ সুখ ॥
নেত্রযুগ মীন দেখিয়া হরিণ
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রূ উন্নত দেখিয়া মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন ॥
প্রবাল শ্রীধর বিরাজে অধর
পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দূর চিকুর জালে ॥
তড়িৎ মণ্ডল কর্ণতে কুণ্ডল
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
উরোজ যুগল কোরক কমল
তনুশোভা তাহে বাড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেশিল বিলে লাজে ॥
পৃঃ ২০৯

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

শরতের চন্দ্রজেন বদন কমল হেন
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা তিলফুল নাসা
দেখি মনে মনে সুখ ॥
নেত্রযুগ মীন দেখিআ হরিণ
লাজে সেহ গেল বন।
চারু ভুবুলত দেখিআ মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন ॥

জেন বিম্ববর জিনিআ অধর
পূর্ব্বেতে অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দূর চাঁচর বালে ॥
তড়িত মণ্ডল গণ্ডেতে কুন্তল
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
ক্ষীণ কুচকুম্ভ গঞ্জিআ দাড়িম্ব
হৃদএ ফুটিআ পড়ে ॥
কণ্ঠে দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেশিল বেণী লাজে ॥
পৃঃ ১৬৫

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ ২৩০০

পূর্ণ স্বরসিন্ধু হের জন বৃন্ধু (??)
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূসা তিল ফুল নাসা
দেখি মুনিমন সুখ ॥
নেত্রযুগ মিন দেখিআ হরিণ
লাজে দুহে গেলা বন।
সুচারু ভ্রূকত দেখিআ মন্মথ
নিন্দে নিজ স্বরাসন ॥
পূর্ণ্য সসোধর নিন্দিত অধর
পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনি
সিন্ধুর আছ তে ভালে ॥
তাড়িত মণ্ডল গণ্ডেতে কুণ্ডল
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচ কুম্ভ লজ্জায় দাড়িম্ব
হৃদয় ফাটীয়া পড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
সর্ত্তর অগাধ মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেসে পাতাল মাঝে ॥
পৃঃ ১৯৩

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ ১০৭৩

পুর্ন্ন সরইন্দু হেরি জেন সিন্ধু
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভুশা তিল ফুল নাশা
দেখি মুনিমুখ সুখ ॥
নেত্রযুগ মীন দেখিয়া হরিণ
লাজে দুঁহে গেল বন।
চারু সুভ্রূলত দেখিএ জেমত
নিন্দি নিজ শরাসন ॥
— — নিন্দিত অধর
পুরূবের অনুতালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দূর চাঁচর বালে ॥
তড়িত মণ্ডল গণ্ডেতে কুণ্ডল
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচ কুম্ভ লজ্জিত দাড়িম্ব
হৃদএ ফাটিয়া পড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেসিল অম্বু
অগাধ অম্বর মাঝেং।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেসিল বনমাঝে ॥
পৃঃ ১৩৩

মুদ্রিত গ্রন্থ	**হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ**
দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।	দ্রৌপদির রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সবাই উঠিল ততক্ষণ-॥	শীঘ্রগতি সভা হৈতে উঠে রাজাগণ ॥
হুড়াহুড়ি করে সবে যায় বায়ু বেগে।	হুড়াহুড়ি করি সভে ধায় বাউবেগে।
সবে বলে, রহ লক্ষ্য আমি বিঁধি আগে ॥	সভে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে সবে উপজিল দ্বন্দ্ব।	সুহৃদে সুহৃদে তথা উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া খাড়া নৃপবৃন্দ ॥	ধনুক বেড়িয়া দাণ্ডাইলা নৃপবৃন্দ ॥

* *

তবে মৎস্য অধিপতি বিরাট নৃপতি ।
ঠেলাঠেলি করি ধনু ধরে দ্রুতগতি ॥
থাকুক বেধন কার্য্য তুলিতে নারিল ।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া পাইলি কি লাজ ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিবার নাহি শক্তি বিন্ধিবারে চাও ।
এই মুখে মৎস্য দেশে রাজ ভোগ খাও ॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু ।
দেখিয়া কীচকবীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া ।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥

পৃঃ ২০৯।২১০

তবে মৎস্য অধিপতি বিরাট রাজন ।
ঠেলাঠেলি করি ধনু লৈআ প্রাণপণ ॥
আছুক তুলিবার কার্য্য নড়িতে নারিল ।
হাসিআ সুশর্ম্ম রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যারে দেখিআ বুড়া খাইলে কি লাজ ।
লক্ষ্য বিন্ধি হাসাইলে রাজার সমাজ ॥
তুলিতে নহিল শক্তি গুণ দিতে চাহ ।
এই মুখে মৎস্য রাজা রাজপণে খাহ ॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলি লৈল ধনু ।
দেখিআ কীচক বীর ক্রোধে কম্পে তনু ॥
কথো দূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিআ ।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥

পৃঃ ১৬৫

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি ।

কঃ বিঃ ২৩০০

দ্রৌপদির রূপেতে মোহিত রাজাগণ ।
সিঘ্রগতি সভাই উঠে ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সভে ধায় বাউবেগে ।
সভে বলে রহ লক্ষ আমি বিন্ধি আগে ॥
সুরিদে সুরিদে সব উপজিল দন্দ্ব ।
ধনুক বেড়িয়া দাণ্ডাইল নৃপবৃন্দ ॥

*　　　*

তবে মৎস্য নরপতি বিরাট রাজন ।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণ ॥
থাকুক তুলিতে কার্জ নাড়িতে নারিল ।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যারে দেখিয়া রাজা খাই লোক লাজ ।
লক্ষ বৃন্ধিবারে আসি হাসালে সমাঝ ॥
তুলিতে নহিল সাক্তি বৃন্ধিবারে চাহ ।
এই মুখে মৎস্য-দেস রাজা বলি কহ ॥
এতবলি সিঘ্র গতি তুলি নিল ধনু ।
দেখিয়া কিচক বির ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কথো দূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া ।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥

পৃঃ ১৯৪

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি ।

সাঃ ১০৭৩

দ্রৌপদি দেখিয়া রূপ মোহে নৃপগণ ।
সীঘ্রগতি সভাই উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সভে ধাএ বাউ বেগে ।
সভাই বলিছে লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে সব উপজিল দ্বন্দ্ব ।
ধেনুক বেড়িআ দাণ্ডাইল নৃপবৃন্দ ॥

*　　　*

তবে মৎস অধিপতি বিরাট রাজন ।
ঠেলাঠেলি করি ধনু লৈল প্রাণপণ ॥
আছুক তুলিবার কাজ নাড়িতে নারিল ।
হাসিএা সুসর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যারে দেখিয়া বুড়া খাইলে কিলাজ ।
লক্ষ্য বিন্দি আসিআছ হাসাতে সমাজ ॥
তুলিবারে নহিক সক্তি বিন্দিবারে চাহ ।
এই মুখে রাজপণে মৎসদেস খাহ ॥
এত বলি সিঘ্রগতি তুলিলেন ধনু ।
না পারে ধৈর্য্য হৈতে হীনবল তনু ॥
কথোদূরে ত্রিগর্ত্তেরে পেলিল ঠেলিআ ।
চাপড় মারিয়া ধনু লৈল কাড়িয়া ॥

পৃঃ ১৩৩।১৩৪ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

কেহ ব্যথা পায় হাত ঘাড় স্কন্ধ নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলকে॥
হাহাকার করি কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি॥

পৃঃ ২১০

*　　*

মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥

পৃঃ ২১৯

*　　*

শুনিয়া পার্থের নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল॥
কি বলিলা আচার্য্য করিলা কোন কর্ম্ম।
জ্বলিয়া নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব যে সাধু পুত্রগণে॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোক মন॥

পৃঃ ২২০

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

কাহার ভাঙ্গিল হাথ ঘাড় হল্য নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে ঝলকে॥
হাহাকার করে কেহো ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু জায় গড়াগড়ি॥

পৃঃ ১৬৫

*　　*

মহাবীর্য্য জেন সূর্য্য ঢাকিআছে মেঘে।
অগ্নি অংশু জেন পাংশু আচ্ছাদন লাগে॥

পৃঃ ১৭৩

*　　*

পার্থের সুনিঞা নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল॥
কি বলিলে আচার্য্য করিলে কোন কর্ম্ম।
জ্বালিলে নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলে মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বচ্ছর নাঞি দেখি সুনি কাণে।
আর কোথা পাব সেই সাধু পুত্রগণে॥
এত বলি কান্দে ভীষ্ম সজল নয়ন।
দ্রোণ বৈল ধৈর্য্য হয় ত্যজ শোকমন॥

পৃঃ ১৭৫

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

কাহার ভাঙ্গিল হাথ ক্ষত হইল নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে ঝলকে॥
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ জায় গড়াগড়ি॥

পৃঃ ১৯৫ক

*　　*

মহাবির্জ্জ　জেন সূর্য্য
আচ্ছাদিল নাগে।
দেখি সভে　মোহলোভে
অর্জ্জুনের আগে॥

পৃঃ ২০৪ক

*　　*

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

কাহার ভাঙ্গিল হস্ত ঘাড় হইল নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে ঝলকে॥
হাহাকার করি সভে ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু জায় গড়া গড়ি॥

পৃঃ ১৩৪ক

*　　*

মহাবির্জ্জ্য জেন শূর্জ্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নি অংসু জেন পাংসু আৎসাদন লাগে॥

পৃঃ ১৪০

*　　*

পার্থের সুনিঞা কথা ভিস্ম সোকাকুল ।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল ॥
কি বলিলে আচার্য্য করিলে কোন কর্ম্ম ।
পৃঃ ২০৫ক
জালিল নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলে মর্ম্ম ॥
দ্বাদশ বৎসর দেখি নাহি সুনি কাণে ।
আর কেথা পাব সেই সাধু পুত্রগণে ॥
এত বলি কান্দে ভিস্ম সরজ নয়ন ।
দ্রোণ বলে ধর্জ্য হয় তেজ সোক মন ॥
পৃঃ ২০৫

পার্থের শূনেঞা নাম ভিশ্ম শোকাকুল ।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল ॥
কি বলিলে আচার্য্য করিলে কোন কর্ম্ম ।
জালিলে নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলে মর্ম্ম ॥
দ্বাদস বৎসর নাহি দেখি শূনি কাণে ।
আর কোথা পাব সেই পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
এত বলি কান্দে ভিশ্ম সজল নয়ন ।
দ্রোণ বলে ধৈর্য্য হয় তেজ শোক মন ॥
পৃঃ ১৪০

মুদ্রিত গ্রন্থ

কৃষ্ণ কন অন্যায় করিলে দুষ্টগণ ।
তুমি আমি আছি হেথা কিসের কারণ ॥
মম বিদ্যমানে হেন করে অত্যাচার ।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা ।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফল দাতা ॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব ।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব ॥
সুদর্শনে ছেদিব যে সকল দুষ্টমতি ।
পূর্ব্বে যথা নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ভৃগুপতি ॥

* *

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে ।
চক্র ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মৎস্য তার মানিক নয়ান ।
সেই মৎস্যচক্ষু বিন্ধিবেক যেইজন ॥
সেই হবে বল্লভ আমার ভগিনীর ।
এত শুনি জলে চাহে পার্থ মহাবীর ॥
পৃঃ ২২১

* * *

হ ঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

কৃষ্ণ বৈল অন্যায় করিব দুষ্টগণ ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ ॥
আমা বিদ্যমানেতে করিব বলাৎকার ।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ॥
জগত জনের আমি অন্তে হই ত্রাতা ।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফল দাতা ॥
জদি সমোচিত শাস্তি আমি নাঞি দিব ।
তবে জগন্নাথ নাম লোকে কেন লব ॥
সুদর্শনে দাহিব সকল দুষ্টমতি ।
পূর্ব্বে জেন নিক্ষেত্রি করিল ভৃগুপতি ॥

* *

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে ।
চক্রছিদ্রমধ্যে এই পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মচ্ছ তার মাণিক নয়ন ।
এই মৎস্যচক্ষু ভেদিবেক জেই জন ॥
লহিব মোহর ভগ্নী দ্রুপদ দুহিতা ।
এতসুনি জলে দেখে পার্থ মহারথা ॥
পৃঃ ১৭৫।১৭৬

* *

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

কৃষ্ণ বৈল অন্যায় করিব দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিআছি কিসের কারণ॥
আমা বিদ্যমানে তে করিব বলৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগত জনের আমি হই আর্ত্তি ভর্ত্তা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফল দাতা॥
জদি আমি সমচিত সাস্তি নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ নাম সভে লব॥
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে জেন নিক্ষেত্রি করিল ভৃগুপতি॥

*　　*　　*

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্র মধ্যে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মানিক নয়ন।
সেই মৎস্য চক্ষু ভেদিবেক জেইজন॥
সেই লব মোর ভগ্নী দ্রোপদ দুহিতা।
এত সুনি জলে দেখে পার্থ মহারথা॥

পৃঃ ২০৬ক।২০৬

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

কৃষ্ণ বৈল অন্যায় করিব দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ॥
আমা বিদ্যমানেতে করিব বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগজনের আমি আপনি হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলের দাতা॥
জদি আমি সমচিত সাস্তি নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ নাম লোকে নিব॥
সুদর্সনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে জেন নিখেত্রি করিল ভৃগুপতি॥

*　　*　　*

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্ররন্ধ্রে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মানিক নয়ন।
সেই মৎস্য চক্ষু ভেদীবেক জেই জন॥
লভিবেক ভগ্নী মোর দ্রোপদ দুহিতা।
এত শূনী জলে দেখে পার্থ মহারথা॥

পৃঃ ১৪০।১৪১

মুদ্রিত গ্রন্থ

কহ গিয়া তোমার সে মহারাজগণে।
অভিলাষ সে সবার থাকে যদি ধনে॥
আমি দিব সে সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব সে আনিয়া॥
সেই সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি॥

পৃঃ ২২৩

*　　*　　*

ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে॥

পৃঃ ২৩১

*　　*　　*

কান্দয়ে দ্রোপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল, বৃদ্ধ মম বাপ॥
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
বহু বিলাপিয়া দেবী করেন ক্রন্দন॥

পৃঃ ২৩৫

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

দুর্য্যোধন আদি জত কহ রাজা গণে।
অভিলাষ তা সবার আছে জদি ধনে॥
আমি দিব সসাগরা পৃথিবী শাসিআ।
নানারত্ন ধন দিব কুবের জিনিয়া॥
তোমা সভাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভারে কহিল দ্বিজ মনি॥

পৃঃ ১৭৭

*　　*　　*

ভাদ্রমাসে পাকা তাল জেন পড়ে ঝড়ে।
পুঞ্জু পুঞ্জু স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে॥

পৃঃ ১৮৪

*　　*　　*

কান্দএ দ্রোপদী দেবী করিআ বিলাপ।
নাহি জানি কিবা হৈল বৃদ্ধ মোর বাপ॥
না জানি এ কিবা হৈল মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
না জানি এ কিবা হৈল রাজ্য প্রজাগণ॥

পৃঃ ১৮৭

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

দুর্জোধন আদি করি কহ রাজা গণে।
অভিলাস আছে জদি তো সভার ধনে॥
আমি দিব সসাগরা পৃথিবি সাসিয়া।
নানা রত্ন দিব তারে কুবের জিনিঞা॥
তোমা সভাকার ভার্জা মোরে দেহ আনি।
এই কথা দুর্জোধনে বলে নৃপমনি॥

পৃঃ ২০৮

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

দুর্য্যোধন আদি করি কহ রাজা গণে।
অভিলাশ থাকে জদি তো সভার ধনে॥
আমি দিব সসাগরা পৃথিবী সাসীয়া।
না রত্ন ধন দিব কুবের জিনিঞা॥
তোমা সভাকার ভাজ্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাকার কহিয়ে দ্বিজমনি॥

পৃঃ ১৪২

* * *

ভাদ্রমাসে পাকা তাল জেন পড়ে ঝড়ে।
পুঞ্জ পুঞ্জ স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে॥

পৃঃ ২১৬।২১৭ক

ভাদ্র মাসে পাকা তাল জেন পড়ে ঝড়ে।
পুঞ্জ পুঞ্জ স্থানে স্থানে পার্থ কাটিপাড়ে॥

পৃঃ ১৪৭

* * *

কান্দএ দ্রোপদি দেবি করিয়া বিলাপ।
না জানি কি হইল মোহর বুড়া বাপ॥
নাহি জানি কি হইল ভাত্রি মৈত্রিগণ।
প্রজাসব কি হইল না জানি কারণ॥

পৃঃ ২২১

কান্দএ দ্রোপদি দেবি করিয়া বিলাপ।
না জানি কি হইল বির্দ্ধ মোর বাপ॥
না জানি কি হৈল গৃহেবির্দ্ধ মাত্রিগণ।
না জানি কি হৈল রাজ্যের প্রজাগণ॥

পৃঃ ১৪৯

মুদ্রিত গ্রন্থ

পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয় পংকজ হয় গোবিন্দের পাদ॥
এ মহা বিপদে সিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দকে স্মরণ করহ যাজ্ঞ সেনী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ! বিপদহন্তা সবাকার তাত॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ॥
পিতামাতা রাখ মোর, রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ॥
তুমি সত্য বট যদি আমি যদি সতী।
দুষ্টগণে মারিবে, আমার দ্বিজপতি॥

পৃঃ ২০৫

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

পার্থ বলে কি হৈব করিলে বিষাদ।
অভয় পঞর স্মর গোবিন্দের পদ॥
মহা বিপত্তি সিন্ধু তরণের তরণী।
গোবিন্দের নাম বিনা নাহি যাজ্ঞসেনী॥
অর্জ্জুনের বাবে৷ কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদ ত্রাতা সভাকার তাত॥
তোমা বিনে রাখে মোরে নাঞি হেন জন।
এ মোর বিপত্যে রক্ষা কর নারায়ণ॥
তাত মাত রাখ মোর রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রাখ জত প্রজাগণ॥
তুমি জদি সত্যপাল আমি জদি সতী।
সভা জিনি, মোরে লকৃ দ্বিজ মোর পতি॥

পৃঃ ১৮৭

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ ২৩০০	১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ ১০৭৩
পার্থ বলে কি হইব করিলে বিসাদ।	পার্থ বলে কী হইব কবিলে বিসাদ।
অভয় চরণ ভাব গোবিন্দের পদ ॥	অভয় পঞ্জুর স্মঙর গোবিন্দের পাদ ॥
এ মহাবিপদে পাত (??) তরিতে তরণি।	মহাসিন্ধু তরিবারে চরণ তরণি।
গোবিন্দের পদ বিনে নাহি জজ্ঞসেনি ॥	গোবিন্দের পদ বিনে নাহি জজ্ঞ সেনি ॥
অর্জ্জুনের বোলে কৃষ্ণা স্বরে জগন্নাথ।	অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মবে জগন্নাথ।
হা কৃষ্ণ আপদ ত্রাতা সভাকার তাত ॥	হে কৃষ্ণ আপদ ত্রাতা সভাকার তাত ॥
তোমা বিনে তারে মোরে নাহি অন্যজন।	তোমা বিনে রাখে মোবে নাহি অন্যজন।
এ মোর বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥	এমন বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
তাত মাত রাখ মোর রাখ ভ্রাত্রিগণ।	তাত মাত রাখ মোর রাখ ভ্রাতৃগণ।
রায্য রাখ প্রজা রাখ রাখ নিজ — ॥	রাজ্য দেস রাখ মোর বাখ প্রজাগণ ॥
তুমী জদি সত্যপাল মুঞি জদি সতি।	তুমি জদি সত্য পাল আমি জদি সতি।
সভারে জিনিঞা লউক দ্বিজ মোর পতি ॥	সভা জিনি লইবেন দ্বিজ মোর পতি ॥
পৃঃ ২২১ক	পৃঃ ১৪৯

মুদ্রিত গ্রন্থ	হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ
শুনি শূরসেন সুতা দোঁহে করি কোলে।	সুনি শূরসেন সুতা দুহঁ। কৈল কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥	দুহাঁরে করাল্য স্নান লোচনের জলে ॥
কোথা ছিলি বাপু। অন্ধা অনাথার লড়ি।	কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধলের লড়ি।
হাপুতির পুত যেন দারিদ্রের কড়ি ॥	হাপুতির পুত্র মোর দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদশ বছর আজি মুখ নাহি দেখি।	দ্বাদশ বৎসর হৈল মুখ নাঞি দেখি।
অনুক্ষণ কাঁদিয়া দুর্ব্বল হইল আঁখি ॥	নিরবধি তোমা দু'হা স্মোঙরিঅা থাকি ॥
আজিকার রাত্রি মোর হৈল সুপ্রভাত।	আজি যে রজনী মোর হৈল সুপ্রভাত।
দ্বাদশবর্ষের কষ্ট আজি গেল তাত ॥	দ্বাদশ বচ্ছর কষ্ট গেল আজি তাত ॥
কহ তাত সবাকার কুশল সমাচার।	কহ তাত পরের কুশল সমাচার।
তোমাদের জননীর ভ্রাতার আমার ॥	তোমার জননীগণ ভ্রাতার আমার ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।	দ্বাদশ বৎসর হৈল নাঞি দেখি সুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি ॥	কেবা মরে কেবা জীএ একো হি না জানি ॥
নাহি জানি তোমাদের এত নিষ্ঠুরতা।	না চাহি তোমারে তাত এত নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা ॥	জানিলাঙ নির্দ্দয় তোমার মাতাপিতা ॥
গহন কাননে ভ্রমি আর কত দেশ।	বনে বনে কত ভ্রমিলাঙ দেশে দেশে।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ ॥	দ্বাদশ বৎসর মোর না কৈলে উদ্দেশে ॥
পৃঃ ২৩৯	পৃঃ ১৮৯

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

সুনি সুরসেন সুতা দুহে ধরি গলে।
দুহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥
কোথা ছিল তাত মোর অন্ধলার লড়ি।
হাপুতির পুত্র মোর দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদস বৎসর আমি মুখ নাই দেখি।
নিরন্তর কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি ॥
আজি সে রজনি মোর হৈল সুপ্রভাত।
দ্বাদস বৎসরের দুখ আজি গেল তাত ॥
কহ বাপু গ্রীহের কুসল সমাচার।
তোমার জননিগণ ভাইর আমার ॥
দ্বাদস বৎসর হেন নাহি দেখি সুনি।
ভাল মন্দ সমাচার কিছুই না জানি ॥
না চাহিএ তোমারে এতেক নিষ্ঠুরতা।
না চাহিএ এতেক নির্দ্দয় তব পিতা ॥
বনে বনে ভমিলাম কত কত দেস।
দ্বাদস বৎসর মোর না কৈল উর্দ্দেস ॥

পৃঃ ২২৪ক।২২৪

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

শুনি শুরসেন সুতা দুহা ধরি কোলে।
দুহারে করাইল স্নান নয়নের জলে ॥
কোথা ছিলি তাত মোর অন্ধলার লড়ি।
হাপুতির পুত মোর দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদস বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হইল আঁখি ॥
আজি রজনী মোর হইল সুপ্রভাত।
দ্বাদস বৎসর কষ্ট আজি গেল তাত ॥
কহ তাত পূর্ব্বে কুসল সমাচার।
তোমার জননিগণ ভাএর আমার ॥
দ্বাদস বৎসর হইল নাহি দেখি শুনী।
কেবা মরে কেবা জিএ কিছুই না জানি ॥
না চাহিএ তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না চাহিএ এতেক নিষ্ঠুর তব পিতা ॥
বনে বনে কতেক ভ্রমিলাঙ দেসে দেসে।
দ্বাদস বৎসর মোর না কৈল উদ্দেসে ॥

পৃঃ ১৫১

মুদ্রিত গ্রন্থ

বিচিত্র কবরীভার সু'চাচব চুল।
মেঘেতে সপ্পারে যেন কুরুবক ফুল ॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুল।
চতুর্দ্দিকে ঝংকারিয়া অনুক্ষণ বুলে ॥
দুই গণ্ড কুন্তল মণ্ডিত শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমোতি শোভে নাসা হুলে ॥
বদন নিন্দিয়ে চাঁদে নাসা তিল ফুলে।
কটাক্ষের চাহনিতে মুনিমন ভুলে ॥
কুচযুগ সমপূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুল ॥
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতি যুথী হার পরে মালতী বকুল ॥

পৃঃ ২৬৭

হ ঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

বিচিত্র কবরীভার সুচাচর চুলে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন কুরুবক ফুলে ॥
তার গন্ধে মকরন্দে ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ ঘোর রবে বুলে ॥
দুই গণ্ড মণ্ডি কুন্তল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি সমমূর্ত্তি শোভে নানা ফুলে ॥
বদন মদন শোভে নাসা তিল ফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন টলে ॥
কুচযুগ সমগ্রীব ঢাকিয়া দুকূলে।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুলে ॥
করপদ কোকনদ সমান রাতুলে।
জঘন সরস ঘন কি তুল আতুলে ॥
যাতি যূথি হার গলে মালতী বকুলে।
সভাকার পাছে রামা জায় কুতূহলে ॥

পৃঃ ২১৪

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ ২৩০০

বিচিত্র কবরীভার সুচাচর চুলে।
মেঘেতে বিদ্যুত জেন কুরুবক ফুলে॥
তার গন্ধে মকরন্দে তেজি অলিকুলে।
চর্তুদ্দিগে ঘোর (??) রবে অনুক্ষণ বুলে॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি সোভে নাসা হুলে॥
বদন মদন কান্দে নাসা তিল ফুলে।
কট্টাক্ষেতে চাহিতে মুনির মন ভুলে॥
কুচযুগ সমপুগ ডাকিআ দুকূলে।
মধ্যদেশ সম বেস্ নহে সমতুলে॥
করপদ কোকনদ সমান রাতুলে।
জঘন সরসঘন কির্ত্তন আতুলে॥
হেরিআ লুহিত কাম চরণ অতুলে।
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ — (??) রা অলিম্বনে॥
জাতি মুতি হার উরে মালতির ফুলে।
রাজ হংস গতি — (??) মন্দ মন্দ চলে॥

পৃঃ ২৫২

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ ১০৭৩

বিচিত্র করবিভার সুচাচর চুলে।
মেঘেতে বিদ্যুত জেন কুরুবক ফুলে॥
বদন কমল ফুল নাশা তিল ফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে॥
কুচযুগ সমপূগ ঢাকিয়া মুকুলে।
মধ্যদেশ মৃগইশ নহে সমতুলে॥
জঘন সরসঘন কি তুল অতুলে।
হেরি মুরছিত কাম বরণ উজ্জলে॥
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ গুরুয়া বিপুলে।
জাতি যুতি হার উরে মালতি বকুলে॥

পৃঃ ১৬৯

মুদ্রিত গ্রন্থ

সুভদ্রা বলিল, দেবি! ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাত।
দেখেন পদেতে নাহি কণ্টকাঘাত॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা বসিলা॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল তা কোথা পাবে দেখি॥
অর্জ্জুনের মনোজ্ঞ অপাঙ্গ তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জরজর॥
দেখ মোর অঙ্গতাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ॥

পৃঃ ২৬৭

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

সুভদ্রা চলিল দেবি ধরি মোরে লেহ।
কণ্টক ফুকিল পায় বাহির করহ॥
সুনি সত্যভামা তবে তুলি লৈল হাথে।
নাহিক কণ্টক ঘাত দেখিল পদেতে॥
সত্যভামা বলে রামা কি হেতু ভাণ্ডিলে।
নহিক কণ্টকঘাত তোর পদতলে॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে সুন প্রাণসখি।
জে কণ্টক ফুকিল কোথা পাবে দেখি॥
অর্জ্জুনের চাহনি কটাক্ষ তীক্ষ্ণ শর।
বাজিআ মোহর তনু হইল জর্জ্জর॥
দেখ মোর অঙ্গতাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ॥
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি জাইতে।
এত বলি দেখে পার্থে ফিরিয়া পশ্চাতে॥

পৃঃ ২১৪

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ ২৩০০

সুভদ্রা বলিল দেবি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পাঅ বাহির করহ ॥
বুন সত্যভামা তুমি ধরি লেহ হাথে।
নাহিক কণ্টকঘাত দেখিল পদেতে ॥
সতঅভামা বলে মিথা কিহেতু কহিলে।
নাহিক কণ্টকবাত কি হেতু পড়িলে ॥
নিভৃতে সুভদ্রা বলে বুন সসিমুখি।
জে কণ্টক ফুটিল কথাঅ পাবে দেখি ॥
অর্জ্জুনের নঅন চাহনি তিক্ষ্ণ সর।
বাজি মোর সরির হইল জরজর ॥
দেখি মোর অঙ্গ তাপ ঘন কম্পবান।
ছটফট করে তুনু বাহিরাঅ প্রাণ ॥

পৃঃ ২৫৩ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ ১০৭৩

সুভদ্রা বলিল দেবি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ভুখিল পায় বাহির করহ ॥
সুনি সত্যভামা তুলি ধরিলেন হাথে।
নাহিক কণ্টকঘাত দেখিল পদেতে ॥
সত্যভামা বলে মিথ্যা কি হেতু ভাণ্ডিলে।
নাঞিক কণ্টক ঘাত কি হেতু পড়িলে ॥
নৃভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ভুখিল কোথায় পাবে দেখি ॥
অর্জ্জুনের নয়নের চাহনি খুব সর।
বাজি মোর সরির করিল জরজর ॥
দেখি মোর অঙ্গতাপ সঘনে কম্পন।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ ॥

পৃঃ ১৬৯

মুদ্রিত গ্রন্থ

তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে ॥
এক ভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখে বিলাস।
যেইহেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥
সেইহেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব আর এক পরমা সুন্দরি ॥

* * *

দেবী বলিলেন, ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
একতিল পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥
যে লোভে নারদবাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছি বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা বিভা দ্রৌপদীর ভয় ॥

পৃঃ ২৬৯

হুঃ প্রেঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

তোমার কষ্টের কথা সুনিঞা শ্রবণে।
না হৈল নিদ্রা মোর তাপ উঠে মনে ॥
এক ভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখে বিলাস।
জেই হেতু দ্বাদশ বচ্ছর বনবাস ॥
তে কারেণে আইলাঙ হৃদয়ে বিচারি।
বিভা দিব আর এক উত্তম কুমারী ॥

* * *

দেবী বলে মোর বোলে করিবে কেমনে।
মন বান্ধিআছে কৃষ্ণা ঔধধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে ঔষধের গাছ।
তিল এক পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে কাছ ॥
লোভেতে নারদবাক্য করিলে হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমি বুল বনে বন ॥

পৃঃ ২১৫

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ ২৩০০

তোমার কষ্টের কথা শুনিআ শ্রবনে।
না হইল নিদ্রা মোর মহাতাপ উঠে মনে॥
এক ভার্জা পঞ্চ ভাই কিসের নিবাস।
জেই হেতু দ্বাদস বৎসর বনবাস॥
তে কারণ আইলাম হৃদঅ বিচারি।
বিভা দিব আর এক পরম সুন্দরি॥

*　　*　　*

দেবি বলে মোর বোলে করিব কেমনে।
মন বান্ধিআছে কৃষ্ণা ঔসধের গুণে॥
পাঞ্চালের কর্না জানে ঔসধের গাছ।
তিল এক পঞ্চ স্বামি নাহি ছাড়ে কাছ॥
জেন লোভে নারদ বাক্য করিলেন হীন।
দ্বাদস বৎসর তুমি বুলে বনে বন॥
ইহাতে তোমারে কিছু লজ্জা নাহি হঅ।
কেমনে করিবে বিভা দ্রৌপদির ভঅ॥

পৃঃ ২৫৪।২৫৫ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ ১০৭৩

তোমার কষ্টের কথা সুনিঞা শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মহাতাপ ভাবি মনে॥
এক ভার্জ্যা পঞ্চভাই কি সুখ বিলাষ।
জেই হেতু দ্বাদস বৎসর বনবাস॥
তে কারণে আইলাঙ হৃদএ বিচারি।
বিভা দিব আর এক উর্ত্তম সুন্দরি॥

*　　*　　*

দেবি বলে মোর বোলে করিবে কেমনে।
মন বান্ধিআছে কৃষ্ণা ঔসধের গুণে॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মৌসধি গাছ।
তিল এক পঞ্চ স্বামি নাঞি ছাড়ে কাছ॥
জে লোভে নারদ বাক্য করিলে লংঘন।
দ্বাদস বৎসর তোঞি ভ্রম বনে বন॥
ইহাতে মোহোর লজ্জা কভু নাঞি হয়।
কিমতে করিবে বিভা দ্রৌপদির ভয়॥

পৃঃ ১৭০।১৭১ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

পার্থ বলিলেন দেবি না নিন্দ দ্রৌপদি।
ত্রিজগৎ জনে খ্যাত তব মহৌষধি॥
ষোড়শ সহস্র শত অষ্ট পাটরানী।
সবা হৈতে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী॥
অপুত্রা কি রূপহীনা হীন কুলে জাত।
রুক্মিনী প্রভৃতি কন্যা পাটরানী শত॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি-চান॥
দিব্য রত্ন বসনাদি ভূষণ অলংকার।
যেখানে যে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার॥
অন্যজনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবি ইহা কোন গুণে কর॥

পৃঃ ২৬৯

তুঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

পার্থ বলে সত্যভামা না নিন্দহ দ্রৌপদী।
ত্রিজগতে জানে খ্যাত, তোমার ঔষধি॥
ঔষধের গুণে কৃষ্ণ তোমাকে ডরায়।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যারে না চায়॥
দিব্য রত্ন বসন ভূষণ অলংকার।
জেখানে জে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার॥
অন্যজনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবি তুমি কোন গুণে কর॥

পৃঃ ২১৭

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।	১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ ২৩০০	সাঃ ১০৭৩
পার্থ বলে সত্যভামা নিন্দহ দ্রৌপদি।	পার্থ বলে সত্যভামা না নিন্দহ দ্রৌপদি।
ত্রিজগত জানে ক্ষেতি তব জে ওসধি ॥	ত্রিজগত জনে জ্ঞাত তোমার য়োসধি ॥
সোল সহস্র এক সত অষ্ট বর্মাণি।	ষোল সহস্র আব অষ্ট পাটরাণি।
ইথি মধ্যে কোন গুণে তুমি সহাগিনি ॥	সভা মধ্যে কোন গুণে তুমি সোহাগিনি ॥
অপুত্র কি — অন্য কুলে জাত।	অপুত্র কি অসৌন্দর্জ্যে অন্ধকুল জাত।
রুক্মি প্রভিতি আর পাট বাণি শত ॥	রুকিকনি প্রভৃতি আব পাটরাণি সাত ॥
ওসধেব গুণে হবি তোমারে ডবাঅ।	ঔসধেব গুণে হবি তোমারে ভবায।
তোমার সাক্ষতে চক্ষে অর্নে নাহি চাঅ।	তোমাব সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাঞি চায ॥
দিব্য বস্ত্র বসন ভুসন অলংকাব।	দিব্য বস্ত্র ভূসনাদি নানা অলংকাব।
জেখানে জে পান কৃষ্ণ সকল তোমাব ॥	জেখানে জে পান কৃষ্ণ সকলি তোমাব ॥
অন্যজনে দিলে তুমি পাবাণ না ধব।	অন্যজনে দিলে তুমি পবাণ না ধর।
কহ মহাদোবি ইহা কোন গুণে ধব ॥	অন্যজনে চান যদি অনর্থক কর ॥
পৃঃ ২৫৫	পৃঃ ১৭১

মুদ্রিত গ্রন্থ

তুমি লক্ষ্মী সবস্বতী তুমি রতি অনুন্ধতি
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দাত্রী চতুর্ব্বর্গ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয বিধাতা ॥
পৃঃ ২৭৯

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

তুমি লক্ষ্মী সবস্বতী বতি সতি অবুন্ধতি
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধ ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয বাবতা ॥
পৃঃ ২২৪

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ ২৩০০

তুমি লক্ষি স্ববেস্বতি বতিপতি অরুন্ধতি
পাববতি সাবিত্রি দেব মাতা।
তুমি অর্দ্ধক্ষেতি সর্গ তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ
স্রিষ্টি স্থিতি প্রলঅ করতা ॥
পৃঃ ২৬৫ক

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ ১০৭৩

তুমি লক্ষি স্বরস্বতি সতিরতি অরুন্ধতি
পার্ব্বতি সাবিত্রি বেদমাতা।
তুমি অধো ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দাতা চতুস্বর্গ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতা ॥

পৃঃ ১৭৭

মুদ্রিত গ্রন্থ

নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্র তারে আনেন ডাকিয়া ॥
একান্তে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে, ঠাকুরাণি এ কোন বিচিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারি! পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিসার অনাহার পারি মোহিবারে ॥
এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
যাহ দেবি! এইক্ষণে যাইতে পারে বাট।
হস্তে দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥

পৃঃ ২৮৫

হঃ প্রঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সখী দিয়া শীঘ্রগতি আনিল ডাকিয়া ॥
গুপতে কহিল জত ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে ঠাকুরাণি একোন চরিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্ম অনাহারী পারি মোহিবারে ॥
এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
জাহ দেবি এখনি জাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥

পৃঃ ২৩০

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ ২৩০০

নানা মায়া জানে মায়াবতী কাম পৃয়া।
সখি গিয়া সিঘগতি আনিল ডাকিয়া ॥
গুপ্ততে কহিল সব ভদ্রার চরিত্র।
সুনি মায়া রতি বলে এ কোন বিচিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারি সাথে গর্ব্ব করে।
অস্থি চর্ম্ম অনাহারি পারি মোহিবারে ॥
এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
জাহ দেবি দেখ নিজ জাইতে তুমি বাট।
হস্ত দিলে খুলিবেক দ্বারের কপাট ॥

পৃঃ ২৭০

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ ১০৭৩

নানা মায়া জানে মায়াবতি কাম পৃয়া।
সখি দিয়া সিঘ্রগতি আনিল ডাকিয়া ॥
গুপ্তেতে কহিল জত ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে ঠাকুরাণি এ কোন বিচিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারি পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থি চর্ম্ম অনাহারি পারি মোহিবারে ॥
এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
জাহ দেবি আপনি জাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে খুলিবেক দ্বারের কপাট ॥

পৃঃ ১৮১

মুদ্রিত গ্রন্থ

কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি ।
স্ত্রী নহিলে কাটিতাম খড়্গেতে এখনি ॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে ।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব এ খড়্গে ॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি ।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥

পৃঃ ২৮৫

* * *

যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি ।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি ॥

* * *

বাতুলের প্রায় মাতা কহিছ বচন ।
অন্য হইলে কোথা তার রহিত জীবন ॥

পৃঃ ২৮৮

হঃ প্রেঃ শাঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিলা ফাল্গুনি ।
স্ত্রী জাতি নহিলে খড়্গে কাটি থু' এখনি ॥
জাহ শীঘ্র এথা হৈতে প্রাণ লইয়া বেগে ।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব খড়গে ॥
এত বলি উঠে পার্থ হাতে লয়্যা ছুরি ।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥

পৃঃ ২৩০

* * *

জে কহ যে কহ তাত ক্রোধে কর তুমি ।
প্রভাতে পার্থেরে ভদ্রা বিভা দিব আমি ।

* * *

বাতুলের প্রায় মাতা কহসি বচন ।
অন্যজন হৈলে কোথা রহিত জীবন ॥

পৃঃ ২৩১

১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি ।

কঃ বিঃ ২৩০০

কে তুমি বলিআ ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি ।
স্ত্রী জানি নহিলে খড়গে কাটীতাঙ এখনি ॥
জাহ সিঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লআ বেগে ।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটীতাঙ খড়গে ॥

পৃঃ ২৭০

এত বলি উঠে পার্থ হাথে কাব ছুরি ।
দেখি সুভদ্রার অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥

পৃঃ ২৭১

* *

জে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি ।
কালি প্রাতে পার্থে বিভা দিব আমি ॥

* *

বাতুলের প্রায় মাতা কহিস বচন ।
অন্য জন হৈলে কোথা রহিত জীবন ॥

পৃঃ ২৭৩

১০৮০ বঙ্গাব্দের পুঁথি ।

সাঃ ১০৭৩

কে তুঞি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি ।
স্ত্রীজাতি নহিলে খড়গে কাটিথু এখনি ॥
জা জা সিঘ্র এথা হৈতে প্রাণ লঞা বেগে ।
নহিলে নাসিকা কাটীব এই খড়গে ॥
এত বলি উঠে পার্থ হাথে লঞা ছুরি ।
দেখিয়া সুভদ্রা কাঁপে থরহরি ॥

পৃঃ ১৮১

* * *

জে কর সে কর তাত ক্রোধ কর তুমি ।
কালি প্রাতে পার্থে ভদ্রা বিভা দিব আমি ॥

* * *

বাতুলের প্রায় মাতা কহসি বচন ।
অন্যজন হৈলে কোথা রহিথ জিবন ॥

পৃঃ ১৮২

মুদ্রিত গ্রন্থ

তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মোর মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালায় সন্নিহিতে॥
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
চৌদিকে শাসিয়া তথা করিলা বসতি॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্যরত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা শাস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল॥
কৌমোদকী গদাতুল্য পরম সুন্দর।
বিন্দু সরোবরে এক আছে গদাধর॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব শোভা ধরে।
সেই গদা সাজিবেক বীর বৃকোদরে॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ যে পাইল মনোহর॥

পৃঃ ৩১৯

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মোর মন নিত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
য়াজ্ঞা কর যাব আমি উত্তর কৈলাসে।
মৈনাক পর্ব্বত বৈসে হিমালয় পাসে॥
বৃসপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
তৈলোক্য জিনিয়া কৈল তথায় বসতি॥
তার সভা পূর্ব্বে আমি করিল নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকে জত দির্ব্য রত্ন পাইল।
নানা রত্নে নানা অর্থে গৃহ পূর্ণ কৈল॥
কৌমদকি গদা তুল্য আছে গদাধর।
সেই গদা জগ্য এই বির বৃকোদর॥
তব হস্তে জেমত গাণ্ডিব ধনু সাজে।
হেন সঙ্খবর আছে বিন্দুসর মাঝে॥
বরুণ জিনিয়া বৃসপর্ব্বা দৈত্তেস্বর।
দেবদত্ত সঙ্খ পাইল লোকে মনোহর॥

পৃঃ ৩

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

তবে মঅ বলে ধনঞ্জঅ বিদ্যমানে।
মোর মনমত সভা নহিল নির্ম্মাণে॥
আজ্ঞা কর জাব আমি উত্তর কৈলাসে।
মৈনাক পর্ব্বত বৈসে হিমালয় পাসে॥
বৃসপর্ব্বা নামে ছিল দানব্রের পৃতি।
ত্রৈলোক্য জেনিআ কৈল তথায় বসতি॥
তার সভা পূর্ব্বে আমি করিল নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে জত দির্ব্য রত্ন পাইল।
নানা রত্নে নানা অস্ত্রে গৃহ পূর্ন্ন কৈল॥

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মোর মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আঙ্গা কৈলে জাব আমি মৈনাক কৈলাসে।
মৈনাক পর্ব্বত বৈসে হিমালয় পাসে॥
বৃসপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
কৈলাস সাসিয়া কৈল তথায় বসতি॥
তার সভা পূর্ব্বে আমি করিল নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে জার দিব্য রত্ন পাইল।
নানা রত্নে নানা অস্ত্রে গ্রিহ পূর্ণ কৈল॥

কৌমদকী গদাতুল্য আছে গদাধর।
সেই গদাজঙ্গ বির বৃকদর ॥
তব হস্তে জেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাধর আছে বিন্দু সর মাঝে ॥
বরুণ জিনিঞা বৃসপর্ব্বা দৈত্যশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ পাইল লোক মনোহর ॥

পৃঃ ২

কৌমদকী গদাতুল্য আছে গদাধর।
সে গদায় যোগ্য হয় বির বৃকোদর ॥
তব হস্তে জেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদা আছে তথা বিন্দুসর মাঝে ॥
বরুণ জিনিয়া বৃসপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত সঙ্খ পাইল দেব মনোহর ॥

পৃঃ ৪ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

যার শব্দ শুনি দর্প তাজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষে শোভন ॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর গিয়া আমি আনিব সত্বরে ॥
অর্জ্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে ॥
ইহা শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরে মৈনাক যথা রয় ॥
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
যথা করিলেন যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহুগুণ যুত স্থান না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রক্ষক কিন্নরগণ মাথে করি নিল ॥

পৃঃ ৩১৯

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

জার সব্দ শুনি দর্প হরে ঋপুগণ।
তোমারে সে সঙ্খ ভাল হইব সোভন ॥
এই সব দর্ব্য য়াছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া য়ানিব সর্ত্তরে ॥
এতেক বলিলা দানবরাজ ময়।
উত্তর কৈলাসে গেলা হেমন্ত য়ালয় ॥
ভাগিরথি হেতু জথা রাজা ভগিরথ।
বহুকাল হৈতে সেবিল গঙ্গাব্রত ॥
নরনারায়ণ সিব জম পুরন্দর।
সেই স্থানে জঙ্গ কৈল অনেক বৎসর ॥
সেই খানে শ্রষ্টা সৃষ্টি করিল কল্পনা।
বহুগুণ ধরে তার না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সর্ব্বদ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ মাথে করি নিল ॥

পৃঃ ৩

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

জার সব্দ সুনি দর্প হরে ঋপুগণ।
তোমারে সে শঙ্খ ভাল হইর সোভন ॥
এই সব দর্ব্য আছে বিন্দু সরোবর।
আজ্ঞা কর আমি নিআ আনিব সর্ত্তর ॥

১১৫৩ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

জার সব্দ ধ্বনি দর্প হরে বিরগণ।
তোমারে সে সঙ্খ হব বিসেষে শোভন ॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আঙ্গা কর মহাবির আনিব সর্ত্তরে ॥

এত বলি চলিল দানব রাজ ময় ।
উর্ত্তর কৈলাসে গেলা হেমন্ত আলয় ॥
ভাগিরথি হেতু যথা রাজা ভগিরত ।
বহুকাল পর্জ্যন্ত সেবিল করি ব্রত ॥
নর নারায়ণ সিব জম পুরন্দর ।
সৈই স্থানে জঙ্গ কৈল অনেক বচ্ছ'র ॥
সেই স্থানে শ্রষ্টা সৃষ্টি করেন কল্পনা ।
বহুগুণ ধরে তার না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সর্ব্ব দ্রব্য বাহির করিল ।
রাক্ষস কিন্নরগণ মাথে করি নিল ॥

পৃঃ ২ক

এত বলিল দানব রাজা ময় ।
উর্ত্তর কৈলাষে জথা হেমন্ত তনয় ॥
ভাগিরথি হেতু জথা রাজা ভগিরথ ।
বহুকাল হৈতে সেবিল গঙ্গাব্রত ॥
নর নারায়ণ সিব জম পুরন্দরে ।
জেই থানে জঙ্গ কৈল অনেক বৎসর ॥
জেখানে স্রষ্টা সৃষ্টি করিল বর্ণনা ।
বহুগুণ পুণ্য স্থান না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সর্ব্বদ্রব্য বাহির করিল ।
রাক্ষস কিন্নরগণ মাথে করি নিল ॥

পৃঃ ৪ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপাম ।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে ।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে ॥
কনক বৈদূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল ।
মরকত স্ফটিক ও রৌপ্য চিত্রঢাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণিহীরা ।
সর্ব্বগৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থান সব কৈল রত্ন ছেদি ।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদি ॥
নানা জাতি বৃক্ষ সব ফুল ফল শোভে ।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
ভানু বৃহদ্ভানু জিনি পূর্ণচন্দ্র প্রভা ।
সুরাসুরে অপূর্ব্ব করিল ময় সভা ॥

পৃঃ ৩১৯।৩২০

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি । সাঃ পঃ
পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

দেবদত্ত সঙ্খ নিল গদা অনুপাম ।
জত রত্ন নিল তার কত লব নাম ॥
ভিমে গদা দিল, সঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে ।
দেখি আনন্দিত হৈল পঞ্চ সহোদরে ॥
কনক বৈধুর্জ্য মণি মুকুতা প্রবাল ।
মরকত কনক ফটিক চিত্র ঢাল ॥
ফটিকের স্তম্ভ চিত রঙ্গে মুণিহীরা ।
সর্ব্বগৃহে চর্তুর্দ্দিগে মুকুতার ঝারা ॥
বসিবারে স্থানে স্থানে কৈল রত্ন বেদি ।
উচ্চে উচ্চে..........জন নিধি ॥
নানা জাতি বিক্ষগণ ফল ফুল সোভে ।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
ভানু বৃহত জেন পূর্ণচন্দ্র প্রভা ।
সুরাসুরে য়পূর্ব্ব করিল ময় সোভা ॥
উচ্চ নীচ বুঝিবারে ভ্রম হয় লোকে ।
বিসেসে বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥

পৃঃ ৪ক

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭০৮

দেবদত্ত সঙ্খ নিল গদা অনুপাম।
জত রত্ন নিল তার কত লব নাম॥
ভিমে গদাদিল সঙ্খ দিল তার্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে॥
কনক বৈদূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত কনক ফটিক চিত্র ঢাল॥
ফটিকের স্তম্ভ কিবা চিত্র মুনিহীরা।
সর্ব্বগুণি লায়ে পনা মুকুতার ঝারা॥
বসিবারে স্থানে স্থানে কৈল রত্ন বেদি।
উর্চ্চ্ খস্কর্ন্নের (?) জন অতি গুণ নিধি॥
নানা জাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল সোভে।
ভ্রমএ ভ্রমর সব মকরন্দ লোভে॥
ভানু বৃহাভানু জেন পূর্ণচন্দ্র আভা।
সুরাসুর অপূর্ব্ব করিল ময় সোভা॥

পৃঃ ৩ক

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

দেবদত্ত সঙ্খ নিল গদা অনুপাম।
জত রত্ন তুলিলেক কত লব নাম॥
ভিমে গদা দিল সঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি য়ানন্দিত হইল দুই সহোদরে॥
কনক বৈদূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত স্ফটিক রজত চিত্র ঢাল॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হিরা।
সব গ্রিহে নামে সদা মুকুতার ঝারা॥
বসিবারে স্থানে সব কৈল রত্ন বেদি।
উর্চ্চ প্রসাদ পুষ্কর্ণি জল নিধি॥
নানা জাতি বৃক্ষগণ ফুল ফল সোভে।
ভ্রমএ ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে॥
ভানু বৃহদ্ভানু জেন পূর্ণচন্দ্র প্রভা।
ধরাধর অপূর্ব্ব করিল ময় সভা॥

পৃঃ ৪

মুদ্রিত গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তাহা হৈতে বিশেষে কর মহাভাগ॥
তাঁর যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হৈল ভুবন।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজেশ্বর॥

*　　*　　*

মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতি ভার॥

পৃঃ ৩৫৫

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

কৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্র জঙ্গ শ্রেষ্ঠ গণি।
তাহা হৈতে বিসেস করহ নৃপমণি॥
তার জঙ্গে আইল শপ্ত পৃথিবীর জন।
ত্রিভুবনের লোক তুমি কর নিমন্তর্ন॥
পূর্ব্বেতে নারদ ঋসি সভাতে কহিলা।
হরিশ্চন্দ্র রাজা রাজ-সুই যজ্ঞ কৈলা॥
সপ্তদিপ প্রেথুবিতে বৈসে জতজন।
তৃভুবনের লোক তুমি করহ নিমন্ত্রর্ণ॥
ইন্দ্র জম বোরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে স্বর্গপুরে॥
পাতালেতে নাগরাজ সেস বিসধর।
পৃথিবীতে বৈসে জত রাজ রাজেশ্বর॥

পৃঃ ২৬

*　　*　　*

মস্তক উপরে আমি ধরি এ সংসার।
আমি জাব যজ্ঞে খেতে কে ধরিব আর॥

পৃঃ ৩৩

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

কৃষ্ণ বৈল হরিশ্চন্দ্র জঙ্গ স্রেষ্ট গণি।
তাহা হৈতে বিসেশ করহ নৃপ মণি ॥
তার জঙ্গে আইল সপ্ত দ্বিপের রাজন।
ত্রিভুবনে রাজা তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্র জম কুবের বরুণ জত সুরে।
আর জত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ সেশ বিশধর।
পৃথিবীতে বৈসে জত রাজ রাজেশ্বর ॥

*　　*　　*

মস্তকোপর আমি ধরি এ সংসার।
আমি জাব জঙ্গে খেতি কে ধরিব ভার ॥

পৃঃ ৩৪

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

পূর্ব্বেতে নারদ ঋসি সভাতে কহিল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা রাজসূঈ যঙ্গ কৈল ॥
কৃষ্ণ বৈল হরিশ্চন্দ্র জঙ্গমধ্যে গণি।
তাহা হৈতে অধিক করহ নৃপমণি ॥
তার জঙ্গে আইল সপ্ত পৃথিবি রাজন।
ত্রিভুবন লোক তুমি করহ নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্র জম কুবের বরুণ আদি সুরে।
আর জত দেব লোক বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শ্রেষ্ঠ বিসধর।
পৃথিবিতে বৈসে জত রাজেশ্বর ॥

পৃঃ ২৬

*　　*　　*

মস্তক উপরে আমি ধরি এ সংসার।
আমি জঙ্গে কে ধরিব ক্ষৌতি ভার ॥

পৃঃ ৩৩

মুদ্রিত গ্রন্থ

ইহা শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব ॥
ভক্তি ভরে কৃষ্ণ নাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন ॥
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে নিয়া।
জুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্র বসাইয়া ॥
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল ॥

পৃঃ ৩৫৬

*　　*　　*

যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ॥
অহংকারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী অন্তরে কুপিল ॥

পৃঃ ৩৬০

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

এত সুনি ধনঞ্জয় তুলিল গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিল সিরে দেব সিব ॥
আরত ভঞ্জন নাম করিয়া স্মরণ।
গুরু দ্রোণাচার্য্য সিরে করিয়া বন্দন ॥
অদ্ভুত সম্ভ্রম অস্ত্র গুণ হৈতে লৈয়া।
জুড়িল গাণ্ডীবে ক্ষৌতি অস্ত্র বসাইয়া ॥
ধরেন ধরণি সেস শতন্ত্র করিল।
দেখিয়া জতেক নাগ অদ্ভুত মানিল।

পৃঃ ৩৩ক

*　　*　　*

জথায় দ্রোপদি ভদ্রা রতন আসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্য স্থানে ॥
অহংকারে দ্রৌপদিরে সম্ভাসনা কৈল।
দেখি পারষতি দেবি অন্তরে কুপিল ॥

পৃঃ ৩৬

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

এত সুনি ধনঞ্জয় লইল গাণ্ডীব।
করজোড়ে প্রণমিল শিবদাতা সিব॥
অতি ভক্তি কৃষ্ণ নাম করিআ স্মরণ।
গুরু দ্রোণাচার্য্য সিরে করিয়া বন্দন॥
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে লয়্যা।
ছাড়িল গাণ্ডীবে খেতি অস্ত্র বসাইআ্যা॥
ধরিল ধরণি শেশ শতস্ত্র করিল।
দেখিআ সকল নাগ অদ্ভুত মানিল॥

পৃঃ ৩৫ক

* * *

জথাএ দ্রোপদি ভদ্রা রত্নের আশনে।
হিড়ম্বা বসিল গীআ তার মধ্য স্থানে॥
অহংকারে দ্রোপদিরে শম্ভাস না কৈল।
দেখিআ দ্রোপদি দেবী অন্তরে কুপীল॥

পৃঃ ৩৮ক

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

এত বুনি ধনঞ্জয় লইল গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিল সিব দাতা সিব॥
পার্থ আগু কৃষ্ণ নাম করি স্মঙরণ।
গুরু দ্রোণাচার্য্য সিরে করিল বন্দন॥
অদ্ভুত তম্ভন অস্ত্র তোণ হৈতে লৈয়া।
যুড়িল গাণ্ডিব ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়া॥
ধরিল ধরণি সেশ স—ন পাইল।
দেখিয়া জতেক লোক অদ্ভুত মানিল॥

পৃঃ ৩৩

* * *

জথায় দ্রোপতি ভদ্রা রতন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্য স্থানে॥
অহংকারে দ্রোপদিরে সম্ভাস না কৈল।
দেখিয়া দ্রোপদ দেবি অন্তরে কোপিল॥

পৃঃ ৩৭ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ পায় যার যেই রীতি॥
কি আহার, কি আচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস, তোর না জানি কারণ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন॥
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
তুই ত' ভজিলি সেই ভ্রাতৃহন্তা জনে॥
সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন।
একে কুপ্রবৃত্তি তায় নাহিক বারণ॥
সন্ধানিয়া বেড়াস ভ্রমরী যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হৈয়া কুলবধূ॥
মানে মানে বোস গিয়া তোর যোগ্য স্থানে।
বসিবার যোগ্য তুই নহিস এখানে॥

পৃঃ ৩৬০

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকিতি।
আপনি প্রকাশ হয় জার জেবা জাতি॥
কিয়াচার কিবা তার কথায় সয়ন।
কথায় থাকিস তোর না জানি কারণ॥
পূর্ব্বে সুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
সহোদর ভাই ভিম করিল নিধন॥
ভাত্রি বৈরিজনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুর হইয়া তোঁ ভজিলি হেন জনে॥
সতস্ত্র ভ্রমিস তুঞি জথা তোর মন।
এতে কুপ্রকৃতি তাহে নাহিক বারণ॥
স্থানে স্থানে ভ্রমিস ভ্রমরে জেন মধু।
সভামধ্যে বসিলে হয়্যা কূল বধূ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না জাস উঠিয়া।
আপন সদ্রিস জঙ্গ স্থানে বসো গিয়া॥

পৃঃ ৩৬

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

উশা (?) বলে নহে দুর—লের প্রকৃতি।
আপনে প্রকাশ হয় তার জেই জাতি ॥
কি আর বিচার তোর কোথায় সদন।
কোথার থাকিস তুই না জানি কারণ ॥
পূর্ব্বে আমি শুনিআছি তোর বিবরণ।
তোর শহদর ভিম করিল নিধন ॥
ভ্রাত্রি বৈরি জনে কেহ না দেখি নয়নে।
কামাতুর হআ তারে ভজিলি কেমনে ॥
সতন্তরা ভ্রমিস জথায় তোর মন।
এ কুচরিত্ত তাহে নাহিক বারণ ॥
রাজ্যে রাজ্যে বেড়াস ভ্রমর জেন মধু।
এমন প্রকৃতি তোর নস কূলবধু ॥
মর্জ্যাদা থাকিতে কেন না জাস উঠিআ।
আপন সদৃশ জঙ্গ স্থানে বৈস গিআ ॥

পৃঃ ৩৮ক

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

কৃষ্ণা বলে নহে দুষ্ট খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাস হয় জার জেই জাতি ॥
কি আচার, কি আহার, কোথায় সয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ ॥
পূর্ব্বে সুনিঞাছি আমি তোর বিবরণ।
সহোদর ভাই ভিম করিল নিধন ॥
ভ্রাত্য বৈরজন কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুরা হৈআ তুঞি ভজিলি সেইজনে ॥
সতন্তরা ভ্রমিস তুমি জথা তোর মন।
একে সে কুপ্রকৃতি তাহে নাহি নিবারণ ॥
স্থানে স্থানে বেড়াস ভ্রমর জেন মধু।
সভা মধ্যে বসিলি হয়্যা কুল বধূ ॥
মর্জ্জাদা থাকিতে কেন না জাস উঠিয়া।
আপন সদ্রস জোগ্য স্থানে বৈস গিয়া ॥

পৃঃ ৩৬

মুদ্রিত গ্রন্থ

অকারণে পাঞ্চালী করিস অহংকার।
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥
কুরূপ কুৎসিৎ লোক নিন্দে ততক্ষণ।
যতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন ॥

*　　*　　*

আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তব বিবাহের আগে বিবাহ আমার ॥

*　　*　　*

পুনঃ পুনঃ যতেক কহিস পুত্র কথা।
পুত্রের করিস গর্ব্ব, খাও পুত্র মাথা ॥

পৃঃ ৩৬০।৩৬১

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

অকারণে পাঞ্চালি করিস অহংকারে।
পরনিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনারে ॥
কুরূপ জেমন লোক নিন্দে ততক্ষণ।
জতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন ॥

পৃঃ ৩৬ক

*　　*　　*

আমার সতিন তুঞি আমি নাই তোর।
কালি বিভা হৈল তোর অগ্রেতে মোহর ॥

পৃঃ ৩৭ক

*　　*　　*

পুন পুন জতেক কহিস পুত্র কথা।
পুত্রের করিস গর্ব্ব খায় পুত্রমাথা ॥

পৃঃ ৩৮ক

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

অকারণে পাঞ্চালি করিস অহংকার।
অন্যে নিন্দ নাই দেখ ছিদ্র আপনার॥
কুরূপ মনশ্য আইলে নিন্দে অনুক্ষণ।
জতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন॥
পৃঃ ৩৮ক

* * *

আমার পতির তুএ্রী নহে আমি তোর।
কালি বিভা হৈল তোব অগ্রেতে মোহর॥
পৃঃ ৩৯ক

* * *

পুনঃ ২ জতেক কহিশ পুত্র কথা।
পুত্রের করিস গর্ব্ব খায় পুত্র মাথা॥
পৃঃ ৩৯

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

অকারণে পঞ্চালি করিস অহংকার।
পরে নিন্দা কর না দেখ ছিদ্র আপনার॥
কুরূপ লোকেতে লোক জিনে ততক্ষণ।
জতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন॥

* * *

আমার স্বপতিন তুমি নহি আমি তোর।
কালি বিভা করিলেক অগ্রেতে মোর॥

* * *

পুনঃ পুনঃ কত কহিস পুত্রকথা।
পুত্রের করিস গর্ভ খায় তার মাথা॥
পৃঃ ৩৭ক।৩৭

মুদ্রিত গ্রন্থ

আমাব নির্দ্দোষ পুত্রে দিলে তুমি শাপ।
তুমিও পুত্রের শোকে পাবে মনস্তাপ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চপুত্র হৈবে নাশ॥
পৃঃ ৩৬১

* * *

দেবতা গন্ধর্ব্ব আব অপ্সর কিন্নর।
দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি রক্ষ খগবর॥
একজন বিনা আব যে ছিল যথায়।
কতদূবে পড়ি সবে হৈল নম্রকায॥
পৃঃ ৩৭২

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

নিদ্দোস পুত্রেরে মোর তুমি দিলে সাঁপ।
তুমিহ পুত্রেব সোকে পাবে মনস্তাপ॥
জুর্ধ করি মবে ক্ষেত্র তাহে সর্গবাস।
বিনি জুর্ধে তব পুত্র হইবেক নাস॥
পৃঃ ৩৮ক

* * *

দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ অপ্সর কিন্নর।
দেব ঋসি ব্রহ্ম ঋসি জক্ষ নববর॥
এত জন ছিল আর জে ছিল সভায়।
কথোদূরে পড়িল করিয়া নম্রকায়॥
পৃঃ ৪৯ক

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

বিনে দোসে মোর পুত্রে তোঞে দিলে সাপ।
তুমিহ পুত্রের সোকে পাবে বড় তাপ॥

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

নিন্দাসি মোহর পুত্র তুমি দিলে সাঁপ।
তুমিহ পুত্রের সোকে পাইবে সন্তাপ॥

যুদ্ধ করি মরে ক্ষেত্রি জায় সর্গবাস।
বিনি যুদ্ধে তোর পুত্র হইবে নাস ॥
পৃঃ ৩৯
* * *
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ অমর কিন্নর।
দেব ঋসি ব্রহ্ম ঋসি জক্ষ খগবর ॥
এক জন বিনা আর জে ছিল তথায়।
কথ দূরে জোড় করি পড়িল নম্রকায় ॥
পৃঃ ৫১ক

যুর্দ্ধ করি মরে ক্ষেত্র জায় স্বর্গবাস।
বিনি যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হইবে নাস ॥
পৃঃ ৩৭
* * *
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ অপহসার কিংকর।
দেব ঋসি ব্রহ্ম ঋসি যক্ষ খগবর ॥
এক জন বিনা আর জে ছিল তথায়।
কথো দূরে দেখিআ পড়িল নম্রকায় ॥
পৃঃ ৪৫

মুদ্রিত গ্রন্থ

বিশ্বরূপ প্রকাশেন দেব জনার্দ্দন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন ॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল ॥
বিবিধ আয়ুধে শোভে সহস্রেক কর।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধর ॥
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভিত হৃদয় ॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম আর শার্ঙ্গধনু।
নানা বর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু ॥
পৃঃ ৩৭৩

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

বিস্বম্ভর নিজমূর্ত্তি ধরিলা চক্রপাণি।
জে রূপ দেখিয়া মোহ হইল পদ্ম — ॥
সহস্র মস্তক শোভা সহস্র বদন।
সহস্র মুকুটমণি কিরিট ভূসণ ॥
সহস্র শবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি করে ঝলমল ॥
বিবিধ আউদ সোভে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে সোভে কত সোসধরে ॥
সহস্র সহস্র জেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুবমণি সোভিত হৃদয় ॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পিতাম্বর তনু মেঘ উদয় চঞ্চলা ॥
সঙ্খ চক্র গদাপদ্ম সারেঙ্গাদি ধনু।
নানা বর্ণে রবি ভূসিত মহাধনে তনু ॥
পৃঃ ৪৯

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

বিস্মম্ভর মূর্ত্তি ধরিলা চক্রপাণি।
জেরূপ দেখিআ মোহ হইলা পদ্মজোনি ॥
সহস্র মস্তক সোভা সহস্র লোচন।
সহস্র কিরিটি মণি মুকুট ভূসন ॥

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

বিস্বম্ভর নিজমূর্ত্তি ধরে চক্রপাণি।
জেরূপ দেখিআ মোহ হইল পদ্মজোনি ॥
সহস্র মস্তক সোভে সহস্র বদন।
সহস্র মুকুটমণি কিরিট ভূষণ ॥

সহস্র শ্রবণে সোভে সহস্র কুন্তল।
সহস্র নয়নে বরিসএ সহস্র মণ্ডল ॥
বিবিধ আউধ সোভে সহস্রেক করে।
সহস্র শ্রবণে শোভে কত সশোধরে ॥
সহস্র সহস্র জেন সূর্জ্জের উদয়।
শ্রিবৎস কৌস্তুভ মণি সোভিত রিদয় ॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পিতাম্বর তনু মেঘে উদয় চপলা ॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারেঙ্গাদি ধনু।
নানা বর্ণে মহাধনে বিভূসিত তনু ॥
পৃঃ ৫১

সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুন্তল।
সহস্র জনে বন্দিল সহস্র মণ্ডল ॥
বিবিধ আউধ সোভে সহস্র করে।
সহস্র চরণে সোভে কত সসোধরে ॥
সহস্র সহস্র জেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি সোভিত হৃদয় ॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর তনু মেঘ উদয় চঞ্চলা ॥
সঙ্খ চক্র গদাপদ্ম সারঙ্গাদি ধনু।
নানা বর্ণে মহারত্নে বিভূসিত তনু ॥
পৃঃ ৪৫

মুদ্রিত গ্রন্থ

সহস্র সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে।
শতশত মুখে তারা স্তুতি বানী পড়ে ॥
সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র অংশু করে প্রণিপাত ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ।
চকিত হৈয়া সবে হৈল অচেতন ॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষে চাহিয়া মুদিলেক অষ্ট আঁখি ॥
পৃঃ ৩৭৩

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

সয়স্র সয়স্র সম্ভু আসে করযুড়ি।
কতমুখে কত স্তুতি করে বাক্য পড়ি ॥
সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র যংসু করে প্রণিপাত ॥
বিস্বরূপ বিস্বপতি দেখি দেবগণ।
চকিত হয়া সভে হইল অচেতন ॥
অন্তরিক্ষে থাকিয়া রাজা বিস্বরূপ দেখি।
নিমেস চাহিয়া বুঝিলেন অস্ত আঁখি ॥
পৃঃ ৪৯

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

সহস্র সয়ম্ভু সম্ভু আছে কর যোড়ে।
কতমুখে তার স্তুতি স্তবন যে পড়ে ॥
সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিআ হাত।
সহস্র সহস্র অংশু করে প্রণিপাত ॥
বিস্বরূপ বিস্বপতি দেখিআ নঅনে।
চকিতে চাহিআ সভে হইল অচেতনে ॥
অন্তরিক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিখে চাহিআ বুজিলেক অষ্ট আঁখি ॥
পৃঃ ৫১

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

সহস্র সয়ম্ভু সম্ভু আছে কর জোড়ে।
কত কত মুখে তার অমিআ ঝরি পড়ে ॥
সহস্র সহস্র চক্ষু বহে দৃষ্টিপদ।
সহস্র সহস্র শির করে দন্তবত ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেবগণ।
চকিত চাহিআ সভে হইল অচেতন ॥
অন্তরিক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমেসে চাহিয়া বুজিল অষ্ট আঁখি ॥
পৃঃ ৪৬ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

কর যোড় করি বলে দেব ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান ॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ জুড়ি ॥
তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপদক্ষ আদি যত জন ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।

*　　*　　*

প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ ॥

পৃঃ ৩৭৩

*　　*　　*

তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥

পৃঃ ৩৭৪

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

কর যোড় করিয়া বলেন ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজা কর অবধান ॥
কমণ্ডলু জপমালা জায় গড়াগড়ি।
পড়ি আছে চতুর্ম্মুখ অষ্টকর যুড়ি ॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কস্যপ দেখ আদি জত জন ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগীময় বেস।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেস ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাতে।
তব গুণে প্রণময়ে ধর্ম্ম তব তাতে ॥

পৃঃ ৪৮ক

*　　*　　*

ভক্ত তুল্য প্রিয় মোর নাহিক ভুবনে।
আমিহ প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥

পৃঃ ৪৯ক

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

কর যোড় করিআ বলেন ভগবান।
পূর্ব্ব ভিতে মহারাজা কর অবধান ॥
কুমণ্ডল জপমালা জায় গড়াগড়ি।
পড়িআ আছে অষ্টমুখ অষ্টকর যুড়ি ॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি জত জন ॥
তাহার দক্ষীণে দেখ জোগময় বেস।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেস ॥
কার্ত্তিক গণেস দেখ তাহার পশ্চাত।
তব গুণে নমস্করে ধর্ম্ম তব তাত ॥

পৃঃ ৫১

*　　*　　*

ভক্ত তুল্য পৃঅ মোর নাহিক ভুবনে।
আমিহ প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥

পৃঃ ৫৩ক

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

কর যোড় করিয়া বলেন ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান ॥
কমণ্ডুল জপমালা জায় গড়াগড়ি।
পড়িআছে চতুর্ম্মুখ অষ্টকর যুড়ি ॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি জত জন ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ জোগময় বেস।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেস ॥
কার্ত্তিক গণেস দেখ তাহার পশ্চাত।
তব গুণে তোমারে প্রণমে তব তাত ॥

পৃঃ ৪৬ক

*　　*　　*

ভক্ত তুল্য প্রিয় মোর নাহি অন্যজন।
আমিহ প্রণাম করি ভক্তের চরণ ॥

পৃঃ ৪৭ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হৈয়া কম্পিত শরীর ॥
নয়ন যুগলে পড়ে চারিধারা নীর।
মুহুর্মুহুঃ অচেতন হয় কুরু বীর ॥
ধৈর্য্য ধরি বলে রাজা গদগদ বচন।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
তড়িত জড়িত পীত কৌষেয় বসন।
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বপু কৌস্তুভ ভূষণ ॥
শ্রবনে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীকপাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোক নাথ ॥
পৃঃ ৩৭৪

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

নাই।

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

কৃষ্ণের বচন সুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভএতে আকুল হৈল কম্পীত শ্বরীর ॥
নয়ন যুগল বহে চাবিধারা নির।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরু বির ॥
ভিত হআ বলে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
তোমার চরণে প্রভু মোর মনস্কাম।
অবধানে মোর নিবেদন ঘনশ্যাম ॥
তড়িত জড়িত পিতক সামল সাজে ॥
শ্রিবৎস কৌস্তুভ সোভিত অঙ্গ মাঝে ॥
শ্রবণে পরসে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্ব ভুতনাথ ॥
পৃঃ ৫২

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

নাই।

মুদ্রিত গ্রন্থ

সংসারে আছেন যত পুণ্যবানজন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
সে সব ভক্তের পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্খায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি ॥

পৃঃ ৩৭৪

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

নাই।

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

সংসারএ আছএ জত পুণ্যবান জন।
সদত বন্দএ প্রভু তোমার চরণ ॥
তাহা সব সহপদ বন্দিবারে আসা।
আকাঙ্খায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
জদি দিবে দেহ এই কৈল নিবেদন।
অনুব্র বন্দী এই তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য জেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিসম মায়া কিবা সক্তি বুঝি ॥

পৃঃ ৫২

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

নাই।

মুদ্রিত গ্রন্থ

দ্রৌপদীর দিকে চাহি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী কর রাজাজ্ঞা পালন ॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধন ভজ এবে ত্যজ যুধিষ্ঠিরে ॥
দুষ্টবুদ্ধি দুঃশাসনে দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদনা আর বিকৃত আকৃতি ॥

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকে বলে দুশ্বাসন।
চলহ দ্রৌপদি আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাসায় তোমার শ্বামি হারিলেক তোরে ॥
দুর্জ্যোধনে ভজ ইবে তেজি যুধিষ্টিরে ॥
দুশ্বাসন দুষ্ট চিত্ত দেখি গুণবতি।
ক্রোধে বচন দেখি বিকৃতী মুরতি ॥

ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছু গোড়াইল ॥
গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনেরে চাহিয়া ॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥

পৃঃ ৪০১

ভয়েতে দেবির অঙ্গ কাঁপে থরথর।
সিঘ্র গতি উঠি গেলা ঘরের ভিভর ॥
স্ত্রিগণের মধ্যে দেবি ভএ লুকাইল।
দেখি দুস্বাসন ক্রোধে পাছু গড়াইল ॥
গৃহদ্বারে কুন্তী দেবি ভুজ পসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুস্বাসনে রহাইয়া ॥
কহ দুস্বাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদি ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥

পৃঃ ৭৬

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

দ্রৌপদি চাহিআ বলে দুষ্ট দুস্বাসন।
চলহ দ্রৌপদি আঙ্গা করিল রাজন ॥
পাসাএ তোমার স্বামি হারিল তোমারে।
দুর্জ্জোধন ভজ হবে তেজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুঃস্বাসন দুষ্টচিত্ত দেখিআ পার্সতি।
সক্রোধ বচন সুনি বিকৃত মুরৃতি ॥
ভএতে দেবির অঙ্গ কাঁপে থরথর ॥
সিঘ্র গতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রিগণের মধ্যে দেবি ভএ লুকাইল।
দেখি দুস্বাশন তবে — উঠিল ॥
গৃহ দ্বারে কুন্তী দেবি ভুজ প্রসারিআ।
বিনয় বলেন দুস্বাসনে রহাইআ ॥
কহ দুস্বাসন এই এ কোন বিহিত।
দ্রৌপদি ধরিতে চাহ এ কোন চরিত ॥

পৃঃ ৭৭

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

দ্রৌপদি চাহিয়া তবে বলে দুস্বাসন।
চলহ দ্রোপদি আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাশায় তোহর স্বামি হারেন তোহোরে।
দুর্জোধন ভজ হবে তেজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুস্বাসন দুষ্ট চির্ত্ত দেখিয়া পার্ষতি।
সক্রোধ বচন দেখি বিক্রিত মৃরতি ॥
ভএতে দেখি যে অঙ্গ কাঁপে থরথর।
সিঘ্র গতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রিগণের মধ্যে দেবি ভএ লুকাইল।
দেখি দুস্বাসন ক্রোধে পাছু দৌড়াইল ॥
গ্রিহদ্বারে কুন্তি দেবি বাহু পসারিয়া।
সবিনএ বলে দুস্বাসনে রহইয়া ॥
কহ দুস্বাসন এই কেমত বিহিত।
দ্রৌপদি ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥

পৃঃ ৭০ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

কুলবধূ লৈয়া যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের কলংক ভয় নাহিক তোমার ॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

কুল বধু লয়্যা জাবে সভার ভিতর।
এ কুলে কলংক ভয় নাহিক তোমার ॥
সুনি দুস্বাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে ভোজপুত্রি পেলিল ঠেলিয়া ॥

অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেন দ্রৌপদীর চুলে ॥
যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয় ॥
তাহা ধরি দুঃশাসন আনে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দহে যত পুরের যুবতি ॥
পৃঃ ৪০১

অচেতন হয়্যা দেবি পড়ি ভূমিতলে।
দুঃস্বাসন ধরিলেক দ্রৌপদির চুলে ॥
পুর হইতে বাহির করিল সিঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দএ জত পুরের যুবতি ॥
কেসে ধরি নিল কৃষ্ণা পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কিনা লাগে ॥
নাগিনি বিকল জেন গরুড়ের মুখে।
ছটপট করে দেবি ছাড় ছাড় ডাকে ॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়ানে।
রজস্বলা আমি আর এই তব সনে ॥
পৃঃ ৭৬

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

কুল বধু লআ জাবে সভার ভিতরে।
কুলের কলংক ভয় নাহিক তোমারে ॥
শুনি দুস্বাসন তবে উঠিল গজ্জিআ।
দুই ভুজে ভোজপুত্রি পেলিল ঠেলিআ ॥
অচেতন হআ দেবি পড়িলা ভূতলে।
দুস্বাসন ধরিলেক দ্রৌপদির চুলে ॥
* * *
জেই কেস রাজসূই জঙ্গের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাসয় ॥
পুর হৈতে বাহির হৈলা সিঘ্রগতি।
দেখিআ কান্দএ জত পুরের যুবতি ॥
কেসে ধরি লৈল কৃষ্ণা পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে বা না লাগে ॥
নাগিণি বিকল জেন গরুড়ের মুখে।
ছটপট করে দেবি ছাড় ছাড় ডাকে ॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজস্বলা আছি আর — পিন্ধনে ॥
পৃঃ ৭৭।৭৮ক

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৫

কুল বধু লয়্যা জাবে সভার ভিতরে।
কুলের কলংক ভয় নাহিক তোমারে ॥
সুনি দুস্বাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে ভোজ পুত্রি পেলিল ঠেলিয়া ॥
অচেতন হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতলে।
দুস্বাসন ধরিলেক দ্রোপদির চুলে ॥
জেই কেস রাজসূয় জঙ্গের সময়।
মন্ত্র জলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাসয় ॥
পুরী হইতে বাহির হইল দুষ্টমতি।
দেখিয়া কান্দএ জত পুরের যুবতি ॥
কেস ধরি লইয়া কৃষ্ণা পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে বা না লাগে ॥
নাগিনি বিকল জেন গরুড়ের মুখে।
ছটপট হএ দেবি ছাড় ছাড় ডাকে ॥
আরে ম্লেচ্ছমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজস্বলা আমি আর একই বসনে ॥
পৃঃ ৭০

মুদ্রিত গ্রন্থ

ওহে মহারাজ ! কভু দেখেছ নয়নে ।
আপন ভার্য্যারে হারে বল কোন জনে ॥
কপটে জুয়ারি করিয়াছে বহুজন ।
তা সবার বশীভূত থাকে নারীগণ ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন ॥
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক ।
ইঁহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক ॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার ।
যাহা ইচ্ছা কর নাহি অন্যথা তাহার ॥
এই যে হৃদয়ে তাপ সংবরিতে নারি ।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী ॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে ।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীনজনে ॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ ।
ক্ষুদ্র লোক কহে কথা নাহি কিছু বোধ ॥
পৃঃ ৪০৩

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি ।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

ওহে মহারাজা কভু দেখেছ নয়নে ।
আপনার ভার্জ্যা হারিআছে কোনজনে ॥
কপট যুয়ায় হইআছে বহুজন ।
তা সভার থাকে জদি বেস্যা নারিগণ ॥
যে সব নারিরে তারা নাহি করে পণ ।
তুমি মহারাজা ! তুমি করিলে এমন ॥
রাজ্য দেস ধনজন জতেক হারিলে ।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ নাহি মোর তিলে ।
আমা সহ সকলে তোমার অধিকার ।
জাহা ইৎসা কর নারি অন্য করিবার ॥
এই যে রিদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি ।
পাসায় করিলে পণ কৃষ্ণা হেন নারি ॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে ।
দ্রোপদিরে পরিহাস করে হিন জনে ॥
এই হেতু তোমারে জমিছে বড় ক্রোধে ।
খুদ্র লোকে এত করে তোমার প্রসাদে ॥
পৃঃ ৭৮

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি ।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

ওহে মহারাজ ! কভু দেখ্যাছ নয়নে ।
আপনার ভার্জ্যাকে হার্য্যাছে কোন জনে ॥
কপট পাসাএ হারিআছে বহুজন ।
তা সভার থাকে বেওস্যা নারিগণ ॥
যে সব নারিরে তারা নাহি করে পণ ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলে জেমন ॥
রাজ্য দেস ধন জন সকল হারিলে ।
ইহাতে আমার ক্রোধ নাহি এক তিলে ॥

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি ।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

ওহে মহারাজ, কভু দেখিআছ নয়ানে ।
আপন ভার্য্যা হারিয়াছে কোন খানে ॥
কপটি যুয়ারি হইআছে বহুজন ।
তা সভার আছে বস্যা সম নারিগণ ॥
সে সব নারিরে তারা নাহি করে পণ ।
তুমি মহারাজা কর্ম্ম করিলে জেমন ॥
রায্র্য্যা দেস ধন জন জতেক হারিলে ।
তাহাতে তোমাকে মোর ক্রোধ নাহি তিলে ॥

আমা সভা সকলেতে তোমার অধিকার।
জাহা ইংসা কর নাহি অন্য করিবার ॥
এই সে রিদএ তাপ সম্বরিতে নারি।
পৃঃ ৭৯ক
পাসাএ করিলে পণ কৃষ্ণা এ সুন্দরি ॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদিরে পরিহাস করে হিনজনে ॥
এই হেতু তোমার হইল বড় ক্রোধে।
ক্ষুদ্র লোকে করে এত তোমার প্রসাদে ॥
পৃঃ ৭৯

আমা আদি তোমার সকল অধিকার।
জাহা ইর্ষা কর নারি অন্য করিবারে ॥
এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি।
পাসা করএ পণ কৃষ্ণা হেন নারি ॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রোপদিরে উপহাস্য করে হিন জনে ॥
এই হেতু তোমারে জন্মিছে বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোকে করে এত তোমার প্রসাদে ॥
পৃঃ ৭২ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

ভীম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
শত্রু বাক্য সহিতে না পারি অনিবার ॥
হীন জন বাক্য মম নাহি সহে আর।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুইভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥
পৃঃ ৪০৩

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

ভিম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হিনজন দুরাক্ষর নারি সহিবার ॥
ইহা বিনু অন্য চির্ত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া পেলাব আপনার ॥
ক্ষুদ্রজন লঘু এত দেখিয়া নয়ানে।
এ ভুজ রাখিব আমি কোন প্রয়োজনে ॥
জাহ সহদেব সিঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ পেলাব কাটিয়া ॥
পৃঃ ৭৯

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

ভিম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হিনজন লঘু আর নাহি সহিবার ॥
ইহা বিনে অন্য চির্ত্ত নাহিক আমার।
দুইভুজ কাটিআ পেলাব আপনার ॥
খুদ্র জন লঘু এত দেখিআ নয়নে।
এ ভুজ রাখিব, আর কোন প্রঅজনে ॥
জাহ সহদেব সিঘ্র অগ্নি আন গিআ।
অগ্নি মধ্যে দুই ভুজ পেলিব কাটিআ ॥
পৃঃ ৭৯

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

ভিম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হিন জন — ক্রোধ নাহি সহিবার ॥
ইহা বিনু চিত্তে নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া পেলিব আপনার ॥
ক্ষুদ্রজন লঘু এত দেখিব নয়নে।
এ ভুজ রাখিব আর কোন প্রয়োজনে ॥
জাহ সিঘ্র সহদেব অগ্নি আন গীয়া।
অগ্নিমধ্যে দুইভুজ পেলিব কাটিয়া ॥
পৃঃ ৭২ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
হেথায় সভার মাঝে ইথে নিবারিতে লাজে
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ॥
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি সংহার করিতে ঋষ্টি
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণছায়া স্মরিয়া সঁপিনু কায়া
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষদন্তী খরক্রোধে ভুজঙ্গ দন্তীর পদে
সেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণযুগে দ্রৌপদী শরণ মাগে
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
পৃঃ ৪০৫

১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ১৫৭৫

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
অখিলের আরত ভঞ্জন।
আসিয়া সভার মাঝ ইথে নিবারিহ লাজ
তোমাবিনা নাহি অন্য জন ॥
জে প্রভু পালন সৃষ্টি সংহার করিতে সৃষ্টি
পুনঃ পুনঃ হয় অবতার।
তাহার *· ·· ····* স্বরণ মোহর কায়া
অনাথের কর প্রতিকার ॥
বিস অগ্নি খর দন্তে ভুজঙ্গ দন্তির দন্তে
জে প্রভু রাখিলে প্রসাদে।
তাহার চরণ যুগে দ্রৌপদি স্বরণ মাগে
রক্ষা প্রভু বিসম প্রমাদে ॥
পৃঃ ৮১

---

* পুঁথির এই অংশ কীটদষ্ট।

১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ১৭৪৮

অহে প্রভু কৃপা সিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
অখিলের আরত ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝে ইথে নিবারহ লাজে
তোমা বিনু নাহি অন্যজন॥
যে প্রভু পালন শ্রীষ্টী সংসার করিতে সৃষ্টি
পুন পুন হয় অবতার।
তাহার চরণ ছাআ সরণ আমার কায়া
অনাথের কর প্রতিকার॥
বিস অগ্নি খর দন্তে ভুজঙ্গী দন্তীর দন্তে
জেই প্রভু রাখিল প্রসাদে।
তাহার চরণ যুগে দ্রৌপদি স্মরণ মাগে।
বক্ষা কর বিসম প্রসাদে॥

পৃঃ ৮১

১১৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭২

অহে প্রভু ক্রপাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
অখিলের আরত ভঞ্জন।
এ পূর্ণ সভার মাঝে ইথে নিবারহ লাজে
তোমা বিনে নাহি আন জন॥
হে প্রভু পালন স্রষ্টী সংহার করিতে স্রষ্টী
পুনঃ হয় অবতার।
তাহার চরণ ছায়া সরণ মোহর কায়া
অনাথিনী রাখ এই বার॥
বিস অগ্নি খুরদন্তে ভুজঙ্গ দন্তীর দন্তে
জেই পুত্র রাখেন প্রসাদে।
তাহার চরণ যুগে দ্রোপদি সরণ মাগে
রক্ষা কর বিসম প্রসাদে॥

পৃঃ ৭৪ক

বন পর্ব

মুদ্রিত গ্রন্থ

অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভিকমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অঙিঘ্র গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনি গণে কয়॥

*　　*　　*

অনাথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের ধন।
সে কারণে তব পাশে করি নিবেদন॥
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু কর অবধান॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তব প্রিয় সখি আমি অর্জ্জুন ভামিনী॥
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্বাক্য কহিল যত কহনে না যায়॥

পৃঃ ৪৩৯।৪৪০

১০৩৭ সালের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩
খণ্ডিত পত্রসংখ্যা ১-২১০, ২১২

আসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে সৃষ্টি সিজিয়াছ তুমি॥
আকাস তোমার সির পাতাল চরণ।
প্রিথিবি তোমার কটী আউ গিরিগণ॥
সিব আদি যত জোগি তোমারে ধেয়ায়।
তপস্যা করিয়া তপ সমপ্পে তোমায়॥
স্রিষ্টী স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সভার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়॥

*　　*　　*

অনাথের নাথ তুমি দুর্ব্বিত দলন।
তে কারণে তোমারে করি যে নিবেদন॥
সুখ দুঃখ সভার কহিতে তুমি স্থান।
মোর দুঃখ কহি কিছু কর অবধান॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা মঞি দ্রোপদ নন্দিনী।
তব প্রিয় সখি বলি বলহ আপুনি॥
হেন জনে কেসে ধরি লইল সভায়।
জতেক কহিল দেব কহনে না জায়॥

পৃঃ ১৪।১৫ক

১১১২ সালের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

(আদি, সভা, বন পর্বের কতক অংশ রচনা করিয়া কবি কাশীরাম দেহত্যাগ করেন, পুঁথির শেষে এইরূপ লেখা আছে)
"অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
…　　…　　..

১২০৮ সালের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬
পত্র সংখ্যা ৪, ৯৬ খণ্ডিত।

অসিত দেবল মুখে যুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে ছিষ্টী স্রীজিলা আপুনি॥
আকাস তোমার সির পাতাল চরণ।
প্রীথিবি তোমার কটী আস্তিগিরিগণ॥
সিব আদি জত জোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্যা করয়ে তপ সমর্পে তোমায়॥

সভার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয় ॥"
(এই অংশ নাই ।)

... ...

... ...

তব প্রিয় সখি বলি সর্ব্বলোকে বলে ।
তোমারে পাণ্ডবগণ জানে খেতি তলে ॥
হেন জনে চুলে ধরি লইল সভায় ।
বহু — দিল মোরে কহনে না যায় ॥

পৃঃ ১৩ক

ছিস্টী স্তিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয় ।
সভার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয় ॥

অনাথের নাথ তুমি দুর্গতি দলন ।
তেকারণে তোমায় করিয়ে নিবেদন ॥
সুখ দুঃখ কহিতে সভার তুমি স্থান ।
মোর দুঃখ কহি কিছু কর অবধান ॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রোপদ নন্দিনি ।
তব প্রিও সখি বলি বলহ আপুনি ॥
হেন জনে চুলে ধরি নিলেক সভায় ।
জতেক কবিল দেব কহনে না জায় ॥

পৃঃ ৯ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

এতেকবলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চেস্বরে ।
বারিধারা নয়ানেতে অবিরাম ঝরে ॥
পুনঃ গদ গদ বাক্যে বলয়ে পার্ষতি ।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি ॥

* * *

যেই মত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন ।
এই মত কান্দিবেক সে সবার স্ত্রীগণ ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি ।
না করিলে বাসুদেব বৃথা নাম ধরি ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিলা জলে ভাসে ।
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে ॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন ।
দিন কত কল্যাণী গো থাকহ সাবধান ॥

পৃঃ ৪৪০

১০৩৭ সালের পুঁথি ।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চেস্বরে ।
বারিধারা নয়ানেতে অশ্রুজল ঝরে ॥
পুন গদ গদ বাক্য বলয়ে পারসতি ।
নাহি মোর তাত ভ্রাত নাহি মো পতি ॥
তুমি যে অনাথ নাথ বলে সব্বজনে ।
তুমিহ নাহিখ মোর জানিল এখনে ॥
থাকিলে কি হব নাথ কথনের তরে ।
এতেক দুর্গতি মোর সর্ব্বলোকে করে ॥
চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমারে স্মরণ ।
সম্বন্ধে গোরবে সক্য আর প্রভু পণ ॥

* * *

জেন মত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন ।
এইমত কান্দিবেক তাহার স্ত্রীগণ ॥
তোমার সবদ আমি কহি সত্য করি ।
না করিলে বের্থ বাসুদেব নাম ধরি ॥
আকাস ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথিবী জলে ভাসে ।
আনল সিতল হয় সপ্তসিন্ধু সোসে ॥
তথাপি মোরে বাক্য না হইব আন ।
কথোদি কল্যাণি করহ সমাধান ॥

পৃঃ ১৬ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অশ্রুজল পড়ে॥
পুন পুন গদগদ বলেন পার্শতি।
নাহি মোর তাত মাত নাহি মোর পতি॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
তুমিহ নাহিক মোর জানিল এখনে॥
তুমি হেন কর্তা জার সংসার ভিতরে।
এতেক দুর্গতির তার খুদ্রলোকে করে॥
চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে।
সম্বন্ধে গৌরবে সখ্যে আর প্রভুপণে॥
গোবিন্দ বলেন দেবী না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মোর স্থির নহে মন॥
জখনে বিবস্ত্র তোমা করে দুশ্বাসন।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ডাকিলে তখন॥
তোমার সপদে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে জগন্নাথ ব্যর্থ নাম ধরি॥
তুমি যেইমন কান্দ দ্রোপদি সুন্দরি।
এইমত কান্দিবেক কৌরবের নারি॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথি জলে ভাশে।
অনল সিতল হএ সপ্ত সিন্ধু শোশে॥
তথাপিহ মোর বাক্য না হবে আন।
কক্ষোদিনে কল্যাণী করহ সমাধান॥

পৃঃ ১৪ক

১২০৮ সালের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চস্বরে।
চারিধারা নয়ানেতে অশ্রুজল ঝরে॥
পুনঃ পুনঃ গদগদ বলায় পার্শ্মতি।
নাহি তাত নাহি ভ্রাত নাহি মোর পতি॥
তুমি জে অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজন।
তুমিহ নাহিক নাথ জানিল এখন॥
থাকিলে কি হয় নাথ কখনের তরে।
এতেক দুর্গতি মোর খুদ্রলোকে করে॥
চারি — তুমি নাথ আমার রক্ষণে।
সম্বন্ধে গৌরবে পক্ষে আর প্রভুপণে॥
গোবিন্দ বলিল দেবি না কর ক্রন্দন।
তোমার বিকলে মোর স্থির নহে মন॥
জখন বিবস্ত্র তোমায় করে দুস্বাসন।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ডাকিলে তখন॥
অঙ্গেতে হয়েছে মোর সেই মহাঘাত।
জাবত কপট দুষ্ট না হয় নিপাত॥
জেইমত কৃষ্ণা তুমি করহ রোদন।
সেইমত কান্দিবেক তার স্ত্রিগণ॥
তোমার সর্বদ আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা বাষুদেব নাম ধরি॥
আকাষ ভাঙ্গিয়া পড়ে প্রথিবি জলে ভাষে।
আনল শীতল হয় সপ্তসিন্ধু সোসে॥
তথাপী আমার বাক্য নহিবেক আন।
কতদিন কণ্যানি করহ সমাধান॥

পৃঃ ৯

মুদ্রিত গ্রন্থ

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার যথাশাস্ত্র নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥

১০৩৭ সালের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

দ্রোপদির বাক্য সুনি ধর্ম্ম নরোপতি।
কহিতে লাগিল তবে ধর্ম্ম শাস্ত্র নিতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষে সুনহে ক্রোধ জত দোস ধরে॥

গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কাজ আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অঙ্গে অস্ত্র মারি॥
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
আক্রোধ যে জন তারে সর্ব্বলোক পূজে॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ. ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়॥

পৃঃ ৪৭৫

গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অকথ্য কথন লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কাজ আত্মা হয় বৈরি।
বিস খায় ডুবে মরে অগ্রে আত্মা মারি॥
তে কারণ বুধজন ক্রোধ সদা তেজে।
অক্রোধে লোকেরে দেবি সর্ব্বলোকে পূজে॥

পৃঃ ২৬ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

দ্রৌপদির বাক্য সুনি ধর্ম্মনরপতি।
কহিতে লাগিল রাজা শাস্ত্র নিতি॥
ক্রোধ মহাপাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যাক্ষ সুনহ ক্রোধ যত দোশ ধরে॥
লঘু গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অকথা নিকথা লোক ক্রোধ কালে বলে॥
আছুক অন্যের কাজ নিজ আত্মা বৈরি।
বিস খায় ডুবে মরে আত্মঘাতি করি॥
তে কারণে সাধুজন সদা ক্রোধ তেজে।
অক্রোধি জনেতে দেবি সদা লোক পূজে॥

পৃঃ ২৩ক

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

দ্রোপদির বাক্য বুনি ধর্ম্মনরপতি।
কহিতে লাগিল রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র নিতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যাক্ষ বুনহে ক্রোধ জত দোষ ধরে॥
গুরু লঘু ঙ্গান নাহি থাকে ক্রোধাজনে।
অপ্রমিত কথা দেখ ক্রোধা জনে বলে॥
আচুক অনের‍্য কাজ আত্মা হয় বৈরি।
বিস খায় জলে ডুবে মরে ক্রোধ করি॥
তে কারণে সাধুজন সদা ক্রোধ তেজে।
অক্রোধিজনেরে দেবি সর্ব্বলোকে পূজে॥

পৃঃ ১৪

মুদ্রিত গ্রন্থ

অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে॥
দোষ মত দণ্ড দিব শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যেই সদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
বারেক করিবে ক্ষমা মূর্খজন প্রতি॥
নির্ব্বোধ অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥

পৃঃ ৪৭৪

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

জখন জে করিয়ে ক্ষমা সুনহ রাজন।
পণ্ডিত না হয় দোস করে মূর্খজন॥
নির্বুদ্ধি অজ্ঞাতে ক্ষেমা করি একবার।
দুইবার দোস কৈলে দণ্ড দিয়ে তার॥
বুদ্ধি পূর্ব্বে জে করে না ক্ষেমি কদাচন।
কত দোস তোমার না কৈল দুর্জোধন॥

পৃঃ ২৫

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

জখন করএ ক্ষেমা বুনহে রাজন।
পণ্ডিত না হএ দোস করে মূর্খজন ॥
নির্ব্বদ্ধি অজ্ঞাত ক্ষেমা করে একবার।
দুইবার দোস কৈলে দণ্ড দিব তার ॥
নির্দ্দোসি যে করিবেক ক্ষেমা আচরণ।
কত দোশ তোমার না কৈল দুর্জোধন ॥

পৃঃ ২২

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

জখন করিয়ে ক্ষেমা বুনহে রাজন।
পণ্ডিত না করে দোস করে মূর্খজন ॥
নির্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষেমা করি একবার।
দুইবার দোস কৈলে দণ্ড দিব তার ॥
বুদ্ধি মন্তে করিলে না ক্ষেমি কদাচন।
কত দোস করিল পামর দুর্জোধন ॥

পৃঃ ১৪

মুদ্রিত গ্রন্থ

সুসজ্জ করিল সবে যার যে বাহন।
তূণ হৈতে লন তুলি দিব্য অস্ত্রগণ ॥
আড়া ভাঙ্গি তূণ মধ্যে রাখে পুনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টংকার ॥
কবচে আবৃত তনু নানা অস্ত্র পেঁচি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ কৈল সব্যসাচী ॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবন নন্দন।
তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর বচন ॥

পৃঃ ৫৬৯

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

সুসয্যা করিল সভে জে জার বাহীনি।
গুণ হইতে অস্ত্র বারি করিল ফাল্গুনি ॥
আড় ভাঙ্গি তুণেতে রাখিল পূনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেক টংকার ॥
কবচে আবরি তনু নানা অস্ত্র কাটি।
দেব দৈত্য সঙ্খ নাদ কৈল সর্ব্বসাচি ॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবন নন্দন।
হেন কালে কহে ধর্ম্ম মধুর বচন ॥

পৃঃ ১২৩

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

সুসজ্জ করিলখ সভে যে জাহার বাহন।
তুণে হইতে বাহির করিল অস্ত্র গণ ॥
আড় ভাঙ্গি তূণেতে রাখিল আরবার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেক টংকার ॥
কবচে আবরি তনু নানা অস্ত্র কাটি।
দেবদত্ত সঙ্খনাদ কৈল সব্যসাজি ॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবন নন্দন।
হেন কালে কহে ধর্ম্ম মধুর বচন ॥

পৃঃ ১০৭ক

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

বুসজ্জ করিল সভে জে জার বাহন।
তুণে হইতে বাহির করিল অস্ত্রগণ ॥
আড় ভাঙ্গি তুণেতে রাখিল আরবার।
ধনুকেতে গুণ দিয়ে দিলেক টংকার ॥
কবচে আরপী তনু নানা অস্ত্র কাটি।
দেবদর্ত্ত সঙ্খনাদ কৈল সব্যসাচি ॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবন নন্দন।
হেন কালে কহে ধর্ম্ম মধুর বচন ॥

পৃঃ ৬২

মুদ্রিত গ্রন্থ	১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩
ওরে দুষ্ট ! এত কর কার অহংকার ।	ওরে দুষ্ট করিস কাহার অহংকার।
কি ছার গন্ধর্ব্ব তোর কিবা গর্ব্ব তার ॥	কোন ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ত্ত তার ॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।	জে কথা কহিলে তুমি আসি মোর কাছে।
এতক্ষণে জীয়ে রহে হেন কেবা আছে ॥	এতেক্ষণ জিবেক এমন কেবা আছে ॥
সহজে অত্যল্প বুদ্ধি দ্বিতীয়ে নফর।	সহজে রক্ষক তুমি দ্বিতীয়ে নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর ॥	জাহ সিঘ্র জানা গিয়া আপন ঈশ্বর ॥
বলাবল বুঝি লৈব সংগ্রামের কালে।	বলাবল বুঝিবে সাক্ষাতে যুদ্ধ কালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে ॥	কর্ন্তের বিক্রম সভে জানে ভালে ভালে ॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।	এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহা দুঃখ মনে রথী কাঁদিয়া চলিল ॥	মহা দুঃখ ভাবি চিত্তে কান্দিয়া চলিল ॥
পৃঃ ৫৭১	পৃঃ ১২৬ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩	১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬
আরে দুষ্ট করিস কাহারে অহংকার।	আরে দুষ্ট করিস কাহার অহংকার।
কোন ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার ॥	কোন ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার ॥
যে কথা কহিলি তুঞি আসি মোর কাছে।	জে কথা কহিলি তুঞি আসি মোর কাছে।
এতক্ষণ জিবেক এমন কেবা আছে ॥	এতক্ষণ জিবেক এমন কেবা আছে ॥
সহজে অল্প বুদ্ধি দ্বিতিয়ে নফর।	সহজে অল্প বুদ্ধি দ্বিতীয়ে নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর ॥	জারে সিঘ্র আন গিয়া আপন ঠাকুর ॥
বলাবল বুঝিব সাক্ষাতে যুদ্ধ কালে।	বলাবল বুঝিব সাক্ষাতে যুদ্ধ কালে।
কর্ণ্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে ॥	কর্ন্তের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে ॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।	এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহা দুঃখ মনে পথে কান্দিয়া, চলিল ॥	মহা দুক্ষ মনে তবে কান্দিয়ে চলিল ॥
পৃঃ ১০৯	পৃঃ ৬৩

মুদ্রিত গ্রন্থ

ঘোর আর্ত্তনাদ করি কান্দয়ে সকল নারী
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কংকণাঘাত ঘন ডাকে জগন্নাথ
পার কর বিপত্তি সাগরে ॥
আমি সর্ব্ব ধর্ম্মহীন পাপ কর্ম্ম প্রতিদিন
তব ভক্তি লেশ নাহি মনে।
সত্য মোরা হীন তপা কেবল করহ কৃপা
দীন বন্ধু নামের কারণে ॥

* * *

স্বামী মোর অপরাধী ইহাতে অবজ্ঞা যদি
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
বংশের এতেক নারী বিষ অগ্নি ভর করি
কিংবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
পৃঃ ৫৭৪।৫৭৫

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

মহা আর্ত্মনাদ করি কান্দয়ে সকল নারি
কি হৈল বলিয়া উর্চ্চস্বরে।
কপালে কংকণাঘাত ঘন ডাকে জগন্নাথ
উদ্ধারহ বিপদ সাগরে ॥
আমি সব হিন পাপ কর্ম্ম প্রতিদিন
তব নাম না করি কখনে।
মোরা সব হিন তপা কেবল করহ কৃপা
দিন বন্ধু নামের পালনে ॥
এ বিধে অনেক করি স্তুতি করে কোন নারি
কেহো নিন্দা করে নিজপতি।
দুষ্ট বুদ্ধি স্বামিজন ধর্ম্ম হিংশ অনুক্ষণ
তে কারণ হৈল হেনগতি ॥

* * *

স্বামি মোর অপর্‍াধি ইহাতে অবিজ্ঞা জদি
করিয়া উর্দ্ধার না করিব।
মেলিয়া সকল নারি বিস অগ্নি পান করি
জলে জায়্যা সভাই ডুবিব ॥
পৃঃ ১২৮।১২৯ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

ঘোর বাদ্য নাদ করি কান্দএ সকল নারি
কি হইল কি হইল উচ্চস্বরে।
কপালে কংকণাঘাত ঘন ডাকে জগন্নাথ
পার কর বিপত্য সাগরে ॥
আমি সব কর্ম্মহিন পাপ কর্ম্ম প্রতিদিন
তব ভক্তিলেশ নাঞি মনে।
সত্য মোরা হিত পাকে ধন্য তোমাব কৃপাকে
দিন বন্ধু নামের পালনে ॥
এ বিধি অনেক করি স্তুতি কৈল কোন নারি
কেহ নিন্দা করে নিজপতি।
এক বস্ত্রা যাজ্ঞশেনি সভামধ্যে তারে আনি
চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥

* * *

স্বামি মোর অপরাধি ইহাতে অবেঙ্গা যদি
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মেলিয়া সকল নারি বিস অগ্নি ভয় করি
জলে কিম্বা সভাই মরিব ॥
পৃঃ ১১২ক।১১২

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি। সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

ঘোর আত্মনাদ করি কান্দয় সকল নারি
কি হইল ডাকে উচ্চস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত ঘন ডাকে জগন্নাথ
পার কর বিপদ সাগরে ॥
আমি সব ধর্ম্মহিন পাপ কর্ম্ম প্রতিদিন
তব ভক্তি লেস নাহি মনে।
সত্য মোরা হিন তপা কেবল করহ কৃপা
দিনবন্ধু নামের পালনে ॥
এ বিধি অনেক নারি স্তুতি করে এতেক স্মঙরি
কেহ নিন্দে করে নিজ পতি।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামি জন ধর্ম্ম হিংসা অনুক্ষণ ॥
তে কারণ হৈল হেন গতি ॥

* * *

স্বামি মোর অপরাধি ইহাতে উপাক্ষি জদি
আমা সভা ত্রাণ না করিব।
মিলিয়ে সকল নারি বিস অগ্নিভর করি
জলে কিম্বা অনলে মরিব ॥
পৃঃ ৬৫ক।৬৫

মুদ্রিত গ্রন্থ

আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান।
আমা সবে ভিন্নভাব করেছিস জ্ঞান ॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাস করিয়া বন্ধন ॥
এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলংক রটিবে ॥
কুলের কুৎসায় দুখী কুলাঙ্গার জন।
কি মতে সহিবে তাহা আমার এমন ॥
পৃঃ ৫৭৭

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

আপানা আপনি লোক কত দন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ নাহি তেজে পতি ভিন্ন নরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহসি অজ্ঞান।
আমা সভাকারে ভেদ করিয়া না জান ॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মোর ভাই দুর্জোধন।
তারে লঞা জাসি তুঞি করিয়া বন্ধন ॥
এই কুল বোধুগণ তুমি লঞা গেলে।
লোকে করিবেক কুচ্ছা অকলংক কুলে ॥
এই হেতু ইহার উচিত ফল দিব।
মুহূর্তেকে সমন সদনে পাঠাইব ॥
পৃঃ ১৩২ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

আপনা আপন লোক কত দন্দ করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে অতিপক্ষ পরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহশী অজ্ঞান।
আমা সভায় অভেদ করিয়া তুমি জান ॥
জুধিষ্ঠির তুল্য মোর ভাই দুর্জোধন।
তারে লইআ জাশী তুঞি করিআ বন্ধন ॥
এই কুল বধুগণ তুমি লঞা গেলে!
লোকেতে কহিব কুচ্ছা অকলংক কুলে ॥
কুলের কুচ্ছায় দুখী কুলাঙ্গার জন।
কেমনে সহিব ইহা আমার পরাণ ॥
এই হেতু ইহার উচিত ফল দিব।
মুহুর্তেক শমন সদনে পাঠাইব ॥
পৃঃ ১১৫ক

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

আপনা আপুনি লোক কত দন্দ করে!
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অঙ্গান।
আমা সভা অভেদ করিয়ে তুমি জান ॥
যুধিষ্টির রাজার ভাই দুর্জোধন।
তাহাতে লইয়ে জাসি করিয়ে বন্ধন ॥
এই কুরুবধুগণ তুমি লয়ে গেলে।
লোকেতে করিব কুচ্ছা কলংক হব কুলে ॥
কুলের কুচ্ছায় দুখি নহে কোন জন।
কেমতে সহিব প্রাণে আমা হেন জন ॥
এই হেতু ইহার উচিত ফল দিব।
মুহুর্তেক শমন সদনে পাঠাইব ॥
পৃঃ ৬৬

মুদ্রিত গ্রন্থ

এই চিত্রসেন হয় গন্ধর্ব্বের পতি।
ইঁহার উচিত নহে এতেক দুর্গতি ॥
চিত্রসেনে কহিলেন তুমি মতিমান।
চালন করহ কেন ক্ষত্র বলবান ॥
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবে ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাহ শীঘ্র নিজালয়ে করহ প্রয়াণ ॥
পৃঃ ৫৭৮

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

চিত্ররথে কহে তুমি হঞা মতিমন্দ।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয়ের অন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন জে করিল অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবে ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
জাহ সিঘ্র নিজ গৃহে করহ পয়াণ ॥
পৃঃ ১৩৩ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

চিত্ররথে কহে তুমি হইআ মতিমন্দ।
চালন করহ কেনে ক্ষত্রিয় দুরন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন জে করিল অপরাধ।
চাহিআ আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবে ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
জাহ সিঘ্র নিজালয়ে করহ পয়াণ ॥
পৃঃ ১১৫

১১০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

চিত্ররথে কহে তুমি হয়ে মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষাত্রিয় দুরন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন যে করিল অপমান।
চাহিয়ে আমার মুখ দেহ সমাধান ॥
না কহিবে ইন্দ্রেরে এসব অপমান।
জাহ সিঘ্র নিজ গ্রহে করহ পয়াণ ॥
পৃঃ ৬৭ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
অপত্য সমান স্নেহ নাহি অন্যজনে ॥
শত্রু কেহ নহে রাজা ব্যাধির সমান।
সবার অধিক দেখ দৈব বলবান ॥
দৈব বল বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে।
মনুষ্য হইলে বলি অপমান তবে ॥
*　　*　　*
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক মোর ভাগে ॥
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর তিনে সংহারিব পতঙ্গ সমান ॥
পৃঃ ৫৮০

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
অপত্য সমান স্নেহ নাহি কোন জনে ॥
শত্রু কেহো নহে রাজা ব্যাধির সমান।
সভাকে অধিক দেখ দৈব বলবান ॥
দৈব বল বুঝিয়া ক্ষেমিল আমি সভে।
মনস্য হইলে অপমান বলি তবে ॥
*　　*　　*
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সভার সাক্ষাতে।
মহাবির ধনঞ্জয় হইল মোর ভিতে ॥
তব অস্ত্রে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর তিনে সংহারিব পতঙ্গ সমান ॥
পৃঃ ১৩৩

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

নাই।

*　　*　　*

প্রতিঙ্গা করিল আমি সভাকার আগে।
মহাবির ধনঞ্জয় হৈল মোর ভাগে ॥
তব হস্তে ভিমসেন না ধরিবে টান।
আর তিনে সংহারিব পতঙ্গ সমান ॥
পৃঃ ১১৭ক

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
অপত্য সমান স্নেহ নাহি কোন জনে ॥
সত্রু কেহ নাহি রাজা ব্যাধির সমান।
সবার অধিক দেখ দৈব বলবান ॥
দেব বল বুঝি যে ক্ষেমি যে আমা সভে।
মানিষ্য হইলে বলি অপমান তবে ॥

*　　*　　*

প্রতিজ্ঞা করিল আমি সভাকার আগে।
মহাবির ধনঞ্জয় হইল মোর ভাগে ॥
তব হস্তে ভিমসেন না ধরিব টান।
আর তিনে প্রহারিব পতঙ্গ সমান ॥
পৃঃ ৬৭

মুদ্রিত গ্রন্থ

গন্ধর্ব্ব বিদায় হয়ে গেল নিজস্থান।
দুর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে করিল প্রণাম ॥
বসিল মলিন মুখে হয়ে নম্র শির।
মধুর বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥

*　　*　　*

(দুর্য্যোধনের উক্তি)
পূর্ব্বে যদি এ সকল কহিতে এ সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ ঘটিবে ॥
ভীমার্জ্জুন হৈতে মোরে তাঁর স্নেহ অতি।
যতনে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি ॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাই করিনু বিশ্বাস ॥
পৃঃ ৫৭৯

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

আসির্ব্বাদ করিয়া গন্ধর্ব্ব পতি গেল।
দুর্জোধন আসি ধর্ম্মে প্রণাম করিল ॥
বসিল মলিন মুখে হঞা লম্বসির।
মোধুর বচনে কহে রাজা যুধিষ্ঠির ॥

*　　*

পূর্ব্বে জদি এ সকল কহ তুমি সভে।
যুধিষ্ঠির সহিত বিরোধ কেন তবে ॥
ভিমার্জ্জুন হৈতে আমারে স্নেহ অতি।
সশ্চন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরোপতি ॥
ভাত্রিভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দ মতি তাহে করিল বিশ্বাস ॥
পৃঃ ১৩৩

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

আসির্ব্বাদ করিয়া গন্ধর্ব্ব পতি গেল।
দুর্জোধন আসি ধর্ম্মে প্রণাম করিল॥
বসিল মলিন মুখে হইআ নম্রশীর।
মধুর বচনে কহে রাজা যুধিষ্ঠির॥

*　　　*　　　*

পূর্ব্বে জদি এ সকল কহ তুমি শভে।
যুধিষ্ঠির সহ মোর বিরোধ কি তবে॥
ভিমার্জ্জুন হইতে আমারে স্নেহ অতি।
সচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম মহামতি॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাষ।
আমি মন্দমতি তাহে করিল বিশ্বাষ॥

পৃঃ ১১৫।১১৬ক

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

আসির্ব্বাদ করিয়ে গন্ধর্ব্বপতি গেল।
দুর্জোধন আসি ধর্ম্মে প্রণাম করিল॥
বসিল মলিন মুখে হয়ে নম্রসির।
মধুর বচনে কহে রাজা যুধিষ্ঠির॥
পূর্ব্বে জদি এ সকল কহ মোরে সভে।
যুধিষ্ঠির সহ মোর বিরোধ কি তবে॥

*　　　*　　　*

ভিমার্জ্জুন হৈতে আমারে স্নেহ অতি।
সশ্চন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি॥
ভার্ত্যা ভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাষ।
আমি মন্দমতি তাহে করিল বিশ্বাস॥

পৃঃ ৬৭ক।৬৭

মুদ্রিত গ্রন্থ

তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ যেমন॥
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশ সমান তার নাহি মোরা সব॥
বিশেষ আপনি মনে কর অবধান।
গন্ধর্ব্ব সমরে একা পার্থ কৈল ত্রাণ॥
জীবন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডু পুত্রগণে॥
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমেষেতে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ॥

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।

সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

তোমার আঙ্গায় আমি জাই কাম্য বনে।
কিন্তু সভে ভালমতে জান পঞ্চ জনে॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের তুল্য একেক পাণ্ডব।
সতাংসে সমান তার নাহি আমি সব॥
বিসেসে মনেতে আমি করি অনুমান।
একা পার্থ অনর্থে করিল পরিত্রাণ॥
জিয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে।
কার শক্তি হিংসিবেক ভাই পঞ্চজনে॥
জদি বা তোমার বাক্য করি আমি আন।
মর্ত্ত বৃকোদর লইবেক প্রাণ॥

বিশেষ দ্রুপদ সুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাহার॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা॥
পৃঃ ৫৯৯

*　　*　　*

তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে॥
পৃঃ ৬০৩

বিসেসে দ্রোপদ সুতা লক্ষি অবতার।
মহাবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাহার॥
পৃঃ ১৫৩

*　　*　　*

একান্ত থাকয়ে যার জীবনের আসা।
সে জনা না করে হেন দুরন্ত ভরসা॥
পৃঃ ১৫৪ক

*　　*　　*

তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে॥
পৃঃ ১৫৭

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

তোমার আঙ্গায় আমি জাই কাম্য বন।
কিন্তু সভে ভালমতে জান পঞ্চজন॥
দ্বিতীয় সমন তুল্য একেক পাণ্ডব।
সতাংশে সমান তার নহি আমি সব॥
বিশেষে আপন মনে করি অনুমান।
একা পার্থ অনর্থে করিব পরিত্রাণ॥
জিয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জন।
কার শক্তি হিংশীবেক ভাই পঞ্চজন॥
জদি বা তোমার বাক্য না করিব আন।
মুহূর্তেকে ব্রকোদর লইবেক প্রাণ॥
বিশেষে দ্রোপদি সুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চজন রক্ষক তাহার॥
একান্ত থাকএ জার জীবনের আশা।
সে জন না করে হেন দুরন্ত ভরসা॥
পৃঃ ১৩৩ক

*　　*　　*

তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত মারে তার মাথে॥
পৃঃ ১৩৬

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

তোমার আজ্ঞায় আমি জাবো কাম্য বনে।
কিন্তু সভে ভালোমতে জান পঞ্চজনে॥
দ্বিতীয় সমনতুল্য এক এক পাণ্ডব।
সতাংসে সমান তার নাহি আমি সব॥
বিশেষে আপন মনে কর অনুমান।
একা পার্থ অনর্থে করিল পরিত্রাণ॥
জিয়ত বাঘের চক্ষু নিবে কোন জন।
কার শক্তি হিংসিবেক ভাই পঞ্চজন॥
জদি বা তোমার বাক্য না করিব ম্লান।
মুহূর্তেক বৃকোদর লইবেক প্রাণ॥
বিশেষে দ্রোপদষুতা লক্ষি অবতার।
মহাবল পঞ্চ স্বামি রক্ষক তাহার॥
একান্ত থাকিব জার জিবনের আসা।
সে জন কি করে হেন দুরন্ত ভরসা॥
পৃঃ ৭৬

*　　*　　*

তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিন বার পদাঘাত করে তার মুখে॥
পৃঃ ৭৮ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নিয়োগ হয় যখন যেমন॥
পৃঃ ৬০৭

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

দুর্জোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে জখন জেই ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নিযুক্ত হয় যখন যেমন॥
পৃঃ ১৬৩ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

দুর্জোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
অবস্য হইব যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
এতেক ভাবিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
বিধির নিযুক্ত হব যখন জেমন॥
পৃঃ ১৪০

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

দুর্জোধন বলে মঞি চিন্তা করি মিছা।
হইবে জখন জাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রওজন।
বিধির নিযুক্ত হব জখন জেমন॥
পৃঃ ৮০

কাম্যক বনে দুর্বাসা

মুদ্রিত গ্রন্থ

চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় যাইতে হইল মন॥
পৃঃ ৫৮৭

*   *   *

ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
কেবল আমার ভক্ত সুখ দুঃখ দাতা॥

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

চিত্তেতে চঞ্চল আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় জাইতে আছে মন॥
পৃঃ ১৪১

*   *   *

ভক্তের অধিন মোর করিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখ দুঃখ ধাতা॥

ভক্তজন যথা মম থাকে দেবি সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে ॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
সে কারণে ভক্তদুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ সাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির ॥
দুঃখ পেয়ে মোরে ডাকে কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন ॥

পৃঃ ৫৮৮

মোর ভক্তজন হঞা থাকে জদি সুখে।
আমিহ থাকিএ তবে পরম কৌতুকে ॥
মোর ভক্তজন হঞা দুখি জদি হয়।
সে দুখ্খ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
তে কারণে ভক্ত দুখ্খ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ সাগরে পাড়ি হইল অস্থির ॥
বেস্ত হঞা ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল স্বরিরে আসি সম ব্রর্জাঘাত ॥
জতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের তনয়।
ততক্ষণ দুখ্খ মোর খণ্ডনে না হয় ॥

পৃঃ ১৪২ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
যে কারণ চঞ্চল হইল মোর মন ॥

*　　　*　　　*

ভক্তের অধিক মোরে করিল বিধাতা।
আমার কেমন ভক্ত সুখ দুঃখ দাতা ॥
মোর ভক্ত জন থাকে জদি সুখে।
আমিহ তখন থাকি পরম কৌতুকে ॥
আমা ভক্তজন হইআ দুখে যদি হয়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
তে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ সাগরে পড়ে হইল অস্থির ॥
আর্ত্ত হইআ ভক্ত ডাকি বলে জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই সম কুন্তঘাত ॥
জতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের তনয়।
ততক্ষণ দুখ্খ মোর খণ্ডন না হয় ॥

পৃঃ ১২২।১২৩ক

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

চিত্রের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণে।
হেন বুঝি কোথায় জাইতে আছে মনে ॥

*　　　*　　　*

ভক্তির অধিক মোরে করিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখ দুঃখ দাতা ॥
মোর ভক্তজন যথায় থাকে সুখে।
তখন থাকিবে আমি পরম কৌতুকে ॥
আমা ভক্তজন হয়ে দুঃখী জদি হয়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
তে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডিহে সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ সাগরে পড়ি হইল অস্থির ॥
অসহায় ডাকিছে বলিয়ে জগন্নাথ।
বাজিল স্বরিরে মোর সম দন্ত ঘাত ॥
জতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের তনয়।
ততক্ষণ দুঃখ মোর খণ্ডন না হয় ॥

পৃঃ ৭১ক।৭১

মুদ্রিত গ্রন্থ

এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এত শুনি কহেন রুক্মিণী ঠাকুরাণি ॥
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভাবে ॥
বিশেষ করিল বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সর্ব্বকাল থাক তথা ॥
রজনীতে যাওয়া কিন্তু কভু বিধি নয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয় ॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার তুমি কর ইচ্ছাময় ॥

পৃঃ ৫৮৮

১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩

এই আমি চলিলাঙ জথা ধর্ম্মমণি।
এত সুনি কহেন রুক্মিণি ঠাকুরাণি ॥
তোমার একান্ত মন আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥
বিসেসে করিল বস দ্রোপদ দুহিতা।
তোমার বাসনা সর্ব্বকাল থাকি তথা ॥
গমন রজনিকালে উচিত না হয়।
তে কারণে নিবেদন করি মহাসয় ॥
জাইবে অবস্য কালি পত্তুস বিহানে।
জে আঙ্গা তোমার এই লয় মোর মনে ॥

পৃঃ ১৪২ক

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩

এই আমি চলিলাঙ যথা ধর্ম্মমুনি।
এতশুনি কহিলা রুক্মীনি ঠাকুরাণি ॥
তোমার একান্ত ভক্ত আছএ পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥
বিশেষে করিল বস দ্রোপদের সুতা।
তোমার বাসনা সর্ব্বকাল থাক তথা ॥
গমন রজনিকালে উচিত না হয়।
তে কারেণ নিবেদন করি মহাসয় ॥
যাইব অবস্ম কালি প্রত্যুশ বিহানে।
যে আজ্ঞা তোমার এই লয় মোর মনে ॥

পৃঃ ১২৩ক

১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

এই আমি চলিলাম জথা ধর্ম্মমণি।
এতবুনি কহিল রুক্মিণি ঠাকুরাণি ॥
তোমার একান্ত ভাব আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥
বিসেসে করিল বস দ্রোপদির সুতা।
তোমার বাসনা সদাকাল থাক তথা ॥
গমন রজনিকালে উচিত না হয়।
তে কারণে নিবেদন করি মহাসয় ॥
জাইও অবস্য কালি প্রত্তুস বিহানে।
কি আঙ্গা তোমার এই লয় মোর মনে ॥

পৃঃ ৭১

মুদ্রিত গ্রন্থ	**১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি।** **সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৫৭৩**
দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী। অচেতন ছটপট করে নৃপমণি ॥ কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির। দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥ পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর। চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর ॥ কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘন ঘন। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলি করেন ক্রন্দন ॥ এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে ॥ এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়। কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায় ॥ পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ। এই হেতু জন্মাবধি পাই মনস্তাপ ॥ অত্যন্ত বালক কালে পড়ি মহাশোকে। অজ্ঞানে পিতার হৈল গতি পরলোকে ॥ পৃঃ ৬৫৭	নাই।

১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি। **সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২৭১৩**	**১২০৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি।** **সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬**
নাই।	নাই। (খণ্ডিত)

বিরাট পর্ব

মুদ্রিত গ্রন্থ	**১০৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ** **পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬** **খণ্ডিত পৃষ্ঠা ৪-২৫, ৩৮-৪৫**
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল। অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল ॥ পৃঃ ৬৮৮	অঙ্গুলি নাড়িরা ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল। অধোমুখ হয়্যা ভীম সভাতে বসিল ॥ পৃঃ ৯

*　　*　　*　　*　　*　　*

বিরাটের য়েতে বোল বুনি যাজ্ঞসেনি।
ক্রন্দন করিয়া কহে সিরে করহানি ॥
জার ধনু ঘোসে তিন পুর কম্প হয়।
এক রথে করে তিন লোক পরাজয় ॥
তার নারি হয়্যা আমি হইনু অনাথ।
সুত পুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত ॥
বল বুদ্ধি তা সবার কোথাকার গেল।
মোর য়েত অপমান বসিয়া দেখিল ॥
পৃঃ ১০ক

১১০৩ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ
পুঁথি সংখ্যা ২২৩২
পৃঃ ৩৮-৭৪

খণ্ডিত।

১২১৫ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ
পুঁথি সংখ্যা ২২১৮

অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপীল।
অধোমুখ হইয়া ভীমশ্রুত পুরিল ॥
পৃঃ ১৩

* * *

বিরাটের কথা সুনি বলে জঙ্গসেনি।
রোদন করিয়া বলে সিরে করহানি ॥
পদাঘাতে মৃত্তুসম করে সত্রুগণ।
দেব দ্বিজগণ পৃয় বড় পৃঅ মনে ॥
সে সব জনের আমি মানুসি মহিশী।
সুতপুত্র পদে মোরে প্রহারিল আসী ॥
জাহার ধনুঘোসে সংসার কম্প হয়।
এক রথে তিনলোক করে পরাজয় ॥
তাহার মানিনী ভার্য্যা দেখিয়া অনাথ।
সুতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম তার কুথাকারে গেল।
মোর এত অপমান বসিয়া দেখিল ॥
শুনিতে লাগিলা তবে জত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিলা সুতের নন্দন ॥
সাক্ষাতে সৈরিন্দ্রি দেবি দেবতা রুপিনী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী ॥
পৃঃ ১৪ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

তবে ধর্ম্ম কহিছেন কংক নাম ধারী।
সৈরিন্ধ্রি না কর খেদ যাও অন্তঃপুরী ॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে ॥
দেখিতেছে গন্ধর্ব্বেরা তব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন ॥
কালেতে কীচকে তারা দণ্ডিবে উচিত।
কীচক হইতে কিছু না হয় ভীত ॥
দুঃখিনীর মত কেন কাঁদহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায় ॥
পৃঃ ৬৯০

১০৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

তবে ধর্ম্ম বৈল কিছু, কংক নাম ধরি।
না কান্দ সৈরিন্ধ্রি তুমি যাও অন্তঃপুরি ॥
ধর্ম্মসিল মৎসরাজা ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষেমা করিল কিচকে ॥
দেখিতেছে তব দুঃখ তব স্বামিগণ।
সময় বুঝিয়া তারা ক্ষেমিল এখন ॥
সময়েতে কিচকে দণ্ডিব জথোচিত।
কিচক হৈতে দেখি তেজ মন ভিত ॥
দুঃখিসম কেন তুমি কান্দহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাবে কি দোস রাজায় ॥
পৃঃ ১০ক

১১০৩ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২২৩২

খণ্ডিত।

১২২৫ বঙ্গাব্দের পুঁথি।
কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২২১৮

তবে ধর্ম্ম বলিছেন কংক নাম ধরি।
না কর ক্রন্দন সুন জাহ অন্তঃপুরি ॥
ধর্ম্মসহ মৎস্যরাজা ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি খেমা করিল কীচকে ॥
দেখিছেন তোমার গন্ধর্ব্ব পতিগণ।
সব না যুড়িয়া পুন খেমিল তখন ॥
বিনা অপরাধে মারে রক্ষা কর তায়।
দাসিতে মারিতে নারে এমন সভায় ॥
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায়।
চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥
ইহার উচিত সাস্তী দেহ মহারায়।
পৃঃ ১৪

মুদ্রিত গ্রন্থ

বিরাট রন্ধন গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যায় বৃকোদর হয়ে অচেতন ॥
সংকেতে বলেন দেবী চাপি দুই পায়।
উঠে উঠ কত নিদ্রা যাহ মৃত প্রায় ॥
পৃঃ ৬৯০

১০৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

বিরাট রন্ধন গৃহে ভিমের সয়ন।
নিদ্রাগত ভিমসেন নাহিক চেতন ॥
সর্য্যায় বসিয়া কৃষ্ণা চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ কত নিদ্রা জাহ মৃর্তপ্রায় ॥
পৃঃ ১০

* * * * * *

আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চিত আমার মৃত্যু তোমারে লাগিবে ॥
হয় বিষ খাব কিংবা প্রবেশিব জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচক দেখিলে ॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মোর ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয় ॥
সৈরিন্ধ্রি বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক্ মোর ছার প্রাণে জীবনে কি আশ ॥

* * *

এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
তিতিল নয়ন নীরে ভীম কলেবর ॥

পৃঃ ৬৯১।৬৯২

আজি জদি তুমি কিচকে না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥
কিম্বা বিস খাই কিম্বা প্রবেসিয়ে জলে।
মরিব — আমি কিচকে দেখিলে ॥
নিযে আসে দুরাচার ভগ্নির আলয়।
মোর ভার্য্যা হয় বল্যা নিরবধি কয় ॥
সৈরিক্ষি বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক জাউ জীবন কি ছার তার আস ॥

* * *

এত বলি কান্দে কৃষ্ণা মুখে দিয়া কর।
অশ্রুজলে ভিমের তিতিল কলেবর ॥

পৃঃ ১১ক।১১

১১০৩ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২২৩২

খণ্ডিত।

১২১৫ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২২১৮

বিরাট রন্ধন গৃহে ভিমের সয়ন।
নিদ্রা জান বৃকোদর হঞা অচেতন ॥
সংকেতে বলএ দেবি চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ কত নিদ্রা জাহ মিত্তু প্রায় ॥

পৃঃ ১৫ক

* * *

আজি জদি কিচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তুমারে লাগিবে ॥
কিবা বিস খাই কিম্বা প্রবেসিযে জলে।
মরিব প্রভাতে আমি কিচকে দেখিলে ॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার আলয়।
মোর ভার্য্যা হর বলি অনুক্ষণ কয় ॥
সৈরিন্ধ্রি বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক মোর জীবনে কি ছার মোর বাস ॥

পৃঃ ১৬ক

* * *

এত বলি কান্দে দেবি মুখে দিয়া কর।
অশ্রু জলে ভিমের ভাসিল কলেবর ॥

পৃঃ ১৬

মুদ্রিত গ্রন্থ

গান্ধারী বলেন, রাঁড়ি এত গর্ব্ব তোর।
কি মতে পূজিস্ শিব সংপূজিত মোর ॥
*　　*　　*
দ্বিতীয় প্রহর বেলা অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাহি কয় ॥
অস্ত্রশিক্ষা পরিশ্রমে দহে ক্ষুধানল।
সে কারণে আনিলাম আমান্ন সকল ॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পিছু।
আজ্ঞা হৈলে আম অন খাব কিছু কিছু ॥

পৃঃ ৭১৮।৭১৯

১০৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

গান্ধারি কহিল রাণ্ডি য়েত গর্ব্ব তোর।
কেমতে তু পূজিস সিব পূজিত মোহর ॥
*　　*　　*
ত্রিতিয় প্রহর বেলা অর্ণ্ব নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাঞি কয় ॥
অস্ত্রশিক্ষা পরিশ্রমে দহে ক্ষুধানল।
তে কারণে আনিলাঙ আমান্ন সকল ॥
রন্ধন হইলা অর্ণ্ব রাজা খাব পাছু।
আজ্ঞা হল্যে এই মত খাই কিছু কিছু ॥

পৃঃ ২৪।২৫

১১০৩ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২২৩২

গান্ধারি বলিল রাণ্ডি এত গর্ব্ব তোর।
কেমতে পূজিস লিঙ্গ পূজিত মোহব ॥
*　　*　　*
তিতৃয় প্রহর বেলা অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কোন কথা নাহি কয় ॥
অস্ত্রসিক্ষা পরিশ্রম দহে ক্ষুধানল।
তে কারণে আনিলাঙ আমান্ন সকল ॥
রন্ধন হইলে রাজা অন্ন খাব পাছু।
আজ্ঞা হইলে এতমত খাই কিছু কিছু ॥

পৃঃ ৪১ক।৪২ক

১২১৫ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২২১৮

গান্ধারি বলিল রাণ্ডী এত গর্ব্ব তোর।
কেমনে পূজিলি লিঙ্গ পূজিত মোহর ॥

পৃঃ ৪১

*　　*　　*
ত্রিতিয় প্রহর বেলি অন্ন' নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাঞি কয় ॥
অস্ত্রসিক্ষা পরিশ্রমে দেহে খুধানল।
তে কারণে আনি আছি আমান্য সকল ॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পাছু।
আজ্ঞা হইলে এইমত খাই কিছু কিছু ॥

পৃঃ ৪৩ক

মুদ্রিত গ্রন্থ

জানিয়াছি আমি তোমা সবাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি ॥
অন্নজল খাইবার পাইলে সময়।
যুদ্ধকাল দেখি প্রাণে উপজিল ভয় ॥

১০৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ২১৮৬

খণ্ডিত।

যাহ বা থাকহ তুমি যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
ভিক্ষাজীবি সনে দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবি যেইজন।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন ॥
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে ॥

পৃঃ ৭২৯

১১০৩ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ
পুঁথি সংখ্যা ২২৩২

লক্ষি আছি আমি জেই তোমা সভার মতি।
ভএতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি ॥
ভৃত্য অন্ন খাইবার করিল সময়।
যুর্দ্ধকাল দেখি ভয় জন্মিল হৃদয় ॥
জাহ বা থাকহ তবে জেবা লয় মনে।
সহজে ভিক্ষুক তবে জাজ ব্রাহ্মণে ॥
ভিক্ষারি জনের দ্বন্ধে কোন প্রয়োজন।
জথা যাহ তথা কর উদর পূরণ ॥
— নিমন্ত্রণে পিণ্ডর্জিব জেই জন।
তাহা নিগ্রহ দন্দ কিসের কারণ ॥
জাহ তুমি জথা ইচ্ছা কেহো নাহি রাখে।
মোর পরাক্রম আজি সর্ব্বলোক দেখে ॥

পৃঃ ৫১

১২১৫ বঙ্গাব্দের পুঁথি। কঃ বিঃ
পুঁথি সংখ্যা ২২১৮

লাখিআছী আজি আনি তুমা সভাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ পীরিতি ॥
ভক্ত অন্ন খাইবার করিল সময়।
যুদ্ধকাল দেখি ভার জন্মিল হৃদয় ॥
জাহ বা থাকহ — উদর ভরণ।
জঙ্গ নিমন্ত্রণে পিণ্ড দিব জেই জন
তাহার বিগ্রহ দন্দে কোন প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ হইয়া তুমি যুদ্ধে কেন থাক।
জাহ তুমি জথা ইচ্ছা কেহো নাহি রাখে।
কর্ণের এতেক কথা সুনি দ্রোণ গুরু।
কর পদ কম্পায়, কম্পায় বক্ষ উরু ॥

পৃঃ ৫৩

পরিশিষ্ট—'চ'

আক্ষরিক অনুবাদের পরিমাণ

কবির রচনায় এমন বহু অংশের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলিকে সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ বলিয়া মনে হয় অথবা যেগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই বোঝা যায় কবি সংস্কৃত মহাভারতকে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করিতেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য সেই সকল অংশ উদ্ধৃত হইল। প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক, পরে উহার বঙ্গানুবাদ এবং সব শেষে কবির রচনা প্রদত্ত হইল। প্রসঙ্গ নির্দেশ করিবার জন্য যে কাহিনীতে সংস্কৃত শ্লোক বিবৃত হইয়াছে, সেই কাহিনীরও উল্লেখ করা হইল।

আদি পর্ব

ভৃগু ও পুলোমার কাহিনী

ধর্ম্মে প্রয়তমানস্য সত্যঞ্চ বদতঃ সমম্।
পৃষ্টো যদব্রবং সত্যং ব্যাভিচারোঽত্র কোমম্॥ আদি ৬।১৬

(জিজ্ঞাসা করার পর যে সাক্ষী, জানিয়াও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে নিজের বংশের পূর্ব্ববর্তী সাত পুরুষ এবং পরবর্তী সাতপুরুষকে নরকে নিপাতিত করে।)

জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জন।
ইহকালে নিন্দা, অন্তে নরকে গমন॥ পৃঃ ৭

রুরুর সর্পহিংসা

ইদঞ্চোবাচ বচনং রুরুমুপ্রতিমৌজসম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং স্মৃতঃ॥ আদি ৯।২১

(এবং মহাপ্রতাপশালী রুরুকে এই কথা বলিলেন যে : সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর হিংসা না করাই ভাল।)

অহিংসা পরম ধর্ম্ম ; করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষ, করিয়া যতন॥ পৃঃ ৮

জরৎকারুর বিবরণ

নহি ধর্ম্মফলৈস্তাত! ন তপোভিঃ সুসঞ্চিতৈঃ।
তাং গতিং প্রাপ্নুবন্তীহ পুত্রিণো যাং ব্রজন্তি বৈ॥ আদি ১০।২৪

(বৎস! এই জগতে পুত্রবান লোকেরা যে স্থান লাভ করেন, যাগযজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা সে স্থান লাভ করা যায় না, কিম্বা সুসঞ্চিত তপস্যা দ্বারাও সে স্থান লাভ করা যায় না।)

মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুত্রবান লোক সব সেই স্থানে যায়॥ পৃঃ ১০

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যদের অভিশাপ

ন চাপ্যেবং ত্বয়া ভূয়ঃ ক্ষেপ্তব্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ন চাবমন্যা দর্পাত্তে বাগ্‌বজ্রা ভৃশকোপনাঃ॥ আদি ২৬।৩২

(কিন্তু ইন্দ্র! তুমি পুনরায় এইরূপ অহংকারের বশীভূত হইয়া, বেদবক্তা মহর্ষিদিগের তিরস্কার বা অপমান করিও না। কেন না. তাঁহারা অত্যন্ত কোপন স্বভাব এবং তাঁহাদের বাক্যই বজ্রস্বরূপ।)

মুনিগণে সান্ত্বাইয়া বলে সুররাজে।
উপহাস কভু আর নাহি কর দ্বিজে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া নাহি কর অহংকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কারো নাহিক নিস্তার॥ পৃঃ ৩৩

নাগরাজার তপস্যা

অথবা য উপাধ্যায়ঃ ক্রতোস্তস্য ভবিষ্যতি।
সর্পসত্রবিধানজ্ঞোরাজকার্য্যহিতেরতঃ॥ ১৬
তং গত্বা দশতাং কশ্চিদ্ভুজঙ্গঃ স মরিষ্যতি।
তস্মিন্ মৃতে যজ্ঞকারে ক্রতুঃ স ন ভবিষ্যতি॥ ১৭
(যুগ্মকম্)
যে চান্যে সর্পসত্রজ্ঞাভবিষ্যন্ত্যস্য চর্ত্বিজঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ দশিষ্যামঃ কৃত্তমেবং ভবিষ্যতি॥ ১৮
(আদি ৩২।১৬-১৮)

(অথবা সে রাজার হিতৈষী ও সর্পযজ্ঞাভিজ্ঞ যে ব্যক্তি সেই যজ্ঞের আচার্য্য হইবেন, কোন নাগ যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিবে : তাহাতেই তিনি মরিবেন। তিনি মরিয়া গেলেই আর সে যজ্ঞ হইবে না। সর্পসত্রাভিজ্ঞ অন্য যাঁহারা জনমেজয়ের পুরোহিত হইবেন, তাঁহাদিগকেও আমরা দংশন করিয়া মারিব, এইরূপ হইলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।)

আর নাগ বলে, কোন্ বিচিত্র সে কথা।
কেমনে করিবে যজ্ঞ, খাব যজ্ঞহোতা॥
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণে ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া॥ পৃঃ ৩৯

অপরে ত্বব্রুবন্নাগাঃ সমিদ্ধং জাতবেদসম্।
বর্ষৈর্নির্ব্বাপয়িষ্যামো মেঘা ভূত্বা সবিদ্যুতঃ॥ ২১
স্রগ্‌ভাণ্ডং নিশি গত্বা চ অপরে ভুজগোত্তমাঃ।
প্রমত্তানাং হরন্ত্বাশু বিঘ্ন এবং ভবিষ্যতি॥ ২২
যজ্ঞে বা ভুজগাস্তস্মিন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
জনান্ দশন্তু বৈ সর্বৈঃ নৈবং ত্রাসো ভবিষ্যতি॥ ২৩
(আদি ৩২।২১-২৩)

(আর একদল নাগ বলিল—আমরা বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘ হইয়া বৃষ্টি দ্বারা, সেই যজ্ঞের প্রজ্জলিত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিব। যজ্ঞের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে পুরোহিতেরা নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবেন, এই সময়ে প্রধান প্রধান নাগ সেখানে যাইয়া তাড়াতাড়ি উপকরণের পাত্রগুলিকে চুরি করিয়া আনিবে, এইরূপ হইলে সে যজ্ঞের বিঘ্ন হইবে।)

আর নাগ বলে, আমি জলধর হৈয়া।
নিবারিব যজ্ঞ — অগ্নি বারি বরষিয়া॥
আর নাগ বলে, আমি বিপ্ররূপ ধরি।
যতেক যজ্ঞের দ্রব্য লব চুরি করি॥
কেহ বলে মোরা সব একত্র হইয়া।
অনিবার যজ্ঞাগার থাকিব বেড়িয়া॥
যাহারে দেখিব, তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ নিবারণ॥ পৃঃ ৩৯

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ

তং তু নাদং ততঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণস্তে প্রদুদ্রুবুঃ।
অপশ্যন্ত তথা যান্তমাকাশে নাগমদ্ভুতম্॥
সীমন্তমিব কুর্বাণং নভসঃ পদ্মবর্চসম্।
তক্ষকং পন্নগশ্রেষ্ঠং ভৃশং শোকপরায়ণাঃ॥
আদি ৩৯। ২-৩ (যুগ্মকম্)

(তাহার পর, সেই মন্ত্রীরা সেই গর্জ্জন শুনিয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন ; পরে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহারা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ অদ্ভুতদৃশ্য তক্ষক নাগ আপন শরীর দ্বারা আকাশে সীমন্ত সিন্দূরের রেখা করিতে করিতেই যেন গমন করিতেছে।)

শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার॥
নৃপতিরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্তপদ্ম সম তনু দেখে সর্ব্বলোকে॥ পৃঃ ৪৪

শকুন্তলার উপাখ্যান

কেচিদগ্নিমথোৎপাদ্য সংসাধ্য চ বনেচরাঃ।
ভক্ষয়ন্তি স্ম মাংসানি প্রকুট্যাবিধিবত্তদা॥ আদি ৮৩।২৮

(কতকগুলি সৈন্য অস্থি হইতে হরিণের মাংস নিষ্কাশিত করিয়া, অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাতে যথা নিয়মে পাক করিয়া, তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল।)

কোন কোন জন তথা খায় পুড়াইয়া।
তবে এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া॥ পৃঃ ৬৯

আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥
আদি ৮৮।৩০

(আর সূর্য্য, চন্দ্র বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল, মন, যম দিন, রাত্রি, প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম ইঁহারা মানুষের সমস্ত বৃত্তান্তই জানিতেছেন ।)

চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল ।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল ॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ নরবৃত্তি জানে ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তারে, দেয় ত' শমনে ॥ পৃঃ ৭২

আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র — ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।
তস্মাদ্ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্ ॥ আদি ৮৮।৪৮

(জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন--ভর্ত্তা ভার্য্যার গর্ভে আপনাকেই আপনি পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়া থাকেন । সুতরাং তিনি পুত্রবতী ভার্য্যাকে মাতার ন্যায় দেখিবেন ।)

পুত্ররূপে জন্মে পিতা ভার্য্যার উদরে ।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে, জানে চরাচরে ॥
সে কারণে ভার্য্যারে জননী সমা দেখি ।
করিলা অনেক দোষ আমারে উপেক্ষি ॥ পৃঃ ৭৩

ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গৌর্ব্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্ ।
গুরুর্গরীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ ॥ আদি ৮৮।৫৭

(দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গরু শ্রেষ্ঠ । গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, আর সুখস্পর্শ বস্তুর মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ ।)

চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদে ব্রাহ্মণে ।
অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ, পুত্র আলিঙ্গনে ॥ পৃঃ ৭৩

পরিপত্য যদা সূনুর্ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ ।
পিতুরাশ্লিষ্যতেঽঙ্গানি কিমস্ত্যভ্যাধিকং ততঃ ॥ আদি ৮৮।৫৩

(যখন ধূলি ধূসরিত পুত্রটি যাইয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, তখন তাহা হইতে অধিক সুখ জগতে আর কি আছে ?)

ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন ।
হৃদয়ের সর্ব্বদুঃখ হয়ত' খণ্ডন ॥ পৃঃ ৭৩

মেনকা ত্রিদশেষ্বেব ত্রিদশাশ্চানু মেনকাম্ ।
মমৈবোৎকৃষ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত ! তব জন্মতঃ ॥ ৮৩
ক্ষিতাবটাম্মি রাজেন্দ্র ! অন্তরীক্ষে চরাম্যহম্ ।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরু সর্ষপয়োরিব ॥ ৮৪
মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
ভবনান্যনু সযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ ॥ ৮৫ (আদি ৮৮।৮৩-৮৫)

(মেনকা বেশ্যা হইলেও দেবতার মধ্যে গণ্য ; এমন কি দেবতারা ত' মেনকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট । অতএব দুষ্মন্ত ! আপনার জন্ম অপেক্ষা আমার জন্ম উৎকৃষ্ট । মহারাজ

আপনি কেবল ভূতলেই বিচরণ করিতে পারেন। আর আমি যে ভূতল ও আকাশ দুই স্থানেই বিচরণ করিতে পারি। সুতরাং সুমেরু ও সরিষার মত আমার ও আপনার ভেদটা দেখুন। তারপর মহারাজ! আমি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের বাড়ী যাতায়াত করিতে পারি। অতএব আমার ক্ষমতাটা দেখুন।)

তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা হতে যত বৃহত্তর॥
মম মাতা স্বর্গবাসী, তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্তে সমতুল কর নরপতি॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে॥
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি॥ পৃঃ ৭৪

বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখম্।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তমম্॥ আদি ৮৮।৮৭

(কুৎসিত লোক যে পর্যন্ত আপনার মুখখানা দর্পণে না দেখে, সেই পর্যন্তই সে আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর মনে করে।)

কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণে না নিজ মুখ দেখে॥ পৃঃ ৭৪

শুক্রাচার্য্য ও দেবযানীর কাহিনী

যো ব্রাহ্মণোঽদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ॥

আদি ৬৪।৭২

(এই জগতে অল্পবুদ্ধি যে কোন ব্রাহ্মণ আজ হইতে ভ্রমক্রমেও সুরাপান করিবে, সে ধর্ম্মহীন এবং ব্রহ্মঘাতীর তুল্য পাপী হইয়া, ইহলোকেও নিন্দিত হইবে, পরলোকেও নিন্দিত হইবে।)

ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কাজ লয় যদি ঘ্রাণ॥
অধার্ম্মিক ব্রহ্মঘাতী বলিবা সে জনে।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হৈবে সেই ক্ষণে॥
ইহলোক অপূজিত হৈবে সেই জন।
মরিলে নরক মধ্যে হইবে গমন॥ পৃঃ ৭৯

যো যজেদপরিশ্রান্তো মাসি মাসি শতং সমাঃ।
ন ক্রুধ্যেদ্যশ্চ সর্ব্বস্য তয়োরক্রোধনোঽধিকঃ॥ আদি ৬৭।৬

(যে লোক পরিশ্রান্ত না হইয়া, শত বৎসর যাবৎ প্রত্যেক মাসে পিতৃশ্রাদ্ধ করে, এবং যে লোক কাহারও উপরে ক্রোধ করে না: এই দুইয়ের মধ্যে ক্রোধহীন লোকই প্রধান।)

শতেক বৎসর তপ করে যেইজন।
অক্রোধ সমান তাহা নহে কদাচন ॥ পৃঃ ৮২

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্! ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুর পাতকানি ॥ আদি ৭০।১৬

(শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন—মহারাজ! পরিহাসের সময়ে, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনের সময়ে, বিবাহের সময়ে, প্রাণ যাইবার সময়ে এবং সর্ব্বস্ব অপহরণের সময়ে, এই পাঁচটি সময়ে মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না।)

বিবাহ সময়ে সর্ব্বধন অপহারে।
কৌতুক সময়ে পুনঃ রমণী বিহারে ॥
জীবন সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চ স্থানে মিথ্যা পাপহেতু নহে ॥ পৃঃ ৮৬

দেবযান্যুবাচ।

শোভনং ভীরু! যদ্যেবমথ স জায়তে দ্বিজঃ।
গোত্রনামাভিজনতো বেত্তুমিচ্ছামি তং দ্বিজম্ ॥ ৫

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

তপসা তেজসা চৈব দীপ্যমানং যথা রবিম্।
তং দৃষ্ট্বা মম সংপ্রষ্টুং শক্তির্নাসীচ্ছুচিস্মিতে ॥ ৬ (আদি ৭১।৫-৬)

(দেবযানী বলিলেন—সুন্দরি! যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে ভালই হইয়াছে। তুমি সে ব্রাহ্মণকে চেন কি? আমি তাঁহার নাম, গোত্র ও বংশ জানিতে ইচ্ছা করি।

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন—দেবযানি! তিনি তপস্যার তেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিলেন; তাই তাঁহাকে দেখিয়া ও সব বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই আমার ক্ষমতা হয় নাই।)

দেবযানী বলে, সখি কহ সত্যকথা।
কি নাম ঋষির বল বাস তাঁর কোথা ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে যেন দেব দিবাকর ॥ পৃঃ ৮৭

যযাতির কাহিনী

দ্রুহ্যুরুবাচ।

ন গজং নরথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙ্‌ক্তে ন চ স্ত্রিয়ম্।
বাগ্‌ভঙ্গশ্চাস্য ভবতি তাং জরাং নাভি কাময়ে ॥ আদি ৭২।১৯

(দ্রুহ্যু বলিলেন—জরাজীর্ণ লোক হস্তী ও অশ্বে চড়িতে পারে না এবং স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারে না, বিশেষতঃ তাহার বাক্যও বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং আমি সে জরা নিতে ইচ্ছা করি না।)

দ্রুহ্যু বলে, রাজা, জরা বহু দোষ ধরে।
ইন্দ্রিয় শিথিল হয় বাক্য নাহি স্ফুরে ॥ পৃঃ ৯০

যযাতিরুবাচ।

যত্ত্বং মে হৃদয়জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
জরাদোষস্ত্বয়া প্রোক্তস্তস্মাত্ত্বং প্রতিলপ্স্যসে ॥ ২৫
প্রজাশ্চ যৌবনপ্রাপ্তা বিনশিষ্যন্ত্যনো ! তব।
অগ্নি প্রস্কন্দন পরস্ত্বঞ্চাপ্যেবং ভবিষ্যসি ॥ ২৬ (আদি ৭২।২৫-২৬)

(যযাতি বলিলেন—তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যখন আপন যৌবন দিলে না, অথচ জরার দোষই বলিলে, তখন তুমি সেই জরাগ্রস্তই হইবে। আর অনু ! তোমার সন্তান যৌবন লাভ করিয়াই মরিয়া যাইবে এবং তুমিও বেদোক্ত অগ্নি কর্ম্মহীন হইবে।)

রাজা বলে, তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হইয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলো আমার ॥
যতেক জরার দোষ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে ॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবন সময়ে তারা সবাই মরিবে ॥ পৃঃ ৯০

যযাতিরুবাচ।

আক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্য বিশিষ্টস্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষেভ্যঃ মানুষাশ্চ প্রধানা বিদ্বাংস্তথৈবাবিদুষঃ প্রধানঃ ॥ ১৪
আক্রুশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুরেব তিতিক্ষিতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতঞ্চাস্য বিন্দতি ॥ ১৫
নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াঽস্য বাচা পর উদ্বিজেত ন তাং বদে দূষতীং পাপলোক্যাম্ ॥ ১৬
আদি ৭৫।১৪-১৬

(যযাতি কহিলেন—ক্রোধশীল লোক অপেক্ষা ক্রোধহীন লোক এবং অসহিষ্ণু লোক অপেক্ষা সহিষ্ণু লোক শ্রেষ্ঠ ; মানুষ ভিন্ন প্রাণী হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মূর্খ হইতে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ ! অন্যে গালি দিলেও তাহাকে ফিরাইয়া গালি দিবে না, সে সময়ের ক্রোধ সহ্য করিয়া যাইবে। তাহাতে যে গালি দেয় তাহার ক্রোধই তাহাকে দগ্ধ করে, আর তাহার পুণ্য সহ্যকারী লাভ করে। পরের মর্ম্মপীড়া দিবে না। অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিবে না, দরিদ্রের নিকট হইতে অধিক সুদ লইবে না এবং যে কথায় অন্যের উদ্বেগ জন্মে তেমন কথা বলিবে না, কারণ সেরূপ কথায় অমঙ্গল হয় এবং পরলোকে নরক হয়।)

ক্রোধী নাহি হয় যেই ক্রোধ করাইলে।
গালি দিলে যেইজন কিছু নাহি বলে ॥
পর দুঃখে দুঃখী যেই পর উপকারী।
কোমল মধুর বাক্য বলে মৃদু করি ॥

মর্ম্মপীড়া পরেরে না দেয় কোন কালে।
কাপট্য কুবৃত্তিহীন সদা সত্য বলে ॥
নিজ ক্লেশে অপরের করে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান ॥ পৃঃ ৯২

যযাতিরুবাচ।

তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ হ্রীরার্জ্জবং সর্বভূতানুকম্পা।
স্বর্গস্য লোকস্য বদান্তি সন্তো দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্।
নশ্যন্তি মানেন তমোঽভিভূতাঃ পুংসঃ সদৈবতি বর্তান্ত সপ্তঃ ॥ আদি ৭৮।২২

(যযাতি বলিলেন—তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং সর্ব্বভূতে দয়া এই সাতটিই মানুষের স্বর্গলোকের প্রধান দ্বার : এ কথা সাধুগণ বলিয়া থাকেন। আবার মানুষ অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া অভিমান দ্বারা বিনষ্ট হয়, ইহাও সাধুগণ সর্ব্বদা বলেন।)

রাজা বলে তপঃশান্তি দয়া দান ফলে।
এ সব স্বর্গের ভোগ হয় অবহেলে ॥ পৃঃ ৯৪

অপুত্রক বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুতে সত্যবতীর উপদেশ—দীর্ঘতমার উক্তি

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্ ॥ ৩৩
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্ নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পবং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
আদি ৯৮। ৩৩-৩৪

(দীর্ঘতমা বলিলেন—আজ হইতে জগতে আমি স্ত্রীলোকের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিতেছি, যাবজ্জীবন স্ত্রীলোকের পতিই পরম অবলম্বন হইবে। পতি মরিয়া গেলে কিংবা জীবিত থাকিলে স্ত্রী অন্য পুরুষ অবলম্বন করিতে পারিবে না : স্ত্রী অন্য পুরুষ সংসর্গ করিলে পতিত হইবে।)

এত শুনি দীর্ঘতমা কহেন বচন।
অদ্যাবধি এই বিধি করিনু স্থাপন ॥
নারীজাতি জীবিত থাকিবে যতদিন।
ততদিন হয়ে রবে পতির অধীন ॥
পতিবাক্য অবহেলা কভু না করিবে।
প্রাণপণে পতিপ্রিয় কার্য্য আচরিবে ॥
জীবিত থাকিতে পতি অথবা মরণে।
অপর পুরুষে নারী ভাবে যদি মনে ॥
নিরয় গামিনী হবে কহিলাম সার।
পতি ভিন্ন গতি আর নাহি অবলার ॥ পৃঃ ১১১

তস্মৈ পূজাং ততঃ কৃত্বা সুতায় বিধিপূর্ব্বকম্।
পরিস্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রস্নবৈরভিষিচ্য চ।
মুমোচ বাষ্পং দাসেয়ী পুত্রং দৃষ্ট্বা চিরস্য তম্॥ ২৫
তামদ্ভিঃ পরিষিচ্যার্ত্তাং মহর্ষিরভিবাদ্য চ।
মাতরং পূর্ব্বজঃ পুত্রো ব্যাসো বচনমব্রবীৎ॥ ২৬

আদি ৯৯। ২৫-২৬

(তদনন্তর সত্যবতী বহুকালের পর পুত্রকে দেখিয়া, যথাবিধানে স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার সম্মান করিয়া, বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া এবং স্তন্যদুগ্ধে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। প্রথম পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসও আপন কমণ্ডলুস্থিত তীর্থজল দ্বারা স্নেহকাতরা মাতা সত্যবতীকে অভিষিক্ত করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।)

নয়নেতে নীর ঝরে, দুগ্ধ ঝরে স্তনে।
স্তনদুগ্ধে স্নান তবে কৈল তপোধনে॥
মায়ের রোদন দেখি বিস্ময় বদন।
কমণ্ডলু জল মুখে করিল সেচন॥ পৃঃ ১১২

দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে বিদুরের মন্ত্রণা

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥ আদি ১০৯।৩৭

(কারণ বংশ রক্ষার জন্য বংশের একজনকে ত্যাগ করা উচিত এবং গ্রামরক্ষার জন্য সে বংশকেও ত্যাগ করা সঙ্গত। আবার দেশরক্ষার জন্য সে গ্রাম ত্যাগ করাও শ্রেয়, আর আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীই ত্যাগ করা উচিত।)

কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ হিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে॥ পৃঃ ১২৩

পাণ্ডুর শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন

ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে সর্ব্বমানবাঃ।
পিতৃদেবর্ষিমনুজৈর্দেয়ং তেভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ॥ ১৮
এতানি তু যথাকালং যো ন বুধ্যতি মানবঃ।
ন তস্য লোকাঃ সন্তীতি ধর্ম্মবিদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৯
যজ্ঞৈস্তু চ দেবান্ প্রীণাতি স্বাধ্যায়তপসা মুনীন্।
পুত্রৈঃ শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃংশ্চাপি আনুশংস্যেন মানবান্॥ ২০

আদি ১১৪।১৮-২০

(পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি ও মনুষ্য এই চারি জাতির চতুর্ব্বিধ ঋণযুক্ত হইয়াই সমস্ত

মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। অতএব ধর্ম্ম অনুসারে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা মানুষের উচিত। ধর্ম্মজ্ঞেরা নিয়ম করিয়াছেন যে, যে মানুষ যথাসময়ে এই চারিটি ঋণের বিষয় না জানে তাহার স্বর্গলাভ হয় না। যজ্ঞ করিয়া দেব ঋণ হইতে, বেদপাঠ ও তপস্যা করিয়া ঋষি ঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃঋণ হইতে এবং দয়া প্রকাশ করিয়া মনুষ্য ঋণ হইতে মুক্ত হইবে।)

চারি ঋণ লৈয়া মনুষ্য দেহ ধরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে ॥
যজ্ঞ করি দেব ঋণ হইবেক পার।
ঋষি ঋণে তুষিবেক করি ব্রতাচার ॥
পিতৃ ঋণে মুক্ত হয়, পুত্র জন্মিয়া।
মনুষ্য ঋণেতে মুক্ত অতিথি পূজিয়া ॥ পৃঃ ১২৭

নকুল ও সহদেবের জন্ম

যশসোঽর্থায় চৈব ত্বং কুরু কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
প্রাপ্যাধিপাত্যমিন্দ্রেণ যজ্ঞৈরিষ্টং যশোঽর্থিনা ॥
তথা মন্ত্রবিদো বিপ্রাস্তপস্তপ্ত্বা সুদুষ্করম্।
গুরূনভ্যুপগচ্ছন্তি যশসোঽর্থায় ভাবিনি ॥ আদি ১১৮।১১-১২

(তুমি কেবল যশের জন্যই সেই দুষ্কর কার্য কর। দেখ ইন্দ্র স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিয়াও কেবল যশের জন্যই আবার যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কর তপস্যা করিয়াও কেবল যশের জন্যই আবার গুরুসেবা স্বীকার করিয়া থাকেন।)

ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র-অনুসারে ॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপিহ করে তাঁরা গুরুর সেবন ॥ পৃঃ ১৩৩

রঙ্গস্থলে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বন্দ্ব

অর্জুন উবাচ।
অনাহূতোপসৃষ্টানাম্ অনাহূতোপজল্পিনাম্।
যে লোকাস্তান্ হতঃ কর্ণঃ ময়া ত্বং প্রতিপৎস্যসে ॥ আদি ১৩১।১৮

(অর্জুন বলিলেন—যাহারা অনাহূত অবস্থায় আসিয়া সম্মিলিত হয় এবং যাহারা অনাহূত অবস্থায় আসিয়া বলিতে থাকে, তাহাদের যে লোক নির্দ্দিষ্ট আছে, কর্ণ আমি তোমাকে বধ করিলে পর তুমি সেই লোকে যাইবে।)

নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আপনি আসিয়া খায় বিনা নিমন্ত্রণ ॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবি এখন ॥ পৃঃ ১৫৭

কর্ণের অঙ্গরাজ্য লাভ

অঙ্গরাজ্যঞ্চ নার্হস্ত্বমুপভোক্তুং নরাধম।
শ্বা হুতাশসমীপস্থং পুরোডাশমিবাধ্বরে॥ আদি ১৩২।৭

(কুকুর যেমন যজ্ঞের অগ্নির নিকটবর্ত্তী পুরোডাশ (পিষ্টক বিশেষ) ভক্ষণ করিবার যোগ্য হয় না, নরাধম ! তুমিও তেমন অঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার যোগ্য নহ।)

যজ্ঞের নিকটে যদি আগুসরি যায়।
তবু যজ্ঞভাগ হবি কুকুরে কি পায়॥ পৃঃ ১৫৮

ক্ষত্রিয়াণাং বলং জ্যেষ্ঠং যোদ্ধব্যং ক্ষত্রবন্ধুনা।
শূরানাঞ্চ নদীনাঞ্চ দুর্বিদাঃ প্রভবাঃ কিল॥ আদি ১৩২।১১

(ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ ; তারপর ক্ষত্রিয়ের বন্ধুর সহিতও যুদ্ধ করা উচিত, আর, বীরগণ ও নদীগণের উৎপাদক জানাও দুষ্কর।)

শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্র মধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূরত্ব নদীর অন্ত পায় কোন জন॥ পৃঃ ১৫৮

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কণিকের উপদেশ

নাস্যচ্ছিদ্রং পরঃ পশ্যেচ্ছিদ্রেণ পরমন্বিয়াৎ।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ॥ আদি ১৩৫।৮

(নিজের ফাঁক পরে দেখিতে পাইবে না ; পরের ফাঁক পাইয়াই তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে এবং কূর্ম্মের ন্যায় রাজা নিজের অঙ্গ (হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি সৈন্য) সংবৃত রাখিবেন, আর নিজের ফাঁক গুপ্ত রাখিবেন।)

আত্মচ্ছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।
পরচ্ছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত, ক্ষণে ব্যক্ত যথা হয় কূর্ম্ম॥ পৃঃ ১৬৩

পাণ্ডবগণের একচক্রা নগরে বাস ও ব্রাহ্মণ পরিবারের অশান্তি

অন্তঃপুরং ততস্তস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
বিবেশ ত্বরিতা কুন্তী বদ্ধবৎসেব সৌরভী॥ আদি ১৫১। ১৮

(তাহার পর ঘরের ভিতর বাছুর বাঁধা থাকিলে, গরু যেমন সেখানে সত্বর প্রবেশ করে, কুন্তীও সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে সত্বর প্রবেশ করিলেন।)

ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায় ত সুরভি॥ পৃঃ ১৮২

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময় রাজাগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ

ততস্তু ভীমোঽদ্ভুতভীমকর্ম্মা মহাবলো বজ্রসমানসারঃ।
উৎপাট্য দোর্ভ্যাংদ্রুমমেকবীরো নিষ্পত্রয়ামাস যথা গজেন্দ্রঃ॥

আদি ১৮২। ১৭

(তখন অদ্বিতীয় বীব বজ্রের তুল্য শরীর, অত্যন্ত বলবান এবং অদ্ভুত ও ভয়ংকর কার্য্যকারী ভীম বাহু যুগল দ্বারা একটা বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া হস্তীর ন্যায় সেটাকে পত্র শূন্য করিলেন।)

পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর॥
অতি উচ্চ তরুবরে নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্য মধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥ পৃঃ ২২৪

সভাপর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে ময়দানবের উক্তি

অথোত্তরেণ কৈলাসাম্মৈনাকং পর্ব্বতং প্রতি।
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ মহার্মণিময়ো গিরিঃ॥ ৯
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ।
দ্রষ্টুং ভাগীরথীং গঙ্গামুবাস বহুলাঃ সমাঃ॥ ১০
যত্রেষ্টং সর্ব্বভূতানামীশ্বরেণ মহাত্মনা।
আহৃতাঃ ক্রতবো মুখ্যাঃ সহস্রাণি শতানি চ॥ ১১
যত্র যূপা মণিময়াশ্চৈত্যাশ্চাপি হিরণ্ময়াঃ।
শোভার্থং বিহিতাস্তত্র বিচিত্রা মণিমণ্ডিতাঃ॥ ১২
যত্রেষ্ট্বা স গতঃ সিদ্ধিং সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
যত্র ভূতপতিঃ সৃষ্ট্বা সর্ব্বাল্লোকান্ সনাতনঃ।
উপাস্যতে তিগ্মতেজাঃ স্থিতো ভূতৈঃ সহস্রশঃ॥ ১৩
নরনারায়ণৌ ব্রহ্ম যমঃ স্থাণুশ্চ পঞ্চমঃ।
উপাসতে যত্র সত্রং সহস্রযুগপর্য্যয়ে॥ ১৪
যত্রেষ্টং বাসুদেবেন সত্রৈর্বর্ষগণান্ বহূন্।
শ্রদ্দধানেন সততং ধর্ম্মস্য প্রতিপত্তয়ে॥ ১৫
সুবর্ণ মালিনো যূপাংশ্চৈত্যাংশ্চাপ্যতিভাস্বরান্।
দদৌ যত্র সহস্রাণি প্রযুতানি চ কেশবঃ॥ ১৬
তত্র গত্বা স জগ্রাহ গদাং শঙ্খঞ্চ ভারত।
স্ফটিকঞ্চ সভাদ্রব্যং যদাসীদ্বৃষপর্ব্বণঃ॥ ১৭ (কুলকম্)

কিঙ্করৈ সহ রক্ষোভির্য্যদরক্ষন্ মহদ্ধনম্ ।
তদগৃহ্নাম্ময়স্তত্র গত্বা সর্ব্বং মহাসুরঃ ॥ ১৮
তদাহৃত্য চ তাং চক্রে সোঽসুরোঽপ্রতিমাং সভাম্ ।
বিশ্রুতাং ত্রিষু লোকেষু দিব্যাং মণিময়ীং শুভাম্ ॥ ১৯
গদাঞ্চ ভীমসেনায় প্রবরাং প্রদদৌ তদা ।
দেবদত্তঞ্চার্জ্জুনায় শঙ্খপ্রবরমুত্তমম্ ॥
যস্য শঙ্খস্য নাদেন ভূতানি প্রচকম্পিরে ॥ ২০

সভা ৩।৯-২০

(কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরদিকে মৈনাক পর্ব্বতের নিকট স্বর্ণশৃঙ্গ অথচ মহামণিময় বিশাল একটি পর্ব্বত আছে। যে পর্ব্বতে বিন্দুসর নামে সুন্দর একটি সরোবর আছে এবং ভগীরথ রাজা গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন, যে পর্ব্বতে মহাত্মা ভূতনাথ মহাদেব শত শত এবং সহস্র সহস্র প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; যে পর্ব্বতের যজ্ঞস্থানে শোভার জন্য মণিময় যূপ এবং হিরণ্ময় ও মণিমণ্ডিত চত্বর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল ; সে পর্ব্বতে ইন্দ্র যজ্ঞ করিয়া দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন; যে পর্ব্বতে মহাপ্রভাবশালী সনাতন ব্রহ্মা সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করিতে থাকিলে ভূতেরা তাঁহার সেবা করিয়াছিল ; আর নরনারায়ণ ব্রহ্মা যম এবং রুদ্র ইঁহারা সহস্র যুগ পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সে পর্ব্বতে নারায়ণ বিশ্বস্তচিত্তে ধর্ম্ম লাভের জন্য বহু বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; আর তিনি স্বর্ণমালাভূষিত বহুতর যূপ ও দীপ্তিশালী অনেক আয়তন দান করিয়াছিলেন ; সেই পর্ব্বতে যাইয়া ময়দানব গদা, শঙ্খ এবং অসুররাজ বৃষপর্ব্বার স্ফটিকময় সভাদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিল। অসুরগণ কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণ দ্বারা সে প্রচুর ধনরাশি রক্ষা করিতেছিল, ময়দানব সেখানে যাইয়া সে সমস্তই গ্রহণ করিল। এবং তাহা আনিয়া ময়দানব ত্রিভুবন বিখ্যাত স্বর্গীয়মূর্ত্তি, কল্যাণকারিণী এবং মণিময়ী সেই নিরুপমা সভা নির্ম্মাণ করিল। আর সে সেই উৎকৃষ্ট গদাটি ভীমকে এবং দেবদত্ত নামক উৎকৃষ্ট শঙ্খটি অর্জ্জুনকে সমর্পণ করিল। সে শঙ্খের শব্দে সমস্ত প্রাণীই ভয়ে কম্পিত হইত।)

তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান ।
মোর মনোমত সভা না হৈল নির্ম্মাণ ॥
আজ্ঞা কর, যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে ।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে ॥
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি ।
চৌদিক শাসিয়া তথা করিত বসতি ॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ ।
নানারত্ন মণিময় আছে সেই স্থান ॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্যরত্ন ছিল ।
নানা রত্নে নানা শস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল ॥
কৌমোদকী গদাতুল্য পরম সুন্দর ।
বিন্দু সরোবরে এক আছে গদাবর ॥

তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব শোভা ধরে।
সেই গদা সাজিবেক বীর বৃকোদরে॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর॥
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমাতে হয় বিশেষ শোভন॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর, গিয়া আমি আনিব সত্বরে॥ পৃঃ ৩১৯

গোবিন্দ যুধিষ্ঠির সংবাদ

কেচিদ্ধি সৌহৃদাদেব ন দোষং পরিচক্ষতে।
স্বার্থহেতোস্তথৈবান্যে প্রিয়মেব বদন্ত্যেত॥ ৫০
প্রিয়মেব পরীপ্সন্তে কেবলাত্মনি যদ্ধিতম্।
এবং প্রায়শ্চ দৃশ্যন্তে জনবাদাঃ প্রয়োজনে॥ ৫১
সভা ১৪। ৫০-৫১

(কেহ কেহ সৌহার্দ্দ্যবশতঃ দোষের বিষয় বলেন না; আবার অপর কেহ কেহ স্বার্থসাধনের জন্য কেবল প্রিয়বাক্যই বলিতে থাকেন। এবং অন্য কেহ কেহ কেবল নিজের যাহা হিতকর সেই প্রিয় বিষয়টিই চান। প্রভুর প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, লোকের উক্তিগুলি প্রায়ই ওইরূপ দেখা যায়।)

পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে॥ পৃঃ ৩২৬

ভীমার্জ্জুনাবুভৌ নেত্রে মনস্ত্বং মে জনার্দ্দন।
মনশ্চক্ষুর্বিহীনস্য কীদৃশং জীবিতং ভবেৎ॥
সভা ১৬।২

(জনার্দন! ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুইটি নয়ন এবং তুমি আমার মন। সুতরাং মন ও নয়নযুগল শূন্য হইলে আমার জীবনটাই কিরূপ হইবে।)

ভীমার্জ্জুন চক্ষুমম কৃষ্ণ তুমি প্রাণ।
সংকটেতে পাঠাইব, না হয় বিধান॥ পৃঃ ৩২৮

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ

আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানপি।
বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয়তেতি চ॥
সভা ৩২।৩৪

(তোমরা রাজ্যের মাননীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং সকলকেই আনয়ন করিবে।)

দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটীতি ॥ পৃঃ ২৪৭

ইন্দ্রসেনো বিশোকশ্চ পুরুশ্চার্জ্জুনসারথিঃ।
অন্নাদ্যাহরণে যুক্তাঃ সন্তু মৎ প্রিয়কাম্যয়া ॥ সভা ৩২।২৩

(আর ইন্দ্রসেন, বিশোক, পুরু ও অর্জ্জুন সারথি ইহারা চারিজনই আমার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় অন্নপানাদি আনয়ন করিবার জন্য ব্যাপৃত হউক।)

ইন্দ্রসেন ও বিশোক ও অর্জ্জুন সারথি।
তিনজন সংযোগ করহ ভক্ষ্য বিধি ॥ পৃঃ ৩৪৪

স্বয়ং ব্রহ্মত্বমকরোত্তস্য সত্যবতী সুতঃ।
ধনঞ্জয়ানামৃষভঃ সুসামা সামগোঽভবৎ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যো বভূবাথ ব্রাহ্মিষ্ঠোঽধ্বর্য্যুসত্তমঃ।
পৈলোহোতা বসোঃ পুত্রো ধৌম্যেন সহিতোঽভবৎ ॥
সভা ৩২।২৭-২৮

(স্বয়ং বেদব্যাসই সেই যজ্ঞে ব্রহ্মার কার্য্য করিলেন এবং ধনঞ্জয় গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুসামা উদগাতা হইলেন। তৎপরে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য প্রধান অধ্বর্য্যু হইলেন। আর ধৌম্যের সহিত বসুপুত্র পৈলমুনি হোতা হইলেন।)

আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হৈল ধনঞ্জয় তপোধন ॥
হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য মুনি নিয়োজন ॥ পৃঃ ৩৪৯

শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দা

অথবা মন্যসে কৃষ্ণং স্থবিরং কুরুপুঙ্গব।
বসুদেবে স্থিতে বৃদ্ধে কথমর্হতি তৎসুতঃ ॥ ৬
অথবা বাসুদেবোঽপি প্রিয় কামোঽনুবৃত্তিমান্।
দ্রুপদে তিষ্ঠতি কথং মাধবোঽর্হতি পূজনম্ ॥ ৭
আচার্য্যং মন্যসে কৃষ্ণমথবা কুরুপুঙ্গব।
দ্রোণে তিষ্ঠতি বার্ষ্ণেয়ং কথমর্চ্চিতবানসি ॥ ৮
ঋত্বিজং মন্যসে কৃষ্ণমথবা কুরুনন্দন।
দ্বৈপায়নেস্থিতে বৃদ্ধে কথং কৃষ্ণোঽর্চ্চিতস্ত্বয়া ॥ ৯
ভীষ্মে শান্তনবে রাজন্! স্থিতে পুরুষসত্তমে।
স্বচ্ছন্দমৃত্যুকে রাজন! কথং কৃষ্ণোঽর্চ্চিতস্ত্বয়া ॥ ১০
অশ্বত্থাম্নি স্থিতে বীর সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদে।
কথং কৃষ্ণস্ত্বয়া রাজন্! অর্চ্চিত কুরুনন্দন ॥ ১১

দুর্যোধনে চ রাজেন্দ্রে স্থিতে পুরুষসত্তমে।
কৃপে চ ভারতাচার্য্যে কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চ্চিতঃ ॥ ১২
দ্রুমং কিং পুরুষাচার্য্যামতিক্রম্য তথার্চ্চিতঃ।
ভীষ্মকে চৈব দুর্দ্ধর্ষে পাণ্ডুবৎ কৃতলক্ষণে ॥ ১৩
নৃপে চ রুক্মিণী শ্রেষ্ঠে একলব্যে তথৈব চ।
শল্যে মদ্রাধিপে চৈব কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চ্চিতঃ ॥ ১৪
অয়ঞ্চ সর্ব্ব রাজ্ঞাং যে বলশ্লাঘী মহারথঃ।
জামদগ্নস্য দয়িতঃ শিষ্যো বিপ্রস্য ধীমতঃ ॥ ১৫
যেনাত্মবলমাস্থায় রাজানো যুধি নির্জিতাঃ।
তঞ্চ কর্ণমতিক্রম্য কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চ্চিতঃ ॥ ১৬ (যুগ্মবম্)

সভা ৩৬।৬-১৬

(অতএব হে কুরুপুঙ্গব ভীষ্ম ! তুমি যদি কৃষ্ণকে বৃদ্ধ মনে করিয়া থাক, তবে বৃদ্ধ বসুদেব থাকিতে তাহার পুত্র কি করিয়া পূজা পায় ? কিংবা কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের হিতৈষী এবং অনুগত ইহাই যদি মনে করিয়া থাক, তবে দ্রুপদরাজা থাকিতে কৃষ্ণ কি করিয়া পূজা পাইতে পারে ? কেন না, দ্রুপদরাজাও ত' পাণ্ডবগণের হিতৈষী এবং অনুগত, বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধ। অথবা, কুরুপুঙ্গব ! কৃষ্ণকে যদি আচার্য্যই মনে করিয়া থাক, তবে দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণকে কেন পূজা করিলে ? কিংবা কৃষ্ণকে যদি পুরোহিত ভাবিয়া থাক, তবে বৃদ্ধ পুরোহিত বেদব্যাস থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে পূজা করিলে কেন ? রাজা ! মহাবীর এবং সর্বশাস্ত্র বিষারদ অশ্বত্থামা থাকিতে তুমি কি জন্য কৃষ্ণকে পূজা করিলে ? তারপর রাজশ্রেষ্ঠ ও পুরুষপ্রধান দুর্য্যোধন রহিয়াছেন এবং ভরতকুলের গুরু কৃপ রহিয়াছেন, এ অবস্থায় তুমি কি উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে পূজা করিলে ? বহু বীরপুরুষের গুরু দ্রুম রাজাকে এবং তোমাদের পিতা পাণ্ডুরই তুল্য রাজচিহ্নধারী দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে অতিক্রম করিয়া তোমার কৃষ্ণকে পূজা করিবার উদ্দেশ্য কি ? তারপর রাজশ্রেষ্ঠ রুক্মী একলব্য এবং মদ্রাধিপতি শল্য থাকিতে তুমি কি করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিলে ? যিনি সমস্ত রাজগণের মধ্যে আপন বলের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, যিনি মহারথ, যিনি বিচক্ষণ ও সুব্রাহ্মণ পরশুরামের প্রিয় শিষ্য এবং যিনি আপনার বল অবলম্বন করিয়াই যুদ্ধে রাজগণকে জয় করিয়াছেন সেই কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি কারণে কৃষ্ণকে পূজা করিলে ?)

কোনরূপে পূজা যোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর ॥
বল দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে ॥
বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা বর্তমানে পুত্রে পূজা, কোন্ রীতি ॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলে প্রথমে ॥
ঋষি দেখি পূজিবারে যদি কর মন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন ॥

রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধনে ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
যোদ্ধাগণে পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥
শ্রীরামের প্রিয়শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
অশ্বত্থামা কৃপশল্য ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥
গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ দিলে সভার ভিতরে ॥ পৃঃ ৩৭৬

অযুক্তামাত্মনঃ পূজাং ত্বং পুনর্বহু মন্যসে।
হবিষঃ প্রাপ্য নিষ্যন্দং প্রাশিতা শ্বেব নির্জনে ॥ ২৭

* * *

ক্লীবে দারক্রিয়ার্যাদৃগন্ধে বা রূপদর্শনম্।
অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথা তে মধুসূদন ॥

সভা ৩৭।২৭, ২৯

(কিন্তু কৃষ্ণ ! কুকুর যেমন নির্জ্জনে ঘৃতের ধারা পাইয়া, তাহা পান করিয়া আত্মশ্লাঘা করে, তুমিও তেমনই নিজের অযোগ্য পূজা পাইয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ……কৃষ্ণ ! তুমি রাজা নও ; সুতরাং নপুংসকের যেমন ভার্য্যাগ্রহণ, অন্ধের যেমন রূপ দর্শন অথবা দিগ্-দর্শন, তোমারও তেমনই রাজার ন্যায় এই পূজা গ্রহণটা হইয়াছে।)

হে গোপাল ! তব মুখে নাহি দেখি লাজ।
কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ সবার মাঝ ॥
শুনী যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন তেজে অমান্য করিলি রাজগণে ॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হৈল যেন বিভা ॥
অন্ধ স্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত ॥ পৃঃ ৩৭৬

জ্ঞানবৃদ্ধো দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥

সভা ৩৭।১৬

(ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ তিনিই বৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যিনি অধিক বলশালী তিনি বৃদ্ধ, বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহার ধন ও ধান্য অধিক থাকে তিনি বৃদ্ধ, আর শূদ্রগণের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনি বৃদ্ধ।)

বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে পূজা পায় বলবান জন ॥
বৈশ্য মধ্যে পূজা পায় ধনী ধান্য ধনে।
শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে ॥ পৃঃ ৩৭৭

প্রসুপ্তেহি যথা সিংহে শ্বানস্তত্র সমাগতাঃ।
ভষেয়ুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে তথেমে বসুধাধিপঃ ॥

সভা ৩৯।৭

(সিংহ নিদ্রিত হইলে যেমন সমস্ত কুকুর মিলিত হইয়া সেখানে আসিয়া ডাকিতে থাকে, এই রাজারাও তেমনই করিতেছেন।)

এ সব কুকুর সম যত রাজগণ।
ইথে সিংহ প্রায় দেখি দেবকী নন্দন ॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হৈতে নাহি উঠে।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে ॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জয়েকে এ সব অজ্ঞান ॥ পৃঃ ৩৭৮

যদ্যনেন হতা বাল্যে পুতনাচিত্রমত্র কিম্।
তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীষ্ম, যৌ ন যুদ্ধ বিশারদৌ ॥ ৭
চেতনা রহিতং কাষ্ঠং যদ্যনেন নিপাতিতম্।
পাদেন শকটং ভীষ্ম তত্র কিং কৃত্তমদ্ভুতম্ ॥ ৮
বল্মীকমাত্রঃ সপ্তাহং যদ্যনেন ধৃতোঽচলঃ।
তদা গোবর্দ্ধনো ভীষ্ম ! ন তচ্চিত্রং মতং মম ॥ ৯

*　　　*　　　*

যস্য চানেন ধর্ম্মজ্ঞ ! ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ।
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতত্তু মহাদ্ভুতম্ ॥ ১১

সভা ৪০।৭, ৮, ৯, ১১

(ভীষ্ম ! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি পুতনাকে বধ করিয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? এবং যাহারা যুদ্ধে নিপুণ ছিল না সেই অশ্বাসুর ও বৃষাসুরকে যদি বধ করিয়া থাকে, তাহাতেই বা বৈচিত্র্য কি আছে ? তারপর ভীষ্ম ! কৃষ্ণ যদি চরণ দ্বারা চৈতন্যহীন কাষ্ঠময় একখানা শকট ভগ্ন করিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে ? ভীষ্ম ! যাহা কেবল উয়ীর মাটি ছিল, সেই গোবর্ধন পর্ব্বতটীকে, কৃষ্ণ যদি সপ্তাহ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিয়া থাকে, তাহাও আমার মতে আশ্চর্য্য নহে।.........হে ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম ! তবে কৃষ্ণ যাঁহারই অন্নভোজন করিত, সেই কংসকেই বধ করিয়াছেন, এইটা গুরুতর আশ্চর্য্য বটে।)

কৃষ্ণের বড়াই নাহি কর বহুতর।
তাহার মহিমা যত, সবার গোচর ॥

তার আগে কহ, নাহি জানে যেইজন।
স্ত্রীলোক পুতনা যেই করিল নিধন ॥
কাষ্ঠের শকটখানা দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুটা বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া করিল অহংকার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার ॥
সপ্ত দিন গোবর্দ্ধন ধরিল, বলয়।
এ সব তোমার চিত্তে, মোর চিত্তে নয় ॥
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মোর মনে।
বড় বলি কহে যত মূঢ় গোপ জনে ॥
... ...
স্ত্রীলোক পুতনা মারে বৃষ মারে মাঠে।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধঅন্ন পেটে ॥ পৃঃ ৩৭৮

স্ত্রীষু গোষু ন শস্ত্রাণি পাতয়েদ্ ব্রাহ্মণেষু চ।
যস্য চান্নানি ভুঞ্জীত যত্র চ স্যাৎ প্রতিশ্রয়ঃ ॥
সভা ৪০।১৩

(স্ত্রীলোকের উপর, গোরুর উপর, ব্রাহ্মণের উপর আর যাহার অন্ন ভোজন করা হয় এবং যাহার আশ্রয়ে থাকা হয়, তাহাদের উপর অস্ত্রাঘাত করিবে না।)

স্ত্রীলোক গো দ্বিজ, আর অন্ন খাই যার।
এ সকলে কদাচিৎ না করি প্রহার ॥ পৃঃ ৩৭৮

উৎপতন্তন্তু বেগেন জগ্রাহৈ নং মনস্বিনম্।
ভীষ্ম এব মহাবাহুর্মহাসেনমিবেশ্বরঃ ॥
সভা ৪১।১৩

(এ হেন ভীমসেন বেগে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন মহাদেব যেমন কার্ত্তিককে ধরেন, সেইরূপ মহাবাহু ভীষ্মই ভীমকে ধরিলেন।)

দুই হস্ত ধরে তার গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকে ধরিল যথা দেব ত্রিলোচন ॥ পৃঃ ৩৭৯

ক্রীড়তো ভোজরাজস্য এষ রৈবতকেগিরৌ।
হত্বা বধ্বা চ তান্ সর্ব্বানপায়াৎ স্বপুরং প্রতি ॥ ৮
অশ্বমেধেহয়ং মেধ্যমুৎসৃষ্টং রক্ষিভির্বৃতম্।
পিতুর্মে যজ্ঞবিঘ্নার্থমহরৎ পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ৯
সৌবীরান্ প্রতি যাতাশ্চ বভ্রোরেষ যশস্বিনঃ।
ভার্য্যামভ্যহরন্মোহাদকামাং তামিতো গতাম্ ॥ ১০
এষ মায়া প্রতিচ্ছন্নঃ করূষার্থে তপস্বিনীম্।
জহার ভদ্রাং বৈশালীং মাতুলস্য নৃশংসবৎ ॥ ১১

পিতৃষ্বসুঃকৃতে দুঃখং সুমহন্মর্ষয়াম্যহম্ ।
দিষ্ট্যা ত্বিহ মহীপানাং সন্নিধাবদ্য বর্ত্ততে ॥ ১২
পশ্যন্তি হি ভবন্তোঽদ্য মধ্যতীবব্যতিক্রমম্ ।
কৃতানি তু পরোক্ষং মে যানি তানি নিবোধত ॥ ১৩
সভা ৪৪ । ৮-১৩

(ভোজরাজ রৈবতক পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় এই দুরাত্মা যাইয়া তাঁহার সহচরদিগকে যথা সম্ভব হত্যা ও বন্ধন করিয়া আপন রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছিল। আমার পিতৃদেব অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য একটি অশ্বকে রক্ষী-পরিবেষ্টিত করিয়া ছাড়িয়া দেন ; তখন পাপাত্মা সেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য সেই মেধ্য অশ্বটিকে অপহরণ করিয়াছিল। যশস্বী বভ্রুর ভার্যা দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়া সৌবীরদেশে যাইতেছিলেন, তখন এই দুরাত্মা সেই অকামা মহিলাটিকে অপহরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া করূষরাজের জন্য মাতুলের কন্যা এবং বিশালবাজার মহিষী নিঃসহায়া ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি এযাবৎ পিসীমার জন্যই এই সকল গুরুতর দুঃখ সহ্য করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু আজ সেই দুরাত্মা শিশুপাল এই রাজাদের নিকটে অবস্থান করিতেছে। আর, আজ আমার উপরে যে গুরুতর ব্যতিক্রম করিল, তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিলেন এবং আমার অসমক্ষে যে সকল ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও শুনিলেন।)

এই দুষ্ট শুনিলেক, আমি নাহি ঘরে ।
সসৈন্যে যাইল দুষ্ট দ্বারকা নগরে ॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত পর্ব্বতে ।
মাতুলের উপরোধ না ধরিল চিতে ॥
লুঠিয়া দ্বারকাপুরী গেল দুরাশয় ।
কহ শুনি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয় ॥
তবে কতদিন পিতা অশ্বমেধ কৈল ।
সংকল্প করিয়া যজ্ঞ তুরঙ্গ ছাড়িল ॥
যদুগণে নিয়েছিল অশ্বের রক্ষণে ।
ঘোড়া হরি লয়ে গেল এই ত' দুর্জ্জনে ॥
ইহার অন্তরে তবে শুন সর্ব্বজনে ।
সৌবীরেতে মহোৎসব হৈল কতদিনে ॥
বভ্রু নামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী ।
তারে বলে হরি নিল এই পাপমতি ॥
আরো কহি শুন সবে এ দুষ্ট কাহিনী ।
ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদব নন্দিনী ॥
বসুরাজে বরেছিল সেই ত কন্যায় ।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবন্ধ মায়ায় ॥

মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি নিয়া গেল এই দুরাচার॥
ইত্যাদি যতেক দোষ, কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
শুধু পিতৃস্বসা সহ সত্যের কারণ॥
সাক্ষাতে শুনিলে সবে, যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলে যে, এই ভাল হৈল॥ পৃঃ ৩৮৩

রুক্মিণ্যামস্য মূঢ়স্য প্রার্থনাসীন্মুমূর্ষতঃ।
ন চ তাং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ঃ শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাদি ততঃ সর্ব্বে সহিতাস্তে নরাধিপাঃ॥
বাসুদেবচ শ্রুত্বা চৌদরাজং ব্যগর্হয়ন্॥ ১৬
সভা ৪৪।১৫-১৬

(এই মুমূর্ষু মূর্খটার রুক্মিণীকে লাভ করিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু শূদ্র যেমন বেদবাক্য শুনিতে পারে না, এ মূর্খও তেমন রুক্মিণীকে লাভ করিতে পারে নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, কৃষ্ণের এইরূপ উক্তিগুলি শুনিয়া রাজারা সকলে মিলিয়া শিশুপালকে বিশেষভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন।)

আর শুন রাজগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপ সুতা॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন॥
শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায়।
হবির্ভাগ চণ্ডালেতে কভু নাহি পায়॥
এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপালে নিন্দা করে যত রাজাগণ॥

পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত দুর্য্যোধনের ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উক্তি

দুর্য্যোধন উবাচ।
যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহু শ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসানিব॥
সভা ৫৩।১

(দুর্য্যোধন বলিলেন—যে ব্যক্তির নিজের প্রখর বুদ্ধি নাই, অথচ কেবল বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বোঝে না। যেমন হাতা ডালের ভিতর ডুবিয়া থাকিয়াও তার রস বোঝে না।)

দুর্য্যোধন বলে, পিতা প্রজ্ঞাবান নহি।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্রকথা কহি॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ॥ পৃঃ ৩৯০

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি

মহারাজ! বিজানীহি যত্ত্বাং রক্ষ্যামি ভারত।
মুমূর্ষৈরৌষধমিব ন রোচেতাপি তচ্ছ্রুতম্॥
সভা ৫৯।২

(হে ভরত নন্দন মহারাজ! আমি যাহা বলিব তাহা শ্রবণ করুন। অথবা মুমূর্ষ ব্যক্তির ঔষধে যেমন রুচি হয় না, সেই রূপ হয়ত আমার বাক্যেও আপনার রুচি হইবে না।)

আমি যত বলি, তব মন নাহি চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যথা ঔষধ না খায়॥ পৃঃ ৩৯৩

মধু বৈ মাধিবকো লব্ধা প্রপাতং নৈব বুধ্যতে।
আরুহ্য তং মজ্জতি বা পতনং বাধিগচ্ছতি॥
সভ ।৫৯।৫

(মধু ব্যবসায়ী লোক মধু দেখিয়া অত্যুচ্চ স্থানের অবস্থা বোঝে না, তাহার পর সেখানে আরোহণ করিয়া হয় বিষে মগ্ন হয় না হয় পড়িয়া যায়।)

মধু হেতু মধু লোভী উঠে বৃক্ষোপরে॥
নাহিক পতন ভয় পতন কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন॥ পৃঃ ৩৯৩

কাকেনেমাংশ্চিত্রবর্হান্ শার্দ্দূলান্ ক্রোষ্টুকেন চ।
ক্রীণিষ্ব পাণ্ডবান্ রাজন্! মা মজ্জী শোকসাগরে॥
সভা ৫৯।১০

(রাজা! আপনি কাকরূপ দুর্য্যোধনকে দিয়া এই ময়ূরস্বরূপ পাণ্ডবগণকে ক্রয় করুন এবং শৃগালস্বরূপ দুর্য্যোধনকে দিয়া এই শার্দ্দূলস্বরূপ পাণ্ডবগণকে ক্রয় করুন, শোক সাগরে মগ্ন হইবেন না।)

নির্ভয়ে পরম সুখে থাকহ নৃপতি।
কাক হস্তে ময়ূরের না কর দুর্গতি॥
শিবাহস্তে সিংহের না কর অপমান।
শোকসিন্ধু মধ্যে রাজা না কর প্রয়াণ॥ পৃঃ ৩৯৩

দ্রৌপদীকে আনিতে প্রাতিকামীর গমন

অয়ং ধত্তে বেণুরিবাত্মঘাতী ফলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ।
দ্যূতং হি বৈরায় মহাভয়ায় মত্তো ন বুধ্যত্যয়মন্তকালে॥
সভা ৬৩।৫

(হায়, বাঁশ যেমন নিজের মৃত্যুর জন্য ফল ধারণ করে, এই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রও সেইরূপ নিজের মৃত্যুর জন্য দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া ধন লাভ করিয়াছে। কারণ দ্যূতক্রীড়াটা মহাভয়জনক শত্রুতার জন্যই হইয়া থাকে, ইহা কিন্তু মৃত্যুকালে এই মত্ত বেটা বুঝিতেছে না।)

এই বৃদ্ধ অন্ধরাজ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন, নাহি দেখে পাছে ॥
নিকটে আসিল মৃত্যু, কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ ॥ পৃঃ ৩৯৮

দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনয়ন

যে রাজসূয়াবভৃথে জলেন মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ।
তে পাণ্ডবানাং পরিভূয় বীর্য্যং বলাৎ প্রমৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রজেন ॥
আদি ৬৪।২৯

(যে কেশকলাপ রাজসূয় মহাযজ্ঞে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, দুঃশাসন পাণ্ডবগণের বলকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্ব্বক সেই কেশকলাপ ধারণ করিয়াছিল।)

যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয় ॥
তাহা ধরি দুঃশাসন আনে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী ॥ পৃঃ ৪০১

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের উক্তি

ভীম উবাচ।

ভবন্তি দেশে বন্ধক্যঃ কিতবানাং যুধিষ্ঠির।
ন তাভিরুত দীব্যন্তি দয়া বৈবাস্তি তাস্বাপি ॥
সভা ৬৫।১

(ভীম বলিলেন—মহারাজ! যুধিষ্ঠির! দেশে দ্যূতকারদিগের বেশ্যা থাকে, তাহারা, তাহাদের দ্বারাও খেলা করে না। কারণ তাহাদের উপরেও তাহাদের দয়া থাকে।)

কপটে জুয়ারী করিয়াছে বহু জন।
তা সবার বশীভূত থাকে নারীগণ ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন ॥ পৃঃ ৪০৩

কর্ণ উবাচ।

দৃশ্যন্তে বৈ বিকর্ণে হি বৈকৃতানি বহূন্যপি।
তজ্জাতস্তদ্বিনাশায় যথাগ্নিররণিং প্রজঃ ॥
সভা ৬৫।২৭

(কর্ণ কহিলেন—বিকর্ণে বহুতর বিকার দেখা যাইতেছে। সুতরাং অরণি কাষ্ঠজাত

অগ্নি যেমন তাহার বিনাশের জন্যই জন্মিয়া থাকে, তেমন এই বিকর্ণজাত বিকারগুলিও উহার বিনাশের জন্যই জন্মিয়াছে।)

বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণ ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নিকাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥ পৃঃ ৪০৪

মন্যসে বা সভামেতামানীতামেকবাসসম্।
অধর্ম্মেণেতি তত্রাপি শৃণু মে বাক্যমুত্তমম্॥ ৩৪
একো ভর্ত্তা স্ত্রিয়া বেদৈর্বিহিতঃ কুরুনন্দন।
ইয়ন্ত্বনেকবশগা বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা॥ ৩৫
অস্যাঃ সভামানয়নং ন চিত্রমিতি মে মতিঃ।
একাম্বর ধরত্বং বাপ্যথবাপি বিবস্ত্রতা॥ ৩৬
সভা ৬৫।৩৪-৩৬

(অথবা তুমি যদি মনে কর যে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে অধর্ম্মানুসারেই সভায় আনয়ন করা হইয়াছে, সে বিষয়েও আমার উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ কর। স্ত্রীলোকের একটি মাত্র ভর্ত্তাই বেদে বিহিত আছে; কিন্তু দ্রৌপদী অনেক ভর্ত্তার অধীন, সুতরাং উহাকে বেশ্যা বলিয়াই নিশ্চয় করা যায়। অতএব একবস্ত্রাই হউক কিংবা বিবস্ত্রাই হউক উহাকে সভায় আনয়ন করা আশ্চর্য্যের বিষয় হয় নাই; ইহাই আমার ধারণা।)

আর যে কহিলা কৃষ্ণা একবস্ত্রা হয়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না জুয়ায়॥
বহু ভর্ত্তা যার তার কিবা ভয় লাজ।
তাহার কিসের লজ্জা আসিতে সমাজ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী বিধান করিল॥
দুই স্বামী হৈলে বলি দ্বিচারিনী তায়।
পঞ্চস্বামী হৈলে তার সতীত্ব কোথায়॥ পৃঃ ৪০৪

কর্ণ উবাচ।

এয়ঃ কিলেমেহ্যধনা ভবন্তি দাসঃ শিষ্যশ্চাস্বতন্ত্রা চ নারী।
দাসস্য পত্নী ত্বধনস্য ভদ্রে! হীনেশ্বরা দাসধনঞ্চ সর্ব্বম্॥ ১
প্রবিশ্য রাজ্ঞঃ পরিবারং ভজস্ব তত্তে কার্য্যং শিষ্টমাদিশ্যতেঽত্র।
ঈশাস্তু সর্ব্বে তব রাজপুত্রি! ভবন্তি বৈ ধার্ত্তরাষ্ট্রা না পার্থাঃ॥ ২
সভা ৬৮।১-২

(কর্ণ বলিলেন—ভদ্রে! ক্রীতদাস, পুত্র এবং ভার্য্যা ইহারা তিনজন আপন আপন লব্ধ ধনেও স্বত্বহীন থাকে। সুতরাং আপনার ভার্য্যার উপরেও ক্রীতদাসের স্বত্ব থাকে না। অতএব রাজনন্দিনি! তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজার পরিবারবর্গের সেবা

কর ; শাস্ত্রানুমোদিত সেই কর্ম্মই তোমাকে আদেশ করিতেছি। এখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাই তোমার প্রভু, কিন্তু পাণ্ডবেরা নহে।)

তিনজন ধনের উপর প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য, শাস্ত্রে হেন কহে ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির, তুই ভার্য্যা তার।
দাসভার্য্যা দাসী হয়, বিদিত সংসার ॥
দাসী হৈলে, দাসী কর্ম্ম কর যথোচিত।
প্রবেশহ ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে ত্বরিত ॥ পৃঃ ৪০৯

একমাহুর্বৈশ্যববং দ্বৌ তু ক্ষত্রস্ত্রিয়ো বরৌ।
এয়স্তু রাজ্ঞো রাজেন্দ্র ! ব্রাহ্মণস্য শতং বরা ॥
সভা ৬৮।৩৫

(কারণ মহারাজ ! বৈশ্য একটি বর, ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী দুইটি বর, ক্ষত্রিয় তিনটি বর এবং ব্রাহ্মণ একশত বর গ্রহণ করিতে পারেন, এ কথা মুনিরা বলিয়া থাকেন।)

বৈশ্য মাগিবেক সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥ পৃঃ ৪১২

বন পর্ব্ব

বনবাস গমনের প্রাক্‌কালে দ্বিজগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষ পরমং সুখম্।
তস্মাৎ সন্তোষমেবেহ পরং পশ্যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥
বন ২।৪৪

(মূর্খেরা ইচ্ছানুরূপ অর্থ পাইলেও অসন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট হন। ধনতৃষ্ণার অবসান নাই, অতএব যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়াই সুখ, অতএব জ্ঞানীরা সন্তোষটাকেই প্রধান মনে করেন।)

যাবৎ শরীরে প্রাণ, তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান অস্ত্রে কাটে ॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্র সম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানীগণ ॥ পৃঃ ৪২৯

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং স্থিত শ্রান্তস্য চাসনম্ ।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্ ॥ ৫৩
চক্ষুর্দদ্যান্মনো দদ্যাদ্বাচং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।
প্রত্যুত্থায়াভিগমনং কুর্য্যান্ন্যায়েন চার্চ্চনম্ ॥ ৫৪
বন ২।৫৩-৫৪

(পীড়িত লোক আসিলে তাহাকে শয্যা দিতে হইবে। কেহ পরিশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে আসন দিতে হইবে, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল দিতে হইবে এবং ক্ষুধার্ত্ত লোককে অন্নদান করিতে হইবে। কেহ উপস্থিত হইলে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যুদ্গমন করিবে, প্রসন্ন নয়নে দৃষ্টিপাত করিবে, মনটিকে প্রসন্ন রাখিবে, মধুর বাক্যে আলাপ করিবে, উঠিয়া বসিবার আসন দিবে, এবং যথাযোগ্য সেবা করিবে।)

তৃষ্ণাতুরে জল দিবে, ক্ষুধার্ত্তে ভোজন ।
নিদ্রাতুরে শয্যা দিবে, পথিকে আসন ॥
অতিথি আসিলে দ্বারে করিবে যতন ।
আগুসরি উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ ॥ পৃঃ ৪৩০

যুধিষ্ঠিরের ও বিদুরের কথোপকথন (বনবাসের প্রাক্‌কালে)

পরং শ্রেয়ঃ পাণ্ডবেয়াময়োক্তং ন মে তচ্চ শ্রুতবানাম্বিকেয়ঃ ।
যথাতুরস্যেব হি পথ্যমন্নং ন রোচতে স্মাস্য তদুচ্যমানম্ ॥ ১৪
ন শ্রেয়সে নীয়তেঽজাতশত্রোঃ স্ত্রী শ্রোত্রিয়স্যেব গৃহে প্রদুষ্টা ।
ধ্রুবং ন রোচেদ্ভরতর্ষভস্য পতিঃ কুমার্য্যা ইব ষষ্ঠিবর্ষঃ ॥ ১৫
বন ৬।১৪-১৫

(পাণ্ডবগণ ! আমি অত্যন্ত মঙ্গল কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আমার সে কথা শ্রবণ করেন নাই। কারণ রোগার্ত্তের যেমন হিতকর পথ্যে রুচি হয় না, ধৃতরাষ্ট্রের তেমন আমার কথায় রুচি হয় নাই। যুধিষ্ঠির ! শ্রোত্রিয়ের ঘরে দুষ্ট স্ত্রীকে যেমন ভালর দিকে নেওয়া যায় না, ধৃতরাষ্ট্রকেও তেমন ভালর দিকে নেওয়া যায় নাই। কারণ কুমারীর যেমন ষষ্ঠিবর্ষ পতির প্রতি রুচি হয় না, ধৃতরাষ্ট্রেরও তেমন আমার কথার প্রতি রুচি হয় নাই।)

যতেক কহিনু আমি, সবাকার হিত ।
অন্ধরাজা শুনিয়া বুঝিল বিপরীত ॥
রোগীর যেমন হিত পথ্য নাহি রুচে ।
যুবনারী, বৃদ্ধপতি যথা নাহি ইচ্ছে ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আমারে বলিল কুবচন ।
যাও বা থাক তোমা নাহি প্রয়োজন ॥ পৃঃ ৪৩২

বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথন

সোঽঙ্কমানীয় বিদুরং মূর্দ্ধণ্যাঘ্রায় চৈব হি ।
ক্ষম্যতামিতি চোবাচ যদুক্তাঽসি ময়াঽনঘ ॥ ২১

বিদুর উবাচ।

ক্ষান্তমেব ময়া রাজন্! গুরুর্মে পরমো ভবান্।
এষোঽহমাগতঃ শীঘ্রং ত্বদ্দর্শন পরায়ণঃ॥ ২২

*　　*　　*

পাণ্ডোঃ সুতা যাদৃশা মে তাদৃশাস্তব ভারত!
দীনা ইতীব মে বুদ্ধিরভিপন্নাদ্য তান্ প্রতি॥ ২৪

বন ৭।২১-২২, ২৪

(ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন—হে নিষ্পাপ বিদুর! আমি তোমাকে যে কটুবাক্য বলিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর। বিদুর বলিলেন—মহারাজ! আপনি আমার পরম গুরু, সুতরাং আমি পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি। তাই আমি আপনাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সত্বর আসিয়াছি।……ভরতনন্দন! আমার নিকট পাণ্ডুর পুত্রগণও যেমন, আপনার পুত্রগণও তেমন, তবে পাণ্ডুর পুত্রগণ এখন দীনভাবাপন্ন, তাই আমার বুদ্ধি তাহাদের দিকে গিয়াছে।)

বিদুর আইল, রাজা শুনিল তখন।
শিরেতে চুম্বন করি দিল আলিঙ্গন॥
বলিল, পূর্ব্বের দোষ ক্ষমহ আমার।
এত বলি অনেক করিল পুরস্কার॥
বিদুর বলেন, রাজা হইলাম ক্ষান্ত।
আপনি আমার গুরু পরম সম্ভ্রান্ত॥
আপনি করুন ক্ষমা, ইহা আমি চাই।
আজ্ঞা ছাড়া হতে কভু মম শক্তি নাই॥
যেমন তোমার পুত্র পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু তারা দুঃখী মোর ইথে পড়ে মন॥ পৃঃ ৪০৩

শকুনি প্রভৃতিকে দুর্য্যোধনের উক্তি

অথ পশ্যাম্যহং পার্থানপ্রাপ্তানিহ কথঞ্চন।
পুনঃ শোষং গমিষ্যামি নির্ব্বসুর্নিরনুগ্রহঃ॥ ৫
বিষমুদ্বন্ধনঞ্চৈব শস্ত্রমগ্নি প্রবেশনম্।
করিষ্যে নহি তামৃদ্ধান্ পুনর্দ্রষ্টুমিহোৎসহে॥ ৬

বন ৮।৫-৬

(আমি যদি পাণ্ডবগণকে কোনপ্রকারে আবার এইখানে উপস্থিত দেখি, তবে নির্ধন ও পিতার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া আবার শুষ্ক হইয়া যাইব। এবং তাহা হইলে আমি বিষভক্ষণ, উদ্বন্ধন, অস্ত্রাঘাত, কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব। কারণ আমি পুনরায় পাণ্ডবগণকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিতে পারিব না।)

পুনঃ যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব।
নিশ্চিত আমার বাক্য কহি শুন সব॥
গরল খাইব, কিংবা প্রবেশিব জলে।
অথবা ত্যজিব প্রাণ অস্ত্রে বা অনলে॥ পৃঃ ৪০৪

যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের কথোপকথন

কৃষ্ণের উক্তি

মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।
সস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু॥
বন ১১।৪৫

(অর্জুন ! তুমি আমারই, আমিও তোমারই, সুতরাং যাহা আমার, তাহা তোমারই, যে তোমাকে বিদ্বেষ করে, সে আমাকেও বিদ্বেষ করে এবং যে তোমার অনুগত সে আমারও অনুগত।)

যে তোমারে দ্বেষ করে, সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে, সে আমারে করে॥
তুমি হও আমার হে, আমি হে তোমার।
যে জন তোমার পার্থ, সে জন আমার॥ পৃঃ ৪৩৯

কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি

কথং নু ভার্য্যা পার্থনাং তব কৃষ্ণ ! সখী বিভো।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী॥ ৬২
স্ত্রীধর্ম্মিণী বেপমানা শোণিতেন সমুক্ষিতা।
একবস্ত্রো বিকৃষ্টাস্মি দুঃখিতা কুরুসংসদি॥ ৬৩
রাজ্ঞাং মধ্যে সভায়ান্তু রজসাভি পরিপ্লুতা।
দৃষ্ট্বা চ মাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রাহসন্ পাপচেতসঃ॥ ৬৪
দাসীভাবেন মাং ভোক্তুমীষীস্তে মধুসূদন।
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পাঞ্চালেষু চ বৃষ্ণিষু॥ ৬৫
বন ১১।৬২-৬৫

(কৃষ্ণ ! প্রভু ! পাণ্ডবগণের ভার্য্যা, তোমার সখী এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী আমার মত নারীকে কি করিয়া সভায় আকর্ষণ করিয়া নিতে পারে ? আমি লজ্জিতা, কম্পিতা, রজস্বলা, এবং একবস্ত্রা, এই অবস্থায় কৌরবসভায় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি রক্তাক্ত অবস্থায় রাজাদের মধ্যে গিয়াছিলাম, তখন পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। মধুসূদন ! পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালগণ এবং বৃষ্ণি বংশীয়গণ জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা আমাকে দাসী ভাবে ভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল।)

পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তব প্রিয় সখা আমি অর্জ্জুন ভামিনী॥
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্ভাষা কহিল যত, কহনে না যায়॥
স্ত্রী ধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
অনাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি॥

বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জিতে।
বিধিমতে দাস্যকর্ম্ম বলিল করিতে॥ পৃঃ ৪৩৯

ধিগ্বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ গাণ্ডীবম্।
যৌ মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈর্মর্ষয়েতাং জনার্দ্দন॥
বন ১১।৬৮

(অতএব জনার্দ্দন! ভীমের বাহুবলকে ধিক্ অর্জ্জুনেরও গাণ্ডীবকে ধিক্, যাঁহারা ক্ষুদ্র কর্তৃক আমার উৎপীড়ন অবাধে সহ্য করিয়াছিলেন।)

ধিক্ ধিক্ ভীম বীর, ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয়॥ পৃঃ ৪৩৯

আত্মা হি জায়তে তস্যাং তস্মাজ্জায়া ভবত্যুত।
ভর্ত্তা চ ভার্য্যয়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্মমোদরে॥ ৭১
নন্বিমে শরণং প্রাপ্তং ন ত্যজন্তি কদাচন।
তেষাং শরণমাপন্নাং নান্বপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ॥ ৭২
বন ১১।৭১-৭২

(তারপর যেহেতু ভর্ত্তা নিজে ভার্য্যার উদরে জন্মিয়া থাকেন, সেই হেতু ভার্য্যার নাম হইয়াছে 'জায়া'। আবার 'ভর্ত্তা' কি করিয়া আমার উদরে জন্মিবেন! ইহা ভাবিয়া ভার্য্যাও ভর্ত্তাকে রক্ষা করিবেন। কৃষ্ণ! ইহারা কখনও শরণাগত লোককে পরিত্যাগ করেন না, অথচ আমি তখন শরণাগত হইয়াছিলাম, তাহাতে ইহারাই আমাকে রক্ষা করেন নাই।)

পুত্ররূপে জন্মে লোকে ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে॥
ভার্য্যা ভীতা হয়ে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয়, তারে করয়ে রক্ষণ॥
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে।
কেন এরা রক্ষা নাহি করিল আমারে॥ ৪৪০

নাধিজ্যমপি যচ্ছক্যং কর্ত্তুমন্যেন গাণ্ডীবম্।
অন্যত্রার্জ্জুনভীমাভ্যাং ত্বয়া বা মধুসূদন॥ ৭৮
ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ পৌরুষম্।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ! মুহূর্ত্তমপি জীবতি॥ ৭৯ (যুগ্মকম্)
বন ১১।৭৮-৭৯

(মধুসূদন! তুমি, ভীম ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কোন লোকই যে ধনুতে গুণ আরোপণও করিতে পারে না, সেই গাণ্ডীবধনু ও ভীমের বলকে ধিক্ এবং অর্জ্জুনের পুরুষকারকেও ধিক্। কারণ সেগুলি থাকিতে দুর্য্যোধন মুহূর্তকালও জীবিত রহিতেছে।)

গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে॥
ধনঞ্জয় কিংবা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহি নাহি বুঝি আমি॥
ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন॥ পৃঃ ৪৪০

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন॥ ১২৬
*　　　*　　　*
চতুর্ভি কারণৈঃ কৃষ্ণ! ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।
সম্বন্ধাৎ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব॥ ১২৮
বন ১১।১২৬, ১২৮

(মধুসূদন! আমার পতিরা নাই, পুত্রেরা নাই, বান্ধবেরা নাই, ভ্রাতারা নাই, পিতা নাই এবং তুমিও নাই।……কৃষ্ণ! কেশব! সম্পর্ক, গুরুত্ব, সখিত্ব ও প্রভুত্ব এই চারিটি কারণেই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।)

পুনঃ গদগদ বাক্যে বলয়ে পার্ষতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা, নাহি মোর পতি॥
*　　　*　　　*
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে।
দাসী জ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে॥ পৃঃ ৪৪০

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কথোপকথন

দান্তং যচ্চ সভামধ্যে আসনং রত্নভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা কুশবৃষীঞ্চেমাং শোকোমাং দারয়ত্যয়ম্॥ ১১
যদপশ্যং সভায়াং ত্বাং রাজভিঃ পরিবারিতম্।
তশ্চ রাজন্যপশ্যন্ত্যাঃ কা শান্তির্হৃদয়স্য মে॥ ১২
যা ত্বাহং চন্দনাদিগ্ধমপশ্যং সূর্য্যবর্চ্চসম্।
সা ত্বাং পঙ্কমলাদিগ্ধং দৃষ্ট্বা মুহ্যামি ভারত॥ ১৩
বন ২৪।১১-১৩

(সভার মধ্যে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত এবং নানা রত্ন বিভূষিত আপনার যে আসন ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া এবং এই কুশময় আসন দেখিয়া, আমি শোকে বিদীর্ণ হইতেছি। আমি আপনাকে সভার মধ্যে যে রাজগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে তাহা দেখিতেছি না; সুতরাং আমার মনে কি শান্তি আছে। ভরতনন্দন! আমি যে আপনাকে চন্দনলিপ্ত এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দেখিয়াছি, সেই আমিই আপনাকে ধূলিলিপ্ত দেখিয়া মোহিত হইতেছি।)

রতনে ভূষিত শয্যা, নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
কস্তুরী চন্দনে তব লিপ্ত কলেবর।
এখন সে তনু হায় ধূলায় ধূসর ॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে ॥ পৃঃ ৪৭৩

দ্রুপদস্য কুলে জাতাং স্নুষাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনীং বীরপত্নীমনুব্রতাম্।
মাং বৈ বনগতাং দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব ॥ ৩৪
নূনঞ্চ তব বৈ নাস্তি মন্যুর্ভরতসত্তম।
যত্তে ভ্রাতৃংশ্চ মাঞ্চৈব দৃষ্ট্বা ন ব্যথতে মনঃ ॥ ৩৫
ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তি লোকে নির্ব্বচনং স্মৃতম্।
তদদ্য ত্বয়ি পশ্যামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ ॥ ৩৬

বন ২৪।৩৪-৩৬

(তারপর আমি দ্রুপদের বংশে জন্মিয়াছি, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, বীরগণের পত্নী এবং তাঁহাদের অনুকূলা; এ অবস্থায় আমাকেও বনবাসিনী দেখিয়া কেন আপনি ক্ষমা করিতেছেন? ভরত শ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আপনার ক্রোধ নাই, যেহেতু ভ্রাতৃগণকে এবং আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়াও আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না। ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নাই, এই যে জগতে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে তাহা আজ আপনাতে বিপরীতের ন্যায় দেখিতেছি।)

ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ আমি তব রাণী ॥
মম দুঃখ দেখি হৃদি তাপ নাহি হয়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥ পৃঃ ৪৭৪

ভীমসেনার্জ্জুনৌ চেমৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ।
ত্যজেস্ত্বমিতি মে বুদ্ধির্ন তু ধর্ম্মং পরিত্যজেঃ ॥ ৭

* * *

অনন্যা হি নরব্যাঘ্র! নিত্যদা ধর্ম্মৈব তে।
বুদ্ধিঃ সততমন্বেতি চ্ছায়েব পুরুষং নিজা ॥ ৯

বন ২৮।৭, ৯

(তারপর আমার ধারণা যে, আমার সহিত এই ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবকেও আপনি ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারেন না। ....নরশ্রেষ্ঠ নিজের ছায়া যেমন নিজে অনুসরণ করে। সেইরূপ আপনার বুদ্ধি অন্য বিষয়ে যায় না, নিত্য সর্ব্বদাই ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে।)

চারি ভাই আমাকে পারহ ত্যজিতে ॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন্ ।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন ॥ পৃঃ ৪৭৫

তিলে তৈলং গবি ক্ষীরং কাষ্ঠে পাবকমন্ততঃ ।
ধিয়া ধীরো বিজানীয়াদুপায়ঞ্চাস্য সিদ্ধয়ে ॥

বন ২৮।২৭

(বুদ্ধিমান লোকে প্রথমে তিলের ভিতর তৈল, গরুর ভিতরে দুধ এবং কাঠের ভিতরে আগুন আছে বলিয়া বুদ্ধি দ্বারা জানে পরে ঐ সকল লাভ করিবার উপায় স্থির করে।)

কাষ্ঠ হৈতে অগ্নি যেন, তৈল হয় তিলে ॥
বহুবিধ কর্ম্ম লোক করয়ে সংসারে ।
কর্ম্ম অনুসারে ফল না হয় তাহারে ॥ পৃঃ ৪৭৭

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য

ভীমের উক্তি

তৃণাণাং মুষ্টিনৈকেন হিমবন্তঞ্চ পর্ব্বতম্ ।
ছন্নমিচ্ছসি কৌন্তেয় ! যোঽস্মান্ সংবর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ২৩

বন ৩১।২৩

(রাজা ! আপনি যে অজ্ঞাতবাসের সময় আমাদিগকে গুপ্ত রাখিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা যেন একমুষ্টি তৃণ দ্বারা হিমালয় পর্ব্বতকে আবৃত করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।)

বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন্ মতে ।
মহেন্দ্র পর্ব্বত চাহ তৃণে লুকাইতে ॥ পৃঃ ৪৭৯

নলদময়ন্তী কাহিনী

নলের প্রতি দময়ন্তী

যদি ত্বং ভজমানাং মাং প্রত্যাখ্যাস্যসি মানদ ।
বিষমগ্নিং জলং রজ্জুমাস্থাস্যে তব কারণাৎ ॥

বন ৪৬।৬০

(মানদ ! আমি আপনার প্রতি অনুরক্তা, এই অবস্থায় আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি—আপনার জন্যই বিষ, অগ্নি, জল এবং রজ্জু ইহার একটি অবলম্বন করিয়া আত্মহত্যা করিব।)

কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি ।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মোর গতি ॥ পৃঃ ৪৯৬

ছায়াদ্বিতীয়ো ম্লানস্রগ্রজঃ স্বেদসমন্বিতঃ।
ভূমিষ্ঠোনৈষধশ্চৈব নিমেষেণ চ সূচিতঃ॥

বন ৪৭।২৫

(আর, অপর ব্যক্তির শরীরের ছায়া আছে, মালা মলিন হইয়াছে, অঙ্গে ধূলি ও ঘর্ম্ম আছে এবং তিনি ভূতল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন ; তাঁহার এই সমস্ত লক্ষণ এবং নয়নের নিমেষ দেখিয়া দময়ন্তী তাঁহাকে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন।)

অনিমেষ নয়ন, স্বেদাম্বুহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গচ্ছায়া॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥ পৃঃ ৪৯৭

যুধিষ্ঠির ও নারদের কথোপকথন

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥ ৩১
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অহঙ্কার-নিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥ ৩২

বন ৬৭।৩১, ৩২

(যাহার হস্তযুগল. চরণযুগল ও মন অত্যন্ত সংযত থাকে এবং বিদ্যা তপস্যা ও কীর্ত্তি থাকে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে। যে লোক কোন প্রকার প্রতিগ্রহ করে না, যে কোন বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট হয় এবং অহংকার শূন্য থাকে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে।)

যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কৃত।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে সদা সেই রত॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, সর্ব্বদা আনন্দ।
অহংকার নাহি যার, নহে ক্রোধে অন্ধ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয়, সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার॥
ঈদৃশ হইলে, সেই তীর্থ ফল পায়।
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায়॥ পৃঃ ৫২১

গ্রন্থপঞ্জী

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থের নাম
১।	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড
২।	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব কাশীদাসী মহাভারত
৩।	ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন	কাশীদাসী মহাভারত
৪।	কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর	সঠিক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ অষ্টাদশ পর্ব, কাশীরাম দাসের মহাভারত
৫।	———	পদ্মপুরাণ
৬।	মনীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লকুমার পাল	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুঁথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির পরিচয়
৭।	শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ	সাহিত্য দর্পণঃ
৮।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত)
৯।	———	বিষ্ণু পুরাণ
১০।	———	ভাগবত পুরাণ
১১।	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল
১২।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত)
১৩।	ডঃ সুকুমার সেন	বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ
১৪।	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৫৬ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা	....

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থের নাম
১৫।	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	কাশীরামদাসের মহাভারত, আদি পর্ব
১৬।	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	মহাভারতম্

পুঁথি আদি পর্ব

১৭।	১০০৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি	কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা	২৩০০
১৮।	১০৮০ ঐ	সাঃ বিঃ ঐ	১০৭৩

পুঁথি সভা পর্ব

১৯।	১০১৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি	সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা	১৫৭৫
২০।	১১৫০ ঐ	সাঃ পঃ ঐ	৫৭২
২১।	১০৯৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি	কঃ বিঃ ঐ	১৭৪৮

পুঁথি বন পর্ব

২২।	অক্ষয়কুমার কয়াল	সংগৃহীত পুঁথি	...
২৩।	ঐ	অন্য পুঁথি	...
২৪।	ঐ	অন্য পুঁথি (খণ্ডিত)	...
২৫।	সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা ৭৩৯		..
২৬।	ঐ ২৭১৩		...
২৭।	কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ৩০১৮		...
২৮।	ঐ ১৮৩৪		...
২৯।	১০৩৭ বঙ্গাব্দের পুঁথি	সাঃ পঃ পুঁথি সংখ্যা	৫৭৩
৩০।	১১১২ বঙ্গাব্দের পুঁথি ঐ	ঐ	২৭১৩
৩১।	১২০৮ ঐ	ঐ	২১৮৬

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থের নাম	
পুঁথি	**বিরাট পর্ব**		
৩২।	১০৫০ বঙ্গাব্দের পুঁথি	কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা	২১৮৬
৩৩।	১১০৩ ঐ	ঐ	২২৩২
৩৪।	১২১৫ ঐ	ঐ	২২১৮
পুঁথি	**আশ্চর্য্য পর্ব**		
৩৫।	———	কঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা	২৭২৪